মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক **ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন** অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	**গবেষক** **মোঃ আহসান উল্লাহ** রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৪২/২০১৩-২০১৪ পুন: রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১২৩/২০১৭-২০১৮ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

২০১৮

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মোঃ আহসান উল্লাহ কর্তৃক **"মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ, মৌলিক ও গবেষকের একক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ লিখিত হয়নি।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য সন্তোষজনক। আমি পান্ডুলিপির আদ্যান্ত দেখেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **"মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** শীর্ষক থিসিসটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণার ফল। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত থিসিসটি সম্পূর্ণরূপে বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

(মোঃ আহসান উল্লাহ)
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৪২/২০১৩-২০১৪
পুন: রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১২৩/২০১৭-২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে পেরে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নবী মুহম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

গভীর শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন-এর প্রতি। তিনি আমার গবেষণার শুরু থেকেই নানাভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। তিনি পান্ডুলিপিটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন এবং মানোন্নয়নের জন্য সুচিন্তিত দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমার অভিসন্দর্ভটিকে ত্রুটিমুক্ত, সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য শ্রম ও সময় দিয়েছেন। আমি গবেষণা কাজে যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি, তিনি কখনো বিরক্তবোধ করেননি; বরং শত কর্ম ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আমার এ গবেষণার উন্নয়নের জন্য অনেক সময় দিয়েছেন; আমার বহু অস্বচ্ছ ও অজ্ঞাত ধারণাকে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ করেছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ জন্য তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গবেষণার তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ, গবেষণা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান সহ নানাভাবে আমাকে অনেকেই এ কাজে সহযোগিতা করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দ্বীনী ভাই জাহাঙ্গীর আলম, মুহাম্মাদ আলী, শামসুল হক, মোবারক হোসেন, মুন্সী জায়েদ, হুমায়ূন কবীর ও সাজিদুর রহমান। পারিবারিকভাবে আমার পিতা মোঃ সানাউল্লাহ ও আমার বড় বোন শাহিন আক্তার আমাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগার, জাতীয় গণগ্রন্থাগার, মালিটোলা সমাজ কল্যাণ পাঠাগার ও মাদরাসাতুল হাদীস নাজির বাজার পাঠাগারের প্রতি। আমার গবেষণা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব গ্রন্থ, ম্যাগাজিন ও লেখনী উক্ত পাঠাগারসমূহের সমৃদ্ধ গ্রন্থ ভাণ্ডারে সংরক্ষিত ছিল আমি সেগুলো অধ্যয়ন করেছি এবং সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মানবাধিকার সংস্থা 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' সহ ঐসব প্রতিষ্ঠান ও সম্মানিত লেখকগণের প্রতি যাঁদের প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও রচনাবলী থেকে এ গবেষণা কর্মে সহযোগিতা নিয়েছি। এছাড়া আরো যারা আমাকে এ কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ্‌ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন!

মোঃ আহসান উল্লাহ

শব্দ সংকেত

ﷺ	: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(রাযি.)	: রাযি আল্লাহু আনহু
(আ.)	: আলাইহিস্ সালাম
(রহ.)	: রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
তা. বি.	: তারিখ বিহীন
পৃ.	: পৃষ্ঠা
খ্রি.	: খ্রিস্টাব্দ
মৃ.	: মৃত্যু
দ্র.	: দ্রষ্টব্য
P.	: Page
Vol	: Volume

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা			৭
প্রথম অধ্যায়	:	**মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ**	**১১-১৩**
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	**মানবাধিকার লঙ্ঘন ও তার স্বরূপ**	**১৪-৪২**
তৃতীয় অধ্যায়	:	**মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে আধুনিক ব্যবস্থাসমূহ**	**৪৩-৫৩**
চতুর্থ অধ্যায়	:	**মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামের ব্যবস্থাসমূহ**	**৫৪-১৮৯**
পঞ্চম অধ্যায়	:	**বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি**	**১৯০-১৯৬**
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	**বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনার বাস্তবায়নঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা**	**১৯৭-২০৭**

ভূমিকা

মানবাধিকার হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক এমন কতগুলো যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার যেগুলো ছাড়া সে মর্যাদাপূর্ণ ও সুখময় জীবন ধারণ করতে এবং স্বীয় মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় না। মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকার হচ্ছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। সুবিচার লাভের অধিকার, জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অধিকার, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিবার পরিচালনার অধিকার, রাষ্ট্রে শান্তিতে বসবাস করার অধিকার, সম্পদ সংরক্ষণের অধিকার, বাক স্বাধীনতা ও নির্ভয়ে চলাফেরার অধিকার, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই এসব থেকে বাঁচার অধিকার, শাসকগোষ্ঠির অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে বাঁচার অধিকার, স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী করার অধিকার, সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা দিতে অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার অধিকার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অধিকার, অন্যায়ভাবে গ্রেফতার ও হয়রানি থেকে বাঁচার অধিকার প্রভৃতিও মানবাধিকারের অর্ন্তভুক্ত।

আজ মানুষের এ অধিকারগুলো চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত ও বিপর্যস্ত। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সাতশো কোটি মানুষের প্রায় অর্ধেক মানবাধিকার সম্পর্কিত নানা সমস্যার শিকার। চরম ক্ষুধা, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, সন্ত্রাস ও শোষণের যাতাকলে অসংখ্য মানুষ মানবেতর জীবন-যাপন করছে। দু'টি বিশ্ব যুদ্ধ, হিরোশিমা ও নাগাসাকির বিপর্যয়, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে মে দিবসের ঘটনা, স্বাধীনতাকামীদের প্রতিরোধে গণহত্যা ও ধর্ষণ, ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্যাতন ও দমন-পীড়ন, মানবতা বিধ্বংসী আধুনিক মারণাস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার, বসনিয়া-হারজগভিনিয়া, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন ও রোহিঙ্গা সমস্যা প্রভৃতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বাস্তব উদাহরণ।

মূলত মানুষের অধিকারসমূহ অতি প্রাচীনকাল থেকে লঙ্ঘিত হয়ে আসছে। যা আজও অব্যাহত রয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে মানবাধিকার হরণের কায়দাকানূন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানবাধিকার রক্ষা যেন অনিশ্চয়তার পথে। এ লঙ্ঘন প্রতিরোধে নেই কোন যথাযথ ব্যবস্থা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইন প্রণেতাগণ এজন্য নানাবিধ আইন প্রণয়ন করেও তা প্রতিরোধে সক্ষম হচ্ছেন না। কোন আইনে সমাধান না হলে দ্রুত ভিন্ন আরেকটা আইন রচনার চেষ্টা করছেন। আমেরিকা, ফ্রান্স, ভারত, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে অসংখ্যবার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। তবুও মানুষ তার অধিকার বাস্তবিকভাবে লাভ করছে না। সর্বত্রই পরিস্থিতি আরো জটিল হচ্ছে। কারণ, তাদের সেসব আইনের অধিকাংশ বাস্তবভিত্তিক ও যথার্য নয়। প্রচলিত মানব রচিত আইনে মানবাধিকারের সংজ্ঞা অস্পষ্ট ও অপূর্ণাঙ্গ, এর কোন স্থিতি নেই, নিরপেক্ষ প্রয়োগ ও যথাযথ কার্যকারিতা নেই, মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে তার যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। ফলে এসব আইন ব্যর্থ ও অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

অথচ ইসলাম-এর দিক-নিদের্শনায় হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বাস্তবিকভাবে তাঁর সমকালে মানবাধিকার রক্ষায় অতুলনীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলেন। ইসলামই সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আকারে মানুষের সকল মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে; ইসলামেই রয়েছে মানবাধিকার সম্পর্কে সুসংবদ্ধ নীতিমালা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা। কেমন হবে শাসক-শাসিতের অধিকার, পিতা-মাতার উপর সন্তানের এবং সন্তানের

Dhaka University Institutional Repository

উপর পিতা-মাতার অধিকার, স্ত্রীর উপর স্বামীর এবং স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার, শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক অধিকার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি, সঙ্গী-সাথী, নিঃস্ব, দরিদ্র, অসহায়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, অমুসলিম সম্প্রদায়, অসুস্থ, বন্দী, বাদী-বিবাদীসহ পৃথিবীর সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অধিকার কেমন হবে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ। ইসলাম প্রতিটি মানুষকে যে অধিকার দিয়েছে, তা অপরিবর্তনযোগ্য ও স্থায়ী। তাতে কোন সংশোধন অথবা কম বেশি করার কোন সুযোগ নেই এবং প্রয়োজনও নেই।

মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক প্রণীত মদিনা সনদই বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মানবাধিকার সংরক্ষণ সংবলিত লিখিত সনদ। এ সনদ মানবাধিকার রক্ষায় অনুকরণীয় আদর্শ বিশেষ। এর কয়েক শতাব্দিকাল পরে পাশ্চাত্যে মানুষের কতিপয় অধিকার সংরক্ষণে যেসব দলিল লিখিত হয়েছে তন্মধ্যে বৃটেনে ১২১৫ সালে ম্যাগনাকার্টা, ১৬২৮ সালে পিটিশন অব রাইটস, ১৬৮৮ সালে বিল অব রাইটস, ১৭০১ সালে অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট এবং ১৭৭৬ সালে ভার্জিনিয়া অধিকার বিল উল্লেখযোগ্য। এসব ঘোষণা প্রতিটি দেশের সরকারের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, পাশ্চাত্যের শাসকেরা মানুষের অধিকারগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করেনি; বরং এ স্বীকৃতি আদায়ে শত শত বছরব্যাপী রক্ত ঝরাতে হয়েছে। পাশ্চাত্যে যখন অধিকার বঞ্চিত মানুষগুলো তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়েছে, তখন একেবারে নিরুপায় হয়ে তাদের কিছু অধিকার দেয়া হয়েছে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন দলিল প্রণীত হয়েছে, যাতে আনুষ্ঠানিকভাবে মানুষের কিছু অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। অতএব, পাশ্চাত্যে মানবাধিকারের ধারণার বিকাশ ঘটেছে স্বেচ্ছাচারী শাসকদের স্বৈরতন্ত্রের ফল হিসেবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিপুঞ্জ। এ সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি বিধায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সীমাহীন নৃশংসতা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরিসীম নির্মমতার প্রেক্ষিতে সমগ্র বিশ্ব যখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তখন কতিপয় রাষ্ট্রের উদ্যোগে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর গঠিত হয় 'জাতিসংঘ'। পাশ্চাত্যের আইনবিদগণের বিশ্বাস মতে, ১৯৪৫ সালে প্রণীত জাতিসংঘ সনদ হলো প্রথম দলিল যা সাধারণ মানবাধিকারের ধারণাকে সর্বজনীন করেছে। অথচ এই সনদের কোথাও মানবাধিকারসমূহের উল্লেখ নেই। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ মানবাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩০ দফা সংবলিত ঘোষণা প্রণয়ন করে। যা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র বলে পরিচিত। উল্লেখ্য, এ সর্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্যে মানবাধিকার সংক্রান্ত যতগুলো দলিল রয়েছে, সেগুলোর কোনটাই সর্বজনীন ছিল না। পাশ্চাত্যে সর্বজনীন মানবাধিকারের ধারণার জন্ম ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে। পরিতাপের বিষয় যে, জাতিসংঘের উক্ত সর্বজনীন ঘোষণাপত্রও মানবজাতির সম্মান ও নিরাপদ জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আর আজকে যারা তথাকথিত মানবাধিকারের শিক্ষা দিতে আসেন তাদের দ্বারাই মানবাধিকার পদলিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

মানবাধিকার বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হওয়ায় এবং বিংশ শতাব্দীতে মানবাধিকার শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার দেখে কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, এ শব্দটির উৎপত্তি বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জাতিসংঘ কর্তৃক দেয়া মানবাধিকার ঘোষণার বহু পূর্বেই মুহাম্মাদ ﷺ সর্বপ্রথম মানবাধিকার বাস্তবিক অর্থে প্রতিষ্ঠা করতে

সমর্থ হন। ১৫ বছর বয়সে মুহাম্মাদ ﷺ আরব জনগোষ্ঠিকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষার জন্য 'হিলফুল ফুযুল' সংগঠন স্থাপন করে মানবাধিকার রক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীতে প্রতিটি পর্যায়ে সকলের জন্য মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানবদরদী। তিনি সর্বদা অসহায়, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। তিনিই সক্ষম হয়েছিলেন মানবাধিকার লঙ্ঘন যথাযথ প্রতিরোধ করে অপরাধমুক্ত মানবীয় সমাজ ব্যবস্থা উপহার দিতে। তাই বর্তমানে আদর্শ সমাজ গঠন করতে রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখার পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে এর প্রয়োগ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামের দিক-নির্দেশনা সংবলিত গবেষণামূলক উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এ সংক্রান্ত বিধি-বিধানগুলো কুরআন, হাদীস, ইসলামী ফিক্‌হ ও সাহিত্যে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলোকে যদি গবেষণার মাধ্যমে পৃথক গ্রন্থে বিন্যস্ত করা যায় এবং বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার দ্বারা বিষয়টির সঠিক মূল্যায়ন হয়, তবে জ্ঞানকোষে মূল্যবান তথ্যাবলী সংযোজিত হবে এবং দেশ ও জাতি মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে একটি দিকনির্দেশনা পাবে বলে আমার বিশ্বাস। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে উল্লিখিত শিরোনামে গবেষণা করার পরিকল্পনা নিয়ে তথ্য, উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহে প্রয়াস পেয়েছি এবং সেগুলোর ভিত্তিতে এ বিষয়টি পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছি।

এ গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলাম মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে যে অতুলনীয় ব্যবস্থা ও প্রস্তাবনা পেশ করেছে তা সকলকে অবহিত করা। ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালা যথাযথ গ্রহণ ও অনুসরণের মাধ্যমে সফলভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ করে এ যুগেও যে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব উপহার দেয়া সম্ভব, তা উপস্থাপন করা। যারা মানবাধিকার রক্ষা ও এর লঙ্ঘন প্রতিরোধে উদগ্রীব হয়েও হতাশায় ভুগছেন, বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করেও আলোর মুখ দেখছেন না; এ গবেষণার মাধ্যমে তাদের আালোর পথ দেখানো। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের মুসলিমরা ইসলামী আদর্শ প্রায় ভুলে যেতে বসেছে। তাই মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামী ভূমিকার দিকগুলো উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করা আর এটা জানানো যে, মানুষের রচিত বিধান নয়; বরং মহান আল্লাহ্‌র বিধান দ্বারাই সম্ভব অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সকল পথ বন্ধ করা।

উল্লেখ্য, গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং গবেষণার পদ্ধতি হয়েছে বিশ্লেষণধর্মী ও চিন্তামূলক। গবেষণার উৎস হিসেবে এ বিষয়ে বা বিষয় সংশ্লিষ্ট রচিত দেশী বিদেশী গ্রন্থাবলীর সহায়তা নেয়া হয়েছে। গবেষণার তথ্য-উপাত্তের প্রথম উৎস হিসেবে আল-কুরআন, হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থাবলী, এ বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সাহিত্য ও প্রবন্ধ, ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলী, ইসলামী দণ্ডবিধি বা বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী, ইতিহাস গ্রন্থাবলী, বাংলা-আরবী-ইংরেজী অভিধান প্রভৃতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় উৎস হিসেবে বিভিন্ন দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা, মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনারে উপস্থাপিত তথ্যাবলী, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ ইত্যাদি মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এজন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণও করতে হয়েছে।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও তার স্বরূপ সম্পর্কে; এতে যুগে যুগে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে আধুনিক ব্যবস্থাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে; এতে ১৯৪৮ সালে ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ৩০ দফা সংবলিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার উল্লেখ এবং এ সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ব্যর্থতার কারণসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামের ব্যবস্থাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনার বাস্তবায়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; এ অধ্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামী পদ্ধতি ও অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনাও উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে উপসংহারে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামের দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলে আমাদের সমাজে কী প্রভাব পড়তে পারে তা আলোচিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভের শেষাংশে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত হয়েছে।

[প্রথম অধ্যায়]

মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার সম্পর্কিত ধারণা এবং মানবাধিকারের বিষয়টি অতি সাম্প্রতিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘোষণা এবং চুক্তিতে এ ধারণাটি ব্যবহৃত হয়। পাশ্চাত্যে মানবাধিকার বলতে Rights of Man বোঝানো হতো। যেমন- ১৭৭৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিষয়ক ঘোষণাপত্র, ১৭৮৯ সালের ফ্রান্সের মানুষের ও নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র ইত্যাদিতে মানবাধিকার বলতে Rights of Man বোঝানো হয়েছে। Rights of Man বাক্যটিতে মহিলাদের অধিকারের বিষয়টি দ্ব্যর্থক নয় বিধায় Thomas Paine সম্ভবত সর্বপ্রথম মানবাধিকারের প্রতিশব্দ হিসেবে Human Rights শব্দটি ফ্রান্সের মানবাধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রের ইংরেজি অনুবাদে ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে এলিনর রুজভেল্ট-এর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত The Universal Declaration Of Human Rights তথা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় "Human Rights" বা "মানবাধিকার" পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়।[১]

ইসলামে 'হুকূকুল ইবাদ' বা 'হাক্কুল ইবাদ'-ই হচ্ছে মানবাধিকার। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মানবাধিকারের প্রতিশব্দ হিসেবে 'হাক্ব বা হুকুক' শব্দটি অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে।

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য সমাজের এক সদস্যের প্রতি অন্য সদস্যের যেমন রয়েছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য, তেমনি আছে কতগুলো নৈতিক ও আইনগত অধিকার। পৃথিবীর সকল মানুষ সেই অধিকারগুলো ভোগের দাবিদার, যা সহজাত, চিরন্তন ও সর্বজনীন এবং কোন দেশ বা যুগের সীমানায় আবদ্ধ নয়। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য সমানভাবে এ অধিকারগুলো দিয়েছেন।

গাজী শামছুর রহমান বলেন: "মানবাধিকার বলতে সে অধিকারকে বোঝায় যা নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যা তাকে বিশিষ্টতা দেয় এবং যা হরণ করলে সে আর মানুষ থাকে না।"[২]

'মানবাধিকার ভাষ্য' গ্রন্থে রয়েছে: মানবাধিকার বলতে এমন অধিকারকে বুঝায় যে অধিকার নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং যে অধিকার অর্জনের দ্বারা মানুষ পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, মানুষকে এ শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে আরোহণে প্রয়োজন মানবাধিকার। মানবাধিকার ছাড়া যেমন মানুষের পূর্ণতা আসে না, তেমনি সে পরিপূর্ণরূপে গড়ে উঠতে পারে না।[৩]

---

[১] Dr. Ershadul Bari, The Dhaka University Studies, part- F, Vol-11 No.1, (University of Dhaka: June 1991), P.19; Rosenbaum, "The Editor's Perspective on the Philosophy of Human Rights" in Alan S. Rosenbaum (ed), *The Philosophy of Rights, International Perspective,* (H. U. L., Oxford University Press 1960), P.6; Thomas W. Wilson, "A Bedrock Consensus of Human Right's" in H. Henkin (ed), *Human Dignity : The Internationalization of Human Rights* : 1979, P. 48.

[২] গাজী শামছুর রহমান, *মানবাধিকার ভাষ্য*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪), পৃ. ১১।

[৩] গাজী শামছুর রহমান, *মানবাধিকার ভাষ্য*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪), পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

সাংবিধানিক আইন গ্রন্থে বলা হয়েছে: "মানবাধিকার এমন একটি অধিকার যা ক্রয়যোগ্য, বিক্রয়যোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য নয়। সর্বোপরি কোন বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে এ সকল অধিকারসমূহ সৃষ্টি হতে পারে না। একে বরং প্রাকৃতিক অধিকার বলা যেতে পারে।"[৪]

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেন: "এ দুনিয়ায় মানুষ কতগুলো স্বতঃসিদ্ধ অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। দেশকাল, বর্ণভাষা ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের বেলায়ই সে অধিকারগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য। এ কালের ভাষায় সে অধিকারগুলোকেই একত্রে বলা হয় মৌল মানবাধিকার, সংক্ষেপে মানবাধিকার (Human Rights)। এ মানবাধিকার এমনই একটি অলংঘনীয় বিষয় যে, একে হরণ কিংবা দলন করার অধিকার নেই দুনিয়ার কোন শক্তির।"[৫]

মানবাধিকার সম্পর্কে Gealirth Alam বলেনঃ Human Rights are aspecies of moral rights in which all persons are equal simply because they are humans. Such rights can be arguable or justification through a universal set of vilid moral principles.[৬]

মানবাধিকার প্রসঙ্গে ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘের প্রকাশনা 'Human Rights: Questions and answer' এ বলা হয়েছে: Human Rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.[৭]

মানবাধিকার ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে R.J. Vincent বলেনঃ Human rights are the rights that every one equally has by virtue of their very Humanity and also by virtue of their grounded in our appeal to our human nature.[৮]

অতএব, মানবাধিকার বলতে আমরা সে সব অধিকারকে বুঝি যা নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং যা তাকে পরিপূর্ণ মানুষরূপে বিকশিত করতে সাহায্য করে; যা হরণ করলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারা ব্যহত হয়।

উল্লেখ্য যে, মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো হচ্ছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। এর পাশাপাশি রয়েছে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার, বাঁচার অধিকার, সম্পদ ও সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক অধিকার, মালিকানা সংরক্ষণের অধিকার, শ্রমিকের অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, সুসম্পর্ক ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার পাওয়ার অধিকার, সমতার অধিকার, সুবিচার লাভের অধিকার, মান-ইজ্জত ও সুনাম রক্ষার অধিকার, নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার, নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের অধিকার, জাতীয় জীবনে অংশগ্রহণ করার অধিকার, জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের অধিকার প্রভৃতি। এসবই মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এ অধিকারগুলো পূরণ হওয়া ছাড়া

---

[৪] অধ্যাপক মোঃ আলতাফ হোসেন, *সাংবিধানিক আইন*, (জলিল ল' বুক সেন্টার, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২), পৃ. ৬৭।

[৫] মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ২০০২), পৃ. ১।

[৬] Gealirth Alam, '*Human Rights: Eassays on Justification Applications'*, (Chicago University Press, 1982), p.1.

[৭] UN, '*Human Rights and Social Justice*' (New York, 1987), p.4.

[৮] As quotd Dr. D.P. Khanna, IPS: '*Reforming Human Rights*', p.16.

মানুষ পৃথিবীতে জীবন ধারণ করতে পারে না, মানবিক গুণাবলি ও বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় না। মূলত এসব অধিকার প্রাপ্তিই মানুষকে অন্যান্য প্রাণি থেকে বিশেষত্বের অধিকারী হিসেবে প্রতীয়মান করে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির মধ্যে তখনই পার্থক্য সূচিত হয় যখন মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ যাবতীয় অধিকারগুলো পরিপূর্ণভাবে লাভ করে। এ অধিকারগুলো অর্জন ছাড়া মানুষ আর অন্যান্য প্রাণির মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না; মানুষ তখন এক ধরনের প্রাণি হিসেবেই পরিচিতি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

[দ্বিতীয় অধ্যায়]

মানবাধিকার লঙ্ঘন ও তার স্বরূপ

মানুষকে তার যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য না দেয়াই হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন। কোন মানুষকে যখন তার প্রদত্ত অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত করা হয় বা অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয় তখন তাই হয় মানবাধিকার লঙ্ঘন। চাই সেটা নৈতিক অধিকার হোক বা আইনগত অধিকার হোক তা হরণ করলে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়।

মানবাধিকারের সমস্যা প্রাচীনকাল থেকে পরিদৃষ্ট হলেও বর্তমান সময়ের ন্যায় অতীতে এর এতো ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা পরিলক্ষিত হয়নি। মানবাধিকারের পরিধি যতটা বেড়েছে, এর লঙ্ঘনের পরিধি ও ধরন তার চেয়েও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র বরং অধিকাংশ স্থানেই মানুষের অধিকারগুলো প্রকাশ্যভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। এর প্রতিকারে আজ পর্যন্ত কোন যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

মানবাধিকার লঙ্ঘন যুগে যুগে

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যেমন ইতিহাস রয়েছে; তেমনি রয়েছে মানবাধিকার হরণের ইতিহাস। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মানুষের অধিকারসমূহ অতি প্রাচীনকাল থেকেই লংঘিত হয়ে আসছে। যুগে-যুগে, দেশে-দেশে বিত্তবান কিংবা ক্ষমতাধর শাসক শ্রেণি কর্তৃক দুর্বল, বিত্তহীন ও ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠী শোষিত ও নির্যাতিত।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাস অবলোকন করতে সর্বপ্রথম দৃষ্টিপাত করা যাক মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দিকে। আল্লাহ্ তা'আলা পথহারা মানবজাতিকে সুপথে পরিচালিত করতে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূলকে পাঠিয়েছেন। তারা মানব জাতিকে আল্লাহ্র হক এবং বান্দার হক সম্পর্কে যথার্থ অবহিত করেছেন। কোন যুগে যখনই মানুষ মহান স্রষ্টা আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছিল, মানবাধিকার পদদলিত ও চরমভাবে লংঘিত হচ্ছিল তখনই আল্লাহ্ সেই জাতিকে সুপথে পরিচালিত করতে, এক আল্লাহ্র ইবাদতে ব্রতী হতে এবং মানুষের ন্যায্য অধিকারগুলো সুন্দর পন্থায় আদায়ের শিক্ষা দিতে বার্তাবাহক তথা নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, জাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শন করতে এসে বহু নবীগণকে অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল; এমনকি অনেককে শাহাদাত বরণও করতে হয়েছিল। আর তাদের অনুসারীদের উপরও চালানো হয়েছিল চরম অত্যাচার ও নিপীড়ন। আল-কুরআন ও রাসূলের হাদীসে এসব করুণ চিত্র বিবৃত হয়েছে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদেরকে অবহিত করেছে যে, মানবাধিকার লঙ্ঘন শুরু হয় পৃথিবীর বুকে মানব বসতির সূচনালগ্ন থেকেই। এ পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী হলেন আদম ও হাওয়া (আ.)। তাদেরই দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের ঘটনায় যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছিল কুরআনে তা উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ * فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

আপনি তাদেরকে সঠিকভাবে আদমের দুই পুত্রের ঘটনা জানিয়ে দিন। যখন তারা উৎসর্গ (কুরবানী) করেছিল তখন তাদের একজনের উৎসর্গ কবূল করা হয়েছিল এবং অপরজনের উৎসর্গ কবূল করা হয়নি। সে বলল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। অপরজন বলল, আল্লাহ্ একমাত্র মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করেন। আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি আমার দিকে হাত বাড়ালেও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াব না, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি। আমি চাই তুমি আমার ও তোমার পাপের বোঝা বহন করে অগ্নিবাসী হয়ে যাও, অন্যায়কারীদের এটাই পুরস্কার। অতঃপর তার আত্মা তাকে ভ্রাতৃহত্যার কাজে প্ররোচিত করল। ফলে সে তাকে হত্যা করল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেল।[৯]

হত্যাকাণ্ডের কারণ: এ বিষয়ে কুরআন যা বলেছে তা এই যে, দুই ভাই (হাবীল ও কাবীল) আল্লাহ্র নামে কুরবানী করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ একজনের উৎসর্গ কবূল করেন, অন্যজনেরটা করেননি। তাতে ক্ষেপে গিয়ে যার উৎসর্গ কবূল হয়েছিল তাকে যার উৎসর্গ কবূল হয়নি সে হত্যা করে। উল্লেখ্য যে, সে যুগে উৎসর্গ কবূল হওয়ার নিদর্শন ছিল এই যে, আসমান থেকে একটি আগুন এসে উৎসর্গ নিয়ে উধাও হয়ে যেত। যে উৎসর্গকে উক্ত অগ্নি গ্রহণ করত না, সে উৎসর্গ প্রত্যাখ্যাত মনে করা হত। কাবীল কৃষিকাজ করত। সে কার্পণ্য করে কিছু নিকৃষ্ট প্রকারের শস্য, গম ইত্যাদি উৎসর্গের জন্য পেশ করল। হাবীল পশু পালন করত। সে আল্লাহ্কে ভালবেসে তার উৎকৃষ্ট দুম্বাটি উৎসর্গ করল। অতঃপর আসমান থেকে আগুন এসে হাবীলের উৎসর্গটি নিয়ে গেল। কিন্তু কাবীলের উৎসর্গ যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। এতে কাবীল রাগান্বিত হয়ে হাবীলকে হত্যা করার হুমকি দিল এবং এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করল।[১০]

কাবীল স্রেফ হিংসা বশে হাবীলকে হত্যা করেছিল। সে চায়নি যে, ছোট ভাই হাবীল তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি হিসেবে সমাজে প্রশংসিত হোক। এ হিংসার কারণেই পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: অন্যায়ভাবে কোন মানুষ নিহত হলে তাকে খুন করার পাপের একটা অংশ আদমের প্রথম পুত্রের আমলনামায় যুক্ত হয়। কেননা, সে-ই প্রথম হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে।[১১]

আল্লাহ্ প্রেরিত আরেকজন নবী হলেন হুদ (আ.)। তাঁর যুগে 'আদ জাতির মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ * وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ * إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَوَّلِينَ * وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ * فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ .

'আদ' সম্প্রদায় নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেন: তোমাদের কি ভয় নেই? আমি তো তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার

---

[৯] আল-কুরআন: সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫/২৭-৩০।

[১০] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী, *তফসীর মাআরেফুল কুরআন*, (অনুবাদ ও সম্পাদনা- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প), পৃ. ৩২৪।

[১১] অলীউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-খতীব আত-তিব্রীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, (আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ১ম খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ ১৯৮৫), কিতাবুল ইল্ম, আল-ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তা দেবেন। তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালিম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। অতএব, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুগত্য কর। ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, যা তোমরা জান। তোমাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান, এবং উদ্যান ও ঝরণা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ না-ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। অতএব, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।[১২]

আদ জাতির ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল, তারা মানুষের অধিকার হরণ করেছিল। তারা দুর্বলদের উপর নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানত এবং মানুষের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাতো। যা আল-কুরআনে (সূরাহ শু'আরা ১৩০ নং আয়াতে) উদ্ধৃত হয়েছে।

নবী সালিহ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন সামূদ জাতির নিকট। তাঁর যুগেও সামূদ জাতির লোকেরা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছিল। তার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ * قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ * وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ *فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ * فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

আর সেই শহরে ছিল নয়টি দল যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াত এবং কোনরূপ সংশোধনমূলক কাজ করত না। তারা বলল, তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্র নামে শপথ কর যে, আমরা রাত্রিকালে সালিহ ও তার পরিবারবর্গকে অবশ্য অবশ্যই হত্যা করব, অতঃপর আমরা তার (রক্তের দাবিদার) অভিভাবককে অবশ্যই বলে দিব যে, আমরা তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিনি। আর আমরা নিশ্চিতভাবে সত্যবাদী। তারা এক চক্রান্ত করেছিল আর আমিও এক কৌশল অবলম্বন করেছিলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতঃপর দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণতি কেমন হয়েছিল? আমিই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এই তো তাদের ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ উজাড়, কারণ তারা জুল্ম-অত্যাচার করেছিল। এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন ও শিক্ষার উপাদান আছে।[১৩]

সামূদ জাতির ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল, তারা অত্যাচার করত। তারা মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার হরণ ও ধর্ম পালনের অধিকার বিনষ্টে চক্রান্ত করেছিল। ফলে আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করে দেন।

এভাবে নবী মূসা (আ.)-এর যুগে শাসক ফেরাউনের এবং ইবরাহীম (আ.)-এর যুগে বাদশা নমরূদের অত্যাচার ও নিপীড়নের ইতিহাসও আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে বনী ইসরাঈল জাতির মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাসও যারা অন্যায়ভাবে আল্লাহ্ প্রেরিত বহু নবীগণকেও হত্যা করতে পিছপা হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে এসব জাতির অন্যায়, অত্যাচার, সীমালঙ্ঘনের ইতিহাস

---

[১২] আল-কুরআন: সূরাহ আশ-শুআরা, ২৬/১২৩-১৩৯।

[১৩] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নামল, ২৭/৪৮-৫২।। তাদেরকে কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তার বর্ণনা রয়েছে আল-কুরআন: সূরাহ আল-আ'রাফ ৭/৭৮, সূরাহ হূদ ১১/৬৭-৬৮, সূরাহ কামার ৫৪/৩১, সূরাহ আল-কাসাস ২৮/৫৮-৫৯।

সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেছেন। অতীতে বিভিন্ন জাতির সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ির কারণে যে আযাব নেমে এসেছিল তা-ও কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মানব জাতি এসব অপরাধ থেকে সাবধান হয় ও বিরত থাকে।[১৪]

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের প্রাক্কালে আইয়ামে জাহিলিয়্যাতের যুগে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছিল। কথায় কথায় যুদ্ধ, মারামারি-হানাহানি ছিল নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা। সে সমাজে বিশেষ করে নারীদের কোন মর্যাদাই ছিল না। নারীদের সম্পদের অংশ প্রদান না করা, কন্যা সন্তান জন্ম হলে তাকে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করা ইত্যাদি অপরাধ সে সমাজকে করেছিল বিপর্যস্ত ও চরমভাবে কলুষিত। দাস-দাসীর প্রতি চালানো হতো অবর্ণনীয় নির্যাতন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সর্বশেষ ও বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করেন। নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে এবং কোন মানুষের প্রতি জুল্‌ম না করতে, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশি, গরীব-মিসকীন, অসহায় সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করতে এবং কারো হক বিন্দুমাত্র নষ্ট না করতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। পরিতাপের বিষয় যে, এরূপ নবীর উপরও চরম নিপীড়ন চালিয়েছিল জাহিলী সমাজের অহংকারী পাপিষ্ঠ লোকেরা। নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণের ধর্ম পালন ও প্রচারের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে সে যুগের লোকেরা কতই না নির্মম আচরণ করেছিল। নবীকে হত্যার চেষ্টা, শারিরিক ও মানুসিক নির্যাতন; এমনকি তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে বাধ্য করেছিল তারা। মানবাধিকার হরণের এ নির্মম ইতিহাস আল-কুরআন, সুন্নাহ ও নবীজীর সিরাত গ্রন্থাবলীতে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতএব, পৃথিবীর বুকে মানব বসতির সূচনা লগ্ন থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুগ পর্যন্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আল-কুরআন মানব জাতির সামনে পেশ করেছে।

অতঃপর যদি সমাজ বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয় তাতেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাস পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে 'সামাজিক স্তরবিন্যাস' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা বিদ্যমান। 'সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা' অধ্যায়ে বলা হয়েছে: সামাজিক স্তরবিন্যাস সমাজের বিভিন্ন মানুষ ও শ্রেণীকে নানাবিধ স্তরে বিভক্ত করেছে। P. Sorokin বলেছেন, সুনির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর উঁচু-নীচু অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণীসমূহের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে। এটা স্পষ্টত সামাজিক স্তরের বিদ্যমান উঁচু-নীচু অবস্থানকে নির্দেশ করে। এটি মূলত চাপিয়ে দেয়া একটি ব্যাপার যা সমাজস্থ মানুষকে উঁচু ও নীচু দলে বিভক্ত করে। এটি মানুষের অধিকার, পদমর্যাদা, কর্তব্য এবং দায়িত্বের অসম বণ্টন।

অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিম্নোক্ত চারটি ধরন উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১। দাস ব্যবস্থা (Slaver)।

২। সামন্ত বা এস্টেট ব্যবস্থা (Estate system)|

৩। শ্রেণী ব্যবস্থা (Class system)।

৪। বর্ণ ব্যবস্থা (Caste system)।

দাস প্রথা

[১৪] আযাব নাযিলের কথা রয়েছে- আল-কুরআন: সূরাহ ইউনূস, ১৩, সূরাহ কাহাফ, ৫৯, সূরাহ হাজ্জ ৪৫, সূরাহ নাজম, ৫০-৫৫, সূরাহ হাক্কাহ, ৪-১০, সূরাহ কাফ, ১২-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ স্বীকৃত সবচেয়ে বড় বৈষম্যটি হচ্ছে দাসত্ব। এটি সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রথম ও প্রাচীন শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকেই দাস ব্যবস্থার উৎপত্তি। দাসের মর্যাদা গৃহপালিত পশু ও ঘরের আসবাবপত্রের চেয়ে খুব একটা বেশি নয়।

দাস ব্যবস্থার গোড়ার দিকে যখন ব্যক্তি মালিকানার প্রচলন শুরু হয় তখন সম্পত্তির উপর মানুষের অধিকার আরোপের জন্য প্রায়ই যুদ্ধ সংঘটিত হত। যুদ্ধে পরাজিত সৈন্যদেরকে বিজয়ী গোষ্ঠীর বা ব্যক্তির দাস হিসেবে ব্যবহার করা হত। মূলত এভাবেই দাস ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা দাস ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। দাসদের সাথে অমানবিক ব্যবহার এবং চরম অত্যাচার করা হত। গ্রীস ও রোমে দীর্ঘদিন ধরেই ক্রীতদাস ব্যবস্থা এবং উৎপাদন সম্পর্কে শ্রেণীসংঘাত বিদ্যমান ছিল। আমেরিকা যে আফ্রিকা থেকে জাহাজে ভরে ক্রীতদাস আমদানি করত– সেটা খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। অসম সামাজিক সম্পর্কের চরম নিদর্শন হচ্ছে, দাস ব্যবস্থা। গ্রীক পণ্ডিত এরিস্টটল মনে করতেন, আধিপত্য ও বশ্যতার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে দাস ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। দাসকে তিনি জীবন্ত সম্পত্তি বলে মনে করতেন। দাস ব্যবস্থাই প্রথম শ্রেণীভিত্তিক শোষণমূলক সমাজ।

Nieboer তাঁর 'Slavery as Industrial System' গ্রন্থে দাস ব্যবস্থাকে তিনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন–

(ক) দাস যেন মালিকের দখলকৃত সম্পত্তি। দাসপ্রভুর ক্ষমতা থাকবে অসীম। সীমাহীন ক্ষমতার উপর শর্তারোপিত হলে তাকে দাস ব্যবস্থা বলা যাবে না।

(খ) দাস হচ্ছে ঘৃণার পাত্র। মুক্ত মানুষের সাথে তুলনা করলে দাসেরা তুলনামূলকভাবে নীচুস্তরের। মুক্ত মানুষের ন্যায় দাসের কোন সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই। দাসের কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারও ছিল না।

(গ) দাসেরা হচ্ছে বাধ্যতামূলক শ্রমিক। তারা যে কোন কাজ করতে বাধ্য। অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছার উপর দাসদের কোন অধিকার ছিল না। মুনিবের ইচ্ছানুযায়ী তাদের চলতে হতো।

এ তিনটি বিষয়ের ব্যতিক্রম হলে তাকে দাস ব্যবস্থা বলা যাবে না।[১৫]

ডক্টর এম. আবদুল কাদের তাঁর 'দাসত্ব প্রথা ও ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন: "দাসত্ব অতি প্রাচীন প্রথা। শিকারী যুগের বর্বর লোকেরা পরাজিত শত্রুকে ক্রীতদাস না বানিয়ে হত্যা করত; কিন্তু তাদের নারীদের ধরে এনে দাসীতে পরিণত করত। মেষপালক যুগে মানুষ শত্রুকে ধরে এনে ক্রীতদাস বানাত। হোমারের যুগে গ্রীসে দাস প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ বন্দীদের দাসে পরিণত করা হত অথবা দাস হিসেবে বিক্রি করা হত। গ্রীকেরা বিজিত এলাকার পুরুষ বন্দীদের হত্যা করে নারীদেরকে ধরে নিয়ে যেত। জলদস্যুরা প্রায়ই আযাদ লোকদের ধরে এনে বিক্রি করত। অপহরণ দ্বারাও কিছু দাস সংগ্রহ করা হত। সিরিয়া, পন্টাস, গ্যানটিয়া, থ্রেস, মিশর ও ইথিওপিয়া থেকে কিছু দাস পাওয়া যেত। ইতালী থেকেও সামান্য কিছু পাওয়া যেত। গ্রীস ও অহিতনিয়া থেকে আরব রাজন্যবর্গের দরবারে সাগরিকা, নর্তকী ও ভদ্রবেশ্যা সরবরাহ করা হত। এদেশ ছিল দাস ব্যবসায়ের সর্বাপেক্ষা বড় বাজার। অন্যান্য প্রধান বাজার ছিল সেমন্ট, সাইপ্রাস, একিমাস, বিশেষত কিয়শ। এথেন্সে ক্রীতদাস ছিল চার লাখ, করিন্থে দাস ছিল ৬০,০০০, এজিনায় ৪৭,০০০ এবং এটিকায় ১০০,০০০।

রোম: রোমে দাসত্বের প্রধান উৎস ছিল যুদ্ধবন্দী। এপিলসে জনগণের জয়ের পরে এপিরাসে ১৫,০০০ যুদ্ধবন্দী বিক্রি হয়। জুলিয়াস সিজার একবারেই ৬৩,০০০ বন্দী বিক্রয় করেন। আন্ডাস সলাদি রাজ্যে ৪৪,০০০ লোককে বন্দী করেন। অসংখ্য লোক দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর পরও ইয়াহুদী যুদ্ধে ৯৭,০০০ দাস

---

[১৫] মোস্তাফিজুর রহমান; মোঃ ইকবাল হুসাইন, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, (লেখাপড়া, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৫), পৃ. ৩২৪-৩২৭; মোঃ আহসান হাবিব, *সামাজিক স্তর বিন্যাস*, (গ্রন্থ কুটির, প্রথম প্রকাশ ২০০৮), পৃ. ১২৬।

পাওয়া যায়। পল, আফ্রিকা, সিরিয়া, গ্যানাটিয়া, ক্যাপডেসিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে রোমে নিয়মিতভাবে ক্রীতদাস আমদানী হত। কতিপয় অপরাধের শাস্তি হিসেবে মানুষ দাস হয়ে ঘাটিতে প্রেরিত হত। পিতামাতা নিজের সন্তানকে বিক্রি করতে পারত। পেডানিয়াস সেকেন্দাস নিহত হলে ঐ ঘরে অবস্থানকারী ৪০০ দাসকে হত্যা করা হয়। ক্লডিয়াসের আমলে ইতালীতে ২০,৪৩,২০০ দাস ছিল। মনিব দুষ্ট দাসকে হত্যা করতে পারত। তার আয় ছিল মনিবের প্রাপ্য।

ইয়াহুদী জগতে দাসত্বের বৈধতা স্বীকৃত হত। তারা প্যালেষ্টাইন প্রবাসী থেকে দাস ক্রয়ের অনুমতি পায়। এসব দাস চিরতরে পুরুষানুক্রমে তাদের সম্পত্তি বলে ঘোষিত হত। বন্দী ইসরাঈলেরা মিডিয়ান জয়ের পর সমস্ত নগরের দূর্গ লুণ্ঠন, ভস্মীভূত এবং মায় রাজন্যবর্গ সমস্ত পুরুষ অধিবাসীকে হত্যা করে সকল শিশু ও নারীকে বন্দী করে নিয়ে যায়। নোমার্স মোযেস সমুদয় বণিক ও পুরুষকে হত্যা করে কেবল বালিকা ও কুমারী মেয়েদেরকে ইয়াহুদীদের ব্যবহারার্থে জীবিত রাখে। এই কুমারীদের সংখ্যা ছিল ৩২০০০।

খ্রিষ্টধর্ম– খ্রিষ্টধর্মেও দাসত্ব স্বীকৃত ছিল। যাজকরাও ক্রীতদাস রাখতেন। প্রভুর কথা না মানলে তাকে চাবুক মারা হতো। মৃত্যুর পূর্বে তাদের মুক্তি পাওয়ার পথ ছিল না। বিয়ে করার অধিকার দাসের ছিল না।

ঔপনিবেশিক দাসত্ব – ভূ-দাসত্ব বিলুপ্ত না হতেই শুরু হয় ঔপনিবেশিক দাসত্বের। ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের নাবিক প্রিন্স হেনরী আফ্রিকার উপকূলে কয়েকজন পাদ্রীকে আটক করলে তারা দশজন কাফ্রী ও কিছু স্বর্ণের বিনিময়ে মুক্তি পান। এর ফলে তার স্বদেশবাসীদের মনে ভীতি জন্মায়। ফলে তারা আফ্রিকার উপকূলে কয়েকটি কুটির নির্মাণ করে কাফ্রী শিকার করা আরম্ভ করে। তাদেরকে গোপনে ধরে এনে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা দিয়ে আফ্রিকার স্পেনীয় উপনিবেশ হিসপানোলায় চালান দেওয়া হত। ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে বার্ষিক ৪০০০ কাফ্রী আমেরিকায় চালান দেওয়ার জন্য সরকারী ছাড়পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি স্পেনীয়দের পদাঙ্কানুসরণ করে। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ভার্জিনিয়ার কাফ্রী দাসের সংখ্যা দুই লাখে পৌঁছে। এ বছর ইংরেজরা ৩০,০০০, ফরাসীরা ২০,০০০ পর্তুগীজেরা ১৮,০০০, ওলন্দাজেরা ৪,০০০ ও ডেনরা ২,০০০ মোট ৭৪,০০০ দাস রফতানী করে। ১৭৯২ সনে স্পেনীয় উপনিবেশে তাদের সংখ্যা ছিল দশ লাখ এবং ফরাসী ও ব্রিটিশ উপনিবেশে তার চেয়েও বেশি। অনাহার, অত্যাচার ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার ফলে দাসেরা মাছির মত মারা যেত বলে সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য বছরে ৫৮,০০০ দাস আমেরিকায় রপ্তানি করতে হত। কিছু কাফ্রী আগে থেকেই তুরষ্ক, উত্তর আফ্রিকা ও অন্যান্য মুসলিম রাজ্যে চালান হত। এদের অর্ধেক পথেই মৃত্যুবরণ করত। ১৬৯০-১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জামাইকায় ৮ লক্ষ কাফ্রী আনা হয়। ১৮২০ সনে এদের মধ্যে মাত্র ৩,৪০,০০০ অবশিষ্ট ছিল।[১৬]

হিন্দু ধর্ম – ভারতবর্ষ জয়ের পর আর্যরা অনার্য জাতিকে দাসে পরিণত করে। অভিধানে 'দাস' শব্দের অন্যতম প্রতিশব্দ শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য– এই উচ্চতর ত্রিবর্ণের মানুষের দাস হল শূদ্ররা। শূদ্রের কর্তব্য হলো, ব্রাহ্মণের সেবা করা। দাসত্বের জন্যই শূদ্রের সৃষ্টি। মনিব মুক্তি দিলেও দাসত্ব থেকে তার মুক্তি নেই। তার নাম ঘৃণাস্পদ। তার নামের শেষে 'দাস' শব্দ যোগ করতে হয়।

---

[১৬] জ্ঞাতব্য যে, ইংল্যান্ডে সর্বশেষে দাসেরা মুক্ত হয় ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের আইনে। স্কটল্যান্ডের খনি-মজুরেরা আযাদী পায় রাজা ৩য় জর্জের আমলে। জার্মানিতে দাসত্বের শেষ নিদর্শন বিলুপ্ত হয় ১৫৩২-৪৮ খ্রিস্টাব্দে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে, এই নিষ্ঠুর অমানুষিক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯০২ সালে ডেনমার্কে, ১৮০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে, ১৮১১ সালে ইংল্যান্ডে, ১৮১৩ সালে সুইজারল্যান্ডে, ১৮১৪ সালে হল্যান্ডে, ১৮১৮ সালে ফ্রান্সে ও ১৮৩৬ সালে পর্তুগালে দাসত্ব নিষিদ্ধ হয়। তথাপি ১৮৩৪ সালে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ৮ লাখ এবং ১৮৩৯ সালে ৭ লাখ কাফ্রী দাস পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের (১৮৬০-৬৫) ফলেই হতভাগ্য কাফ্রীরা স্বাধীনতা লাভ করে (সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪)।

Dhaka University Institutional Repository

শূদ্র অন্য বর্ণের ঘরে অতিথি হতে পারবে না। তারা শ্রাদ্ধাদিতে গ্রামীনের সঙ্গে বসলে দাতা দানের কোন ফল প্রাপ্ত হন না, শূদ্রের গ্রামীনের উপহার গ্রহণ নিকৃষ্ট কাজ বলে বিবেচিত হত; তা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও পাপ মোচন হয় না। শূদ্রের রান্না খেলে ব্রাহ্মণের জাত নষ্ট হয়। শূদ্র তার সমগ্র জীবনে অন্যের মাথা মুড়াবে, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট খাবে। শুদ্রের উচ্চতর শ্রেণীতে বিয়ে নিষিদ্ধ। শুদ্র তিন বর্ণকে কড়া কথা বললে তার জিহ্বা বা হাত-পা দ্বারা আঘাত করলে বা তুললে হাত-পা কেটে ফেলা হবে ও নাম ধরে গালি দিলে তার মুখে জ্বলন্ত লৌহ শংকু নিক্ষেপ করা হবে। দর্প করে গ্রামীনের গায়ে শ্লেষা দিলে ওষ্ঠ, পেশাব করলে লিঙ্গ, চুল ধরলে দুই হাত ও হিংসাবশত চিবুক, গ্রীবা বা অণ্ডকোষ স্পর্শ করলে তার ঐ সকল অঙ্গ ছেদন করাই ছিল তার শাস্তি। পক্ষান্তরে শূদ্রকে হত্যা করা ব্যাঙ, কুকুর বিড়াল, চিতাবাঘ বা অন্য জন্তু হত্যার তুল্য। স্ত্রীলোক ও শূদ্রকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে নাই- এটাই মনুর বিধি। শূদ্রের বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। তার উপস্থিতিতে ব্রাহ্মণেরও বেদ পাঠ নিষিদ্ধ। আত্মীয়স্বজন থাকলে ত্রিবর্ণের পক্ষ থেকে শুদ্রের শব বহন নিষিদ্ধ। শূদ্র ছাড়াও সভ্য আর্যদের হাতে পরাজিত অসভ্য আর্যরাও বন্দী হয়ে দাস-দাসী হত।

মুঘল জাতি– চেঙ্গিস খার আমলে পরাজিত গোষ্ঠিগুলোর নারীদেরকে বন্দী করে মুঘল সৈন্যদের মাঝে বিতরণ করা হত। বিজয়ী যোদ্ধারা সুন্দরী নারীদের বিয়ে করত এবং অবশিষ্টদের দাসী বানাতো।

মগ ও ফিরিঙ্গী – ঘোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানের মগ ও ফিরিঙ্গী পর্তুগীজ দস্যুদের ক্রমাগত লুটতরাজে দক্ষিণ বঙ্গ উজাড় হয়ে যায়। পশ্চিম বানেশ্বর থেকে উত্তরে ঢাকা পর্যন্ত তাদের অভিযান বিস্তৃত ছিল। মগেরা তাদের বন্দীদের কৃষি কাজে নিযুক্ত করত আর বন্দিনীদের রক্ষিতা বানাত। ফিরিঙ্গীরা তাদেরকে দাক্ষিণাত্যে নিয়ে অন্যান্য ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রি করত। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে নওয়াব শায়েস্তা খান তাদের প্রধান আড্ডা চাটগাঁও দখল করলে এ লোমহর্ষক অত্যাচারের অবসান ঘটে।"[১৭]

আরবে (জাহিলিয়াতের যুগে) দাস প্রথা: ইসলামপূর্ব আরবে দাস প্রথা চালু ছিল। তখন আরবের সমাজ, অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় নিবিড়ভাবে এ প্রথা চালু ছিল। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান তাঁর 'ইসলামের দৃষ্টিতে দাসপ্রথা' প্রবন্ধে লিখেছেন: "ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত দাসপ্রথা আরবের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও উৎপাদন পদ্ধতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। আইয়্যামে জাহিলিয়া বা অজ্ঞানতার যুগে বিভিন্ন প্রকারের দাসপ্রথার প্রচলন ছিলো বলে জানা যায়। এদের কিছু নিম্নরূপ:

ক. আফ্রিকা বা আবিসিনিয়ার ক্রীতদাস।

খ. আরব কর্তৃক লুণ্ঠিত বা বল-পূর্বক প্রাপ্ত নর-নারী, বালক-বালিকা; যাদের হাটে-বাজারে বিক্রি করা হতো; কিংবা বিবাদমান গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে প্রাপ্ত সেই হতভাগ্য যুদ্ধবন্দী, যাদেরকে নিষ্ঠুর পন্থায় অত্যাচার করে বিজেতারা চিরদিনের জন্য দাসত্বেও শৃঙ্খলে বন্দী করে রাখতো। আরবের তৎকালীন সমাজে দাসদের প্রতি পৈশাচিক নিষ্ঠুর আচরণের পরিচয় ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়।

গ. ইরাক ও তুর্কীস্তান থেকেও কিছু সংখ্যক ক্রীত দাস আরবদেশে আমদানী করা হতো। অধিকাংশ দাসদেরকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হতো এবং দাসীকে উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

ঘ. সিরিয়া থেকেও অনেক দাস-দাসী ক্রয় করে আরবে এনে বিক্রি করা হতো। এদের মধ্যে অনেক গায়িকা ও নর্তকী ছিলো বলে জানা যায়। সাধারণত এদেরকে নৃত্য, গান-বাদ্য করার জন্য ব্যবহার করা

---

[১৭] *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গবেষণা বিভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮), পৃ. ১৬৪-১৭৬।

হতো। কোন কোন সময় দাসী ও প্রভুদের মধ্যে বৈধ বিবাহ না থাকলেও যৌন মিলনে বাধা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, প্রভুর অনুমতিক্রমে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলে, দাসীর ঔরসে যে সন্তান জন্মলাভ করত সেও দাস-দাসীরূপে বিবেচিত হত। মোদ্দাকথা, প্রাক ইসলামী যুগে আরব সমাজে ভাগ্য-বিড়ম্বিত ক্রীতদাসদের কোন সুনিশ্চিত সামাজিক অধিকার ছিল না। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, তখনকার আরবে "ভৃত্য বা ভূমিদাসের মনে ক্ষীণ আশা ও এক কণা সূর্যরশ্মিও কবরের এদিকে (ইহজীবনে) জুটতো না।" ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর দাসদের প্রতি পাশবিক আচরণের এমন সব বীভৎস নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম সত্য-সত্যই এমন সভ্যতার উন্নয়ন ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।"[১৮]

বর্তমান যুগে মানবাধিকার ঘোষণা অনুযায়ী জাতিসংঘের সকল সদস্যের জন্যই দাস প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। তথাপি দেখা যায় যে, অনেক উন্নত দেশেই বন্ড সইয়ের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে আজীবন বন্দি করে রাখা হয়। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের অনেকেরই মানবেতর অবস্থায় তাদের কাছ থেকে জোর করে শ্রম আদায় করা হয়। হয়ত এর পেছনে ঋণ পরিশোধ করা অথবা অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার মতো বিষয়াদি কাজ করে।[১৯]

এস্টেট প্রথা

সামাজিক স্তরবিন্যাসের দ্বিতীয় ধরন হচ্ছে এস্টেট ব্যবস্থা। মধ্যযুগের জমিদারী প্রথাই ছিল এই প্রথার মূল উৎস। এই প্রথা ইউরোপ ও রাশিয়ায় পরিলক্ষিত হতো অনেকটা বর্ণ প্রথার মত।

মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমাজ সাধারণত তিনটি এস্টেট বা স্তরে বিভক্ত ছিল। যথা-

প্রথম এস্টেট: এরা যাজক শ্রেণি। এরা রাষ্ট্র শাসন করতো এবং সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করত। এরা ধর্মের দোহাই দিয়ে চার্চের নামে মানুষকে বিভিন্নভাবে শোষণ করত।

দ্বিতীয় এস্টেট: এরা হল যোদ্ধা শ্রেণি। রাষ্ট্রকে বহিঃশক্তির হাত থেকে রক্ষা করাই ছিল এদের কাজ।

তৃতীয় এস্টেট: এরা সাধারণ মানুষ। কেবল উৎপাদন করাই ছিল এদের কাজ। এরা সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত।[২০]

শ্রেণি প্রথা

শ্রেণি প্রথা সম্পর্কে লেলিন বলেন: শ্রেণি হল, পরস্পর বিপরীত স্বার্থ নির্ভর দু'টি গোষ্ঠী। এক শ্রেণি অন্য শ্রেণিকে শোষণ করে। শোষিত শ্রেণি সমাজের মর্যাদাপূর্ণ আসন থেকেও দূরে থাকে। তারা মূলত সবদিক থেকেই বঞ্চিত। আর শোষক বা মালিক শ্রেণি একই সাথে ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হয় এবং প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শ্রেণি শোষণ করে থাকে।

সমাজ বিজ্ঞানীরা শ্রেণিকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-

(১) উচ্চবিত্ত শ্রেণি;

(২) মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও

(৩) নিম্নবিত্ত শ্রেণি।[২১]

---

[১৮] *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮), পৃ. ১৫০-১৫১।

[১৯] মোঃ আহসান হাবিব, *সামাজিক স্তর বিন্যাস*, (গ্রন্থ কুটির, প্রথম প্রকাশ ২০০৮), পৃ. ১২৬।

[২০] *সামাজিক স্তর বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-১২৮।

[২১] এ.এইচ,এম. মোস্তাফিজুর রহমান, মোঃ ইকমাল হুসাইন, *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি*, (লেখাপড়া, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৫), পৃ. ৩২৯--৩৩২।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ বিজ্ঞানী Daniel Rossides মতে, যুক্তরাষ্ট্রে শ্রেণিপ্রথা পাঁচভাগে বিভক্ত: উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি, শ্রমিক শ্রেণি এবং নিম্নশ্রেণী।[২২]

অতঃপর সমাজ বিজ্ঞানের পরিমণ্ডল পেরিয়ে যদি আরব জাতির ইতিহাসের দিকে তাকানো যায়, সেখানেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

উমাইয়া খিলাফতকালে [৬৬১-৭৪৯ খ্রি.] মানবাধিকার লঙ্ঘন : ইসলামের ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশেদীন (আবূ বকর, ওমর, উসমান ও আলীর খিলাফতকাল- ৬৩২-৬৬১ খ্রি.) এর যুগ হলো ইসলামী গণতন্ত্রের যুগ। এ সোনালী যুগের অবসানের পরই শুরু হয় উমাইয়া বংশের রাজত্ব। উমাইয়া শাসনামলে রাজ্য বিস্তৃতি, অফুরন্ত ধনদৌলত লাভ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি ঘটলেও মানবাধিকার পরিপূর্ণভাবে সুরক্ষিত ছিল না। বরং শাসক শ্রেণির দ্বারাই বহুলাংশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। যার যৎসামান্য উল্লেখ করা হলো:

উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা মুয়াবিয়া (শাসনকাল ৬৬১-৬৮০ খ্রি.)। তিনি ছিলেন নীতিজ্ঞানহীন ও নির্দয়। তিনি ইসলামী সাধারণতন্ত্র বাদ দিয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিরপরাধ মানুষদের হত্যা, উৎকোচ, অপকৌশল প্রভৃতি দুরাচারের মাধ্যমে মুসলিম সাম্রাজ্যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের ক্ষমতা নিষ্কন্টক করার ব্যাপারে ধর্মকে অবজ্ঞা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করা ছিল তার কাছে খুবই সাধারণ বিষয়। নবী ﷺ–এর নাতি হযরত হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা, বেআইনীভাবে নিজ পুত্র ইয়াযীদকে মনোনয়ন, আবদুর রহমানের গুপ্ত হত্যা ইত্যাদি তার অপরাধের সামান্য দৃষ্টান্ত।[২৩]

উমাইয়া বংশের আরেকজন শাসক হলেন মুয়াবিয়ার অযোগ্য, অধার্মিক, মদ্যপায়ী ও বিলাসপরায়ণ পুত্র ইয়াযীদ (শাসনকাল ৬৮০-৬৮৩ খ্রি.)। তার শাসনামলেই সংঘটিত হয় ৬১ হিজরীর ১০ই মহররমে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাসে এক নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। ইয়াযীদ সিংহাসনে আসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুফাবাসীগণ হুসায়নকে খলিফা হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমন্ত্রণ জানালে তাতে সাড়া দিয়ে হুসায়ন মুষ্টিমেয় বন্ধু ও পরিজন মিলে মোট ২০০ জন নর-নারীসহ কুফায় রওয়ানা হন। কিন্তু ইতোমধ্যেই উমাইয়াগণ উৎকোচ দিয়ে ইরাকীদের বশীভূত করে হুসায়নকে বাধা প্রদানের প্রস্তুতি নেয়। ইরাকীদের ওয়ালী উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ পারস্য বিজয়ী ওমর বিন সাদকে ৪০০০ সৈন্যসহ হুসায়নের মুকাবেলার জন্য পাঠান। হুসায়ন কারবালা নামক স্থানে পৌঁছে দেখলেন যে, শত্রুরা তাকে ঘিরে ফেলেছে। ফলে তিনি ওমর বিন সাদের কাছে প্রস্তাব দেন যে, হয় তাঁকে ইয়াযীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হোক, কিংবা মদিনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক, অথবা তুর্কী সিমান্তে জিহাদে যেতে দেয়া হোক। বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া ওমর বিন সাদ কোন প্রস্তাবই মানেননি। অবরুদ্ধ হুসায়ন শিবিরের লোকেরা পিপাসায় কাতর হয়ে উঠল। এমতাবস্থায় শত্রুরা দূর থেকে তীর ছুঁড়ে হুসায়ন

---

[২২] *সামাজিক স্তর বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

[২৩] ড. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, *আরব জাতির ইতিহাস*, সম্পাদক, প্রফেসর ড. মো. ফজলুল হক, (ফেমাস বুকস্, জুলাই ২০১৭), পৃ. ১৪৩-১৪৮।

শিবিরের বহু লোককে এমনকি পিপাসায় কাতর শিশু-সন্তানকেও হত্যা করলো। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হুসায়ন (রাযি.) বাধ্য হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে কারবালার প্রান্তরে নিহত হলেন। এ নির্মম হত্যাকাণ্ডে জয়নাল আবেদীন ছাড়া হুসায়ন পরিবারের কোন পুরুষই জীবিত ছিলেন না। হুসায়নকে কারবালায় দাফন করে তার পরিজনকে মদিনায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। নবী ﷺ-এর আহলে বায়ত মদিনায় পৌঁছলে মদিনাবাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে মদিনার ওয়ালী উসমান বিন মুহাম্মদকে বিতাড়িত করে ইয়াযীদের সিংহাসনচ্যুতি ঘোষণা দেন। এ বিদ্রোহ দমন করতে ইয়াযীদ ওকবা বিন মুসলিমকে পাঠালে ওকবার বাহিনী মদিনাবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং মদিনার মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, ইমারত প্রভৃতি ধ্বংস করে দেয়।[২৪]

উমাইয়া বংশের আরেকজন শাসক আবদুল মালিক (শাসনকাল ৬৮৫-৭০৫ খ্রি.)। তাঁর শাসনামলে সিরিয়াবাসীদেরকে সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ইরাকীদের তুলনায় সিরিয়াবাসীদের কম ভাতা ও সম্মাননা দেয়া হতো বিধায় অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে সিরিয়াবাসীগণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এ যুদ্ধকে বলা হয় তোস্তার যুদ্ধ। যদিও পরবর্তীতে ইরাকী ও সিরীয়দের ভাতা সমান হবে মর্মে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল।[২৫]

উমাইয়াদের আরেক শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। হাজ্জাজ ছিলেন উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের (শাসনকাল ৭০৫-৭১৫ খ্রি.) নিষ্ঠুর প্রাদেশিক শাসনকর্তা। হাজ্জাজের নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বহু ইরাকী হিযাজে হিজরত করেছিল। হাজ্জাজ প্রতিহিংসার বশবতী হয়ে ১২০,০০০ মতান্তরে ১৫০,০০০ লোক হত্যা করেন। হাজ্জাজের মৃত্যুর সময় (৭১৪ খ্রি.) প্রতিপক্ষের ৫০,০০০ লোক কারাবন্দি ছিল।[২৬] উমাইয়া বংশের আরেকজন খলিফা আবদুল মালিকের বিলাসপরায়ণ পুত্র ইয়াযীদ (শাসনকাল শুরু ৭২০ খ্রি.)। তিনি সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক খলিফা ওমর বিন আবদুল আযিযের ইন্তেকালের দিন খিলাফত লাভ করেন। তিনি দ্বিতীয় ইয়াযীদ হিসেবে খ্যাত। এ দ্বিতীয় ইয়াযীদের আমলেও মানবাধিকার সুরক্ষিত ছিল না। কেননা, তিনি মুয়াবীয় আরবদের সু-দৃষ্টিতে দেখতেন আর হিমারীয়দের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতেন।[২৭]

উমাইয়া বংশের আরেকজন শাসক হলেন দ্বিতীয় ওয়ালিদ (শাসনকাল ৭৪৩-৭৪৪ খ্রি.)। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি প্রতিপক্ষের কতিপয়কে বন্দি এবং কতিপয়কে হত্যা করেছেন। তিনি খলিফা প্রথম

---

[২৪] *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০।
[২৫] *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৬।
[২৬] *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০, ১৬৬-১৬৮।
[২৭] *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ালিদ ও হিশামের পুত্রগণের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন এবং ইরাকের শাসনকর্তা যায়েদ ও আলী বংশীয় যায়েদের পুত্র ইয়াইয়াকে হত্যা করেছেন।[২৮]

উমাইয়া যুগের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে সেখানেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। উমাইয়া যুগে সমাজের লোকেরা ছিল চারটি স্তরে বিভক্ত। যথা- ১. খলিফা, রাজপরিবারের সদস্য ও বিজেতা আরবগণ, এরা ছিলেন প্রথম শ্রেণির নাগরিক ও সুবিধাভোগী। এরা রাজকোষ থেকে প্রচুর ভাতা পেতেন; ২. উমাইয়া যুগে মাওয়ালিগণ অনারব মুসলিম হওয়ার কারণে সাধারণ মুসলিমদের সমান মর্যাদা পায়নি। সমভাবে কথা বলা, সকলের সাথে একত্রে পথ চলা ও সমআসনে বসার অধিকার তাদেরকে দেয়া হতো না। পদবী ছাড়া পুরোনামে তাদেরকে ডাকা হতো না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে নিকৃষ্ট আসনটি তাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। কোন আরব মহিলাকে বিয়ে করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। খলিফা আবদুল মালিকের নির্দেশে ইরাকের নিষ্ঠুর শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ভাতার তালিকা থেকে সকল মাওয়ালিদের নাম কেটে দেন এবং তাদের উপর জিযিয়া করও আরোপ করেন। মাওয়ালিগণ ছিল যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত, অপমানিত ও উপেক্ষিত; ৩. ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, সাবীয়ান এবং পৌত্তলিক। এরা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক ও জিম্মি হিসেবে গণ্য হতো; ৪. দাস-দাসী। এরা ছিল সর্বনিম্ন শ্রেণির।[২৯]

সারকথা হলো, উমাইয়া শাসক মুয়াবিয়া থেকে শুরু করে সুলাইমান পর্যন্ত (৬৬১-৭১৫ খ্রি.) শাসনামলে চলেছিল রক্তের হোলি খেলা, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ধর্মবিরোধী কার্যকলাপ ও মানবতার এক দুর্যোগ মুহূর্ত। কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ড, মক্কা ও মদীনার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ, আলী বংশীয়দের প্রতি নির্যাতন, হাজ্জাজের নিষ্ঠুর শাসনে ইরাক, আরব ও পারস্য বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠা, প্রতিপক্ষকে হত্যা প্রভৃতি মানবাধিকার লঙ্ঘন ছিল বিশাল উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম বৃহৎ কারণ।

আব্বাসীয় শাসনামলে [৭৪৯-১২২৮ খ্রি.] মানবাধিকার লঙ্ঘন : উমাইয়া শাসনের পতনের পর শুরু হয় আব্বাসীয় শাসনের যুগ। আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ (শাসনকাল ৭৪৯-৭৫৪ খ্রি.) হলেন প্রথম আব্বাসী খলিফা। তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আস-সাফ্ফাহ অর্থাৎ খুনপিপাসু উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় খিলাফতকালে গোটা সাম্রাজ্যে রক্তগঙ্গা বইয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ প্রদেশের উমাইয়াদেরকে পাইকারি হারে হত্যা করে। আবুল আব্বাস নিজে ইরাকের সমস্ত উমাইয়াদের ধ্বংস করেন। ধর্ম, মনুষত্ব ও দয়ামায়া বিসর্জন দিয়ে উমাইয়াদেরকে শহরে, বন্দরে, পথে, প্রান্তরে, পাহাড়ে, জঙ্গলে, এমন-কি কবরস্থানে পর্যন্ত শিকারী কুকুরের ন্যায় অনুসন্ধান করে প্রতিহিংসা নিবৃত করা হয়। জীবিতদের হত্যার পর মৃতদের উপরেও তাঁর প্রতিহিংসা প্রতিফলিত হয়। তাইতো তিনি মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ, আবদুল মালিক প্রভৃতি খলিফার কবর খুঁড়ে হাড়গুলো উত্তোলন করেন এবং খলিফা

---

[২৮] *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮২।

হিশামের লাশ কবর থেকে তুলে লাশকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। শুধু ওমর বিন আবদুল আযীযের কবরকে তাঁরা অপবিত্র করেননি।[৩০]

আব্বাসীয়দের আরেকজন শাসক আবূ জাফর আল-মানসুর (শাসনকাল ৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)। তিনি তাঁর শাসনামলে তাঁরই বিশ্বস্ত প্রাদেশিক শাসক খোরাসানের জনপ্রিয় শাসনকর্তা আবূ মুসলিমকে প্রতারণামূলকভাবে হত্যা করেন। অথচ এ আবূ মুসলিম আব্বাসীয়দেরকে খিলাফতে প্রতিষ্ঠিত করতে কম-বেশি ছয় লক্ষ উমাইয়াকে হত্যা করেছিলেন। নিজের স্বার্থ রক্ষা ও নিজ বংশের পথ পরিস্কার করতে খলিফা আবূ জাফর আল-মানসুর হাসান ও হুসায়নের বংশধরদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন, মদিনার সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেন। বসরার যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইবরাহীমকে সাহায্য করত তাদের সকলকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, তাদের বসতবাড়ি, বাগান ও ক্ষেতখামার সবই ধ্বংস করা হয়। ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদকে কারারুদ্ধ করে চাবুক মারা হয়, ইমাম জাফর সাদিকের উপর নির্যাতন চালানো হয়। আর যারা বন্দি ছিল তাদেরকে গণহারে হত্যা করা হয়।[৩১]

আব্বাসী খলিফা মুস্তানসীর ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করলে তাঁর বিলাসপরায়ণপুত্র আবূ আহমাদ আবদুল্লাহ আল-মুস্তাসীম বিল্লাহ বাগদাদের সিংহাসনে আসীন হন। তিনি আব্বাসীয়দের শেষ খলিফা এবং তাঁর শাসনামলেই ধ্বংস হয় বাগদাদ নগরী। তাঁর শাসনামলে আরব-অনারব, মালেকী-হাম্বলী এবং শিয়া-সুন্নী মতানৈক্য প্রকট আকার ধারণ করে। তাঁর উযিরে আযম আল-কামী ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। তিনি শিয়াদেরকে খিলাফতে প্রতিষ্ঠিত করতে খলিফাকে আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত রেখে শিয়াদের শক্তি বৃদ্ধিতে প্রয়াস চালান। শিয়াদের নানামূখী ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে রাজপুত্র আবূ বকর কিছু সংখ্যক শিয়াকে কঠোরহস্তে দমন করেন। এতে শিয়া উযির আল-কামী ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খুনপিপাসু, অসভ্য ও বর্বর মোঙ্গল সরদার হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। হালাকু খান তাতে সাড়া দিয়ে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে সৈন্য সমাবেশ করে শহর অবরোধ করেন। দীর্ঘদিন অবরোধের পর নগর আত্মসমর্পণ করলে মোঙ্গলরা ছয় সপ্তাহ ধরে গোটা নগরে চালালো নিষ্ঠুরতা, হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ। রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল সর্বত্রই অগ্নিসংযোগ করা হলো। যুগ যুগ ধরে মহাপণ্ডিতদের আহরিত জ্ঞান ভাণ্ডার বাগদাদের লাইব্রেরী, যা ৫০০ বছরের মুসলিম ও অমুসলিম মনীষিদের অক্লান্ত সাধনার ফসল; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভূগোল, দর্শন, বীজগণিত, জ্যামিতি, রসায়ন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষণাকৃত মূলধন যাতে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল, সেই জ্ঞান ভাণ্ডার লাইব্রেরীও ধ্বংস করা হলো। নিরস্ত্র মুসলিম বাহিনী, নিরপরাধ মুসলিম নর-নারী, জ্ঞানী, পণ্ডিত, শিশু, বৃদ্ধ অসহায় জনতাকে কেটে, মেরে, দলে মথে পিষে ফেলা হলো। কাউকে উঁচু স্থান থেকে ফেলে হত্যা

---

[২৯] *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৫।

[৩০] *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০।

[৩১] *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

করা হলো; কাউকে হাত-পা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, কাউকে পাথর মেরে, কাউকে ছুঁরি বা তরবারীর আঘাতে হত্যা করা হলো। বাগদাদের রাজপথে মানব রক্তের স্রোত ধারা প্রবাহিত হয়ে টাইগ্রিসের স্রোত ধারায় পতিত হলো। নিষ্ঠুরতার ইতিহাসে বাগদাদের হত্যাযজ্ঞের তুলনা নেই। স্বয়ং খলিফাসহ বাগদাদের সর্বমোট ২০ লক্ষ নাগরিকের মধ্যে ১৬ লক্ষ নাগরিককেই নির্বিচারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। চারদিকে বিক্ষিপ্ত লাশের দুর্গন্ধে মহামারী দেখা দিলে খুনপিপাসু হালাকু খান অতিষ্ঠ হয়ে বাগদাদের বাইরে চলে যান। হালাকু খানের হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিতে গিয়ে সমসাময়িক ঐতিহাসিক জাওয়াইনী বলেন, সে হত্যাযজ্ঞ "শুধু অনুমান সাপেক্ষ, বর্ণনীয় নয়।" আল-ফাকরী বলেছেন, "সে ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না; শুধু অনুমান কর।"[৩২]

অতঃপর যদি ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টপাত করা হয়, সেখানেও মানবাধিকার হরণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

সুলতানী আমলে [১২০৬-১৫২৬খ্রি.] মানবাধিকার লঙ্ঘন : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী (শাসনকাল ১২৯৬-১৩১৬) দিল্লি সালতানাতের অন্যতম সুলতান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাঁর শাসনামলে উল্লেখযোগ্য নির্যাতন হচ্ছে সুলতানের নিদের্শে নও মুসলিমদের হত্যা। তাঁর শাসনামলে নও মুসলিমগণের প্রশাসনিক ও অন্যান্য উচ্চপদে নিয়োগ লাভের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় বিদ্রোহ করলে সুলতান সকল নও মুসলিমকে রাজকার্য থেকে বরখাস্ত করেন। এতে নও মুসলিমগণ অসন্তুষ্ট হয়ে সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। বিষয়টি সুলতান জানতে পেরে সকল নও মুসলিমকে হত্যার নির্দেশ দেন। তাঁর আদেশ মোতাবেক একদিনে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার নও মুসলিমকে হত্যা করা হয়।[৩৩]

সুলতান আলাউদ্দীন খুবই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাইতো সুলতান জালালুদ্দিনের যেসব অভিজাতবর্গ তাঁকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করেছিলেন, তিনি তাঁদের কাউকে বন্দি এবং কাউকে হত্যা করে বড় নৃসংশতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি রাজ্যে নিজের একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তিনি চরম অবহেলা প্রদর্শন করেন। স্বীয় সামরিক কর্মচারীদের সুবিধার কথা ভেবে তিনি ব্যবসায়ীদের ব্যবসার সব উৎস ধ্বংস করে দেন। তার বিশাল গুপ্তচর বাহিনী জনসাধারণের জীবনকে বিষাক্ত ও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।[৩৪]

সুলতানী আমলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হলো আমির তৈমুর (১৩৯৮-১৪১৩ খ্রি.) কর্তৃক দিল্লি আক্রমণ। তিনি ১৩৯৮ সালে দিল্লি দখলের সময় হিন্দু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হবেন এ

---

[৩২] *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-২৮৭।

[৩৩] ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, (জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৭), পৃ. ৭১।

[৩৪] *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

আশংকায় ১ লক্ষ হিন্দু নাগরিককে হত্যা করেন। আমির তৈমুর ভারতে বিশৃঙ্খলা, মহামারি ও দুর্ভিক্ষ রেখে যান। তিনি উত্তরভারতে রাজসরকারের সব নিদর্শন ধ্বংস করে দেন। ঐতিহাসিক বাদাউনি লিখেন: "নগরটি সম্পূণরূর্পে ধ্বংস হয়, আর যে সমস্ত অধিবাসীদের এখানে রেখে যাওয়া হয়, তারা সকলেই মারা যান।"[৩৫]

সুলতানী আমলে গণজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সুলতানী আমলে এমনও কিছু সুলতান ছিলেন যারা সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিতেন। যেমন, সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন অভিজাত শ্রেণির লোক ছাড়া কাউকে কখনও সরকারী উচ্চপদে বহাল করতেন না।[৩৬]

সুলতানী আমলে রাজ্যের কর্মকর্তা ও রাজবংশের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসঘাতকতা, অমানবিকতা, ক্ষমতা দখলের জন্য একে অপরকে হত্যা, পরবর্তী উত্তরাধিকারীকে কৌশলে বা ষড়যন্ত্র করে নিঃশেষ করা ইত্যাদি সবই পরিলক্ষিত হয়। অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত গোলযোগসহ বহু যুদ্ধ বিগ্রহ, বিদ্রোহও সংঘটিত হয়। বিদ্রোহীদের দমনে সুলতানগণ খুবই কঠোর ও নির্মম ছিলেন। সুলতানগণ কখনও জনসাধারণের মতামতকে তোয়াক্কা করতেন না। তাই কাগজে কলমে যদিও দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি ছিল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার উপর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না।

মোঘল আমলে [১৫২৬-১৮৫৮ খ্রি.] মানবাধিকার লঙ্ঘন: মোঘল আমলে উল্লেখযোগ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা হলো সম্রাট আকবরের শাসনামলে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে আহমদ নগর দখল। আকবর আহমদ নগর দখলের জন্য যুবরাজ ড্যানিয়েল ও আবদুর রহিম খান-ই খানানকে পাঠালে তারা দুর্গের ১৫,০০০ সৈন্যকে হত্যা করে আহমদ নগর দখল করেন। এছাড়া আকবরের শাসনামলে মুঘল বাহিনী ছয় মাস পর্যন্ত আসিরগড় দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। শেষ পর্যন্ত দুর্গের ভেতর ভয়াবহ মহামারীর ফলে ২৫০০০ লোক মারা যায়।[৩৭] সম্রাট আকবর কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের উল্লেখযোগ্য আরেরকটি দিক হলো, তিনি মানুষের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছেন। স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনে বাধা দিয়েছেন। তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজেই একটি তথাকথিত ধর্ম 'দ্বীন-ই-ইলাহী' প্রবর্তন করেন। এটা মূলত কোন ধর্মই ছিল না। এর না ছিল কোন ঐশিগ্রন্থ, পুরোহিত, আর না ছিল কোন আচার-অনুষ্ঠান। ধমের্র চেয়ে এটা ছিল একটি রাজকীয় আদেশ। কারো মতে, এর উদ্দেশ্য ছিল, কিছু সংখ্যক সভাসদকে তাদের শাসকের নিজস্ব পূজায় অর্পন করা। সম্রাট আকবর চেয়েছিলেন ভারতের সমস্ত ধর্মাবলম্বী তাদের নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করুক। তিনি যা ইচ্ছে তাই করতেন। তাই তাঁর আইনে আপত্তির কিছু নীতি লক্ষ্যনীয়। তার নিদের্শ হলো- ১. জনগণ ইচ্ছা করলে ইসলাম ধর্ম

---

[৩৫] *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪।

[৩৬] *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

[৩৭] *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। অথচ মুসলিম আইনে এরূপ কাজ অবৈধ। ২. আকবর গরু জবাই নিষিদ্ধ করেন। শুধু হিন্দুদের সন্তুষ্ট করতে তিনি এ আইন জারি করেন। ৩. বাল্য বিবাহ বন্ধ- অথচ তা মুসলিম আইনে বৈধ। ৪. চাচাত-মামাত ভাই-বোন ও নিকটআত্মীয়দের সাথে বিবাহ বন্ধ করে দেন- অথচ তা মুসলিম আইনে বৈধ; ইত্যাদি।[৩৮] তার এরূপ আইন জারি মানুষের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপের শামিল।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এক যুগের কিছু অধিক সময়ের মধ্যে রাজকীয় উত্তরাধিকারের জন্য সাতটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এছাড়া পরবর্তী সম্রাটগণের সময় জনগণের উপর সরকারি দাবি-দাওয়া অত্যধিক হওয়ায় জনসাধারণের জীবন ধারণ অসহনীয় হয়ে পড়ে এবং সাাধারণ উৎপাদনকারীদের পক্ষে ঐসব দাবি পূরণ করা অসম্ভব হয়ে যায়।[৩৯]

ব্রিটিশ শাসনামলে মানবাধিকার লঙ্ঘন : ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসা ও খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে এই উপমহাদেশে আগমন করলেও অতি সুক্ষ্ম কূটকৌশলে এই দেশের শাসন ক্ষমতা ক্ষয়প্রাপ্ত মোঘল বংশ থেকে তারা কেড়ে নেয় এবং প্রায় দুইশো বছরের শাসনামলে ইংরেজরা এই দেশের ধন-সম্পদ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে (বৃটেনে) পাচার করে নিয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসনামলে মানবাধিকার সুরক্ষিত ছিল না। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুসলিমদের প্রতি ব্রিটিশ নীতি। যা সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিচায়ক। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের যুগে ইসলাম ও মুসলিমগণ ছিল লাঞ্ছিত, অপমানিত, অবহেলিত ও নির্যাতিত। ব্রিটিশরা এ উপমহাদেশ থেকে মুসলিমদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য যেসব নীতি অবলম্বন করেছিল তার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

ব্রিটিশরা ভারতের জেলার উচ্চপদ এমনকি রাজস্ব বিভাগের সমস্ত নীচ পদগুলো থেকে মুসলিমদের বের করে দেয় এবং মুসলিমদের জমিদারী ছিনিয়ে নেয়। মুসলিম আমলে কোন কোন এলাকায় খাজনা আদায়কারী বা জমিদার হিসেবে মুসলিমগণ উচ্চপদে থাকলেও ব্রিটিশ আমলে ঐসব এলাকায় হিন্দুগণই কৃষকদের থেকে রাজস্ব আদায় করত। ফলে বিপুল সংখ্যক মুসলিম জমিদার ও তাদের পৌষ্য দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। কোর্ট-কাছারী, রাজনীতি, সামরিক বিভাগসহ বিভিন্ন পর্যায় থেকে মুসলিমদের বঞ্চিত করা হয়। যেসব মুসলিম এসব পদে চাকুরিরত ছিল সকল পর্যায় থেকে মুসলিমদের সেই চাকুরি ছিনিয়ে নেয়া হয়। ভাষা ও শিক্ষানীতিতেও মুসলিমদের অধিকার হরণ করা হয়। রাষ্ট্রভাষা ফার্সি থেকে ইংরেজি করার কারণে জনসাধারণের একটি বিরাট শিক্ষিত অংশ শুধু ইংরেজি না জানার কারণে অশিক্ষিতের পর্যায়ে নেমে যায় এবং মুসলিমগণ রাতারাতি তাদের চাকুরি থেকে বঞ্চিত হয়। মুসলিমদের শিক্ষা প্রণালি ধ্বংস করতে অবলম্বন করা হয় অত্যন্ত কঠোর পন্থা। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যেও মুসলিমগণ

---

[৩৮] *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৫।

ক্ষতিগ্রস্ত হন। উপমাহাদেশের বর্হিবাণিজ্য ছিল মুসলিমদের হাতে। ইংরেজ জলদস্যুদের হাতে সেই ব্যবসা হারালে মুসলিম ব্যবসায়ীগণ দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ইংরেজগণ এখানেও হস্তক্ষেপ ও ষড়যন্ত্র করে দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি করে। ইংরেজগণ তাদের নিজস্ব মালামাল কিনতে বাজারের নাগরিকদের বাধ্য করে, এতে রাজি না হলে তাদেরকে মারধোর করে। এভাবে বাজারের প্রতিযোগিতা নষ্ট হয়ে যায় এবং স্থানীয় ব্যববসায়ীগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এসব ব্যবসায়ীদের একটি বিরাট অংশ ছিল মুসলিম। অভ্যন্তরীণ ও বর্হিবাণিজ্য ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মুসলিম ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মুসলিমদের কৃষিশিল্প ও শ্রমশিল্পও তারা বিভিন্ন উপায়ে ধ্বংস করে ফেলে। মূলত এটাই ছিল এই উপমাহাদেশে মুসলিমদের প্রতি ব্রিটিশ নীতি।[৪০]

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে (১৮৫৭ সালে) স্বাধীনতার যুদ্ধ : এ আন্দোলনের পিছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামরিকসহ যেসব কারণ ছিল তাতে ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতবর্ষে জণগণের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার উপকরণ সুস্পষ্ট বিদ্যমান। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশদের নীতি ছিল- ১. দেশীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাকে হেয় করা ও মুসলিমদের পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করা। খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ও এর সংস্কৃতির উন্নতির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কর্তৃক সর্বদা হিন্দু ও মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহকে অপমান করা। ২. বিভিন্ন চাকুরির উচ্চপদ জনসাধারণের জন্য বন্ধ করা, বেকারত্ব বৃদ্ধি, মোঘল রাষ্ট্রের শিল্পী ও মেধাসম্পন্ন লোকদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়া, লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক স্বোবাইতে নিযুক্ত 'ইনাম কমিশন' দাক্ষিণাত্যে প্রায় ২০,০০০ জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা। এ সব কারণে মুসলিম ও অন্যান্যদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ৩. সম্পত্তি উত্তরাধিকার আইনে পরিবর্তন সাধন। কেউ ধর্ম পরিবর্তন করলেও পূর্বের ধর্মের আত্মীয়-স্বজনের উত্তরাধিকার হবে। অথচ হিন্দু-মুসলিম আইন অনুযায়ী কেউ ধর্ম ত্যাগ করলে সে তার পূর্ববর্তী ধর্মের আত্মীয়-স্বজনের উত্তরাধিকার হারাবে। ৪. দেশীয় সিপাহীদের অনেকগুলো সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা। যেমন- প্রত্যক্ষ সামরিক কার্যের সময় অতিরিক্ত ভাতা, কতগুলো শুল্ক থেকে মুক্ত থাকা, সরকারি ডাক ব্যবহার করা ইত্যাদি।[৪১]

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্মম পরিণতি নেমে আসে মুসলিমদের উপর। বিশেষ করে মুসলিম ওয়াহাবীদের উপর। স্বাধীনতার যুদ্ধের পর দশ থেকে পনের বছর পর্যন্ত ব্রিটিশরা ভারতের মুসলিমদেরকে সমূলে ধ্বংস করার কার্যক্রম শুরু করে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে হাজার হাজার মুসলিম নর-নারী নিজেদের জীবন বাঁচাতে দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। ঐ সময় বহু মুসলিমকে ফাঁসি দেওয়া হয়, কাউকে গুলি করে হত্যা এবং কাউকে যাবজ্জীবন কারাবাস ও আন্দামানে নির্বাসন দেয়া হয়।[৪২]

---

[৩৯] *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫০-২৫১।

[৪০] *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২-৩৪৬।

[৪১] *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫-৩৫৮।

[৪২] *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০-৩৬১।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭১) মানবাধিকার লঙ্ঘন : ১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশে মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উভয় অংশের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) মধ্যে সমঅধিকার প্রতিফলিত হয়নি। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি বিভিন্নভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকারকে হরণ করে। তন্মধ্যে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার কেড়ে নেয়া এবং অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যতম।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন : মানুষের ভাষার ভিন্নতা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন। প্রতিটি মানুষের তার মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার রয়েছে। বহু জাতিসত্তা নিয়ে গড়া পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। তারপরও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি বাঙালিদের উপর জোর করে উর্দূকে রাষ্ট্রীয়ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিচ্ছিল। ১৯৪৮ সালে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দেন যে, উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার এক অপপ্রয়াস এবং মায়ের ভাষাকে অবমাননার জঘণ্য আচরণ। মায়ের ভাষার উপর এ ধরনের আগ্রাসী আক্রমণ মেনে নিতে পারেনি বাঙালিরা। তাইতো এ ঘোষণার ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ। বাংলা ভাষাকে উর্দূর সমমর্যাদার দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানের রাজপথ। ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হবার পর উর্দূকে রাষ্ট্রভাষার করার বিষয়টি পুনরায় ঘোষণা দেন। প্রতিবাদে জনগণ সমগ্র প্রদেশে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল করে গণরোষের বিস্ফোরণ ঘটায়। ব্যাপাক আন্দোলনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। আন্দোলন দমাতে পুলিশ ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করে সভা ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ছাত্র ও জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে ভাষার দাবিতে শ্লোগান দিতে থাকে। হঠাৎ গুলিবর্ষণ করে পুলিশ। পুলিশের গুলিতে নিহত হন আবদুস সালাম, বরকত, রফিকউদ্দিন আহমেদ, আবদুল জব্বার সহ অনেকে। মাতৃভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনায় পরিণত হয়। পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে গর্জে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনতা। আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে। টলে ওঠে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। অতঃপর জনরোষ, গণআন্দোলন ও গণসমর্থনের চাপে ১৯৫৬ সালে সংবিধানে বাংলা ও উর্দূকে সমভাবে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।[৪৩]

চাকুরি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য : ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা লাভের পূর্বে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। পূর্ব পাকিস্তানের উৎপন্ন পাট বিদেশে রপতানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হলেও সেই

---

[৪৩] *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১-৪১২।

বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশই খরচ হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সামরিক বিভাগ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সিভিল সার্ভিস প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান অগ্রগামী। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানকে তার প্রকৃত পাওনা তথা ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এমনিভাবে জাতীয় সম্পদও কেন্দ্রীভূত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় পুঁজিপতির হাতে। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের উপর শোষণ-নিপীড়ন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। বাণিজ্য ভারসাম্য, উন্নয়ন খরচ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বৈদেশিক ঋণের বন্টন, বৈদেশিক সাহায্যের মোট প্রবাহ, রাজস্ব ব্যয়ের বিতরণ, প্রতিরক্ষা ব্যয়সহ প্রত্যেকটি পর্যায়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১৯৫৫ সাল পর্যন্তঃ সচিব পদে: পূর্ব পাকিস্তান ০০, পশ্চিম পাকিস্তান ১৯, পূর্ব পাকিস্তানে মোট সংখ্যা –। যুগ্ম সচিব: পূর্ব পাকিস্তান ৩, পশ্চিম পাকিস্তান ১৮, পূর্ব পাকিস্তানে মোট সংখ্যা ৭.৩%। উপসচিব: পূর্ব পাকিস্তানন ১০, পশ্চিম পাকিস্তান ১২৩, পূর্ব পাকিস্তানে মোট সংখ্যা ৭.৫%। সমহসচিব: পূর্ব পাকিস্তান ৩৮, পশ্চিম পাকিস্তান ৫১০, পূর্ব পাকিস্তানে মোট সংখ্যা ৭.০০%। সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার- সেনাবাহিনী: পূর্ব পাকিস্তান ১৪, পশ্চিম পাকিস্তান ৮৯৪। নৌবাহিনী: পূর্ব পাকিস্তান ৭, পশ্চিম পাকিস্তান ৫৯৩। বিমানবাহিনী: পূর্ব পাকিস্তান ৬০, পশ্চিম পাকিস্তান ৬৪০।[৪৪]

বিদেশী সাহায্য ও ঋণের বণ্টন

বিদেশী উন্নয়ন সাহায্য : পূর্ব পাকিস্তান- ৯৩.৮৯ কোটি রুপী, মোট ব্যয় ১৭%; পশ্চিম পাকিস্তান- ৩৩৩৫.২২ কোটি রুপী, মোট ব্যয় ৬২%। মার্কিন পণ্য সাহায্য : পূর্ব পাকিস্তান- ১২৯.০০ কোটি রুপী, মোট ব্যয় ৩০%; পশ্চিম পাকিস্তান- ২৬২.০০ কোটি রুপী, মোট ব্যয় ৬৪%।

বৈদেশিক সাহায্যের মোট প্রবাহ

দ্বিতীয় পরিকল্পনা- ৪ বছর (১৯৬১-৬৫) : মোট ২,৫৮২ মিলিয়ন টাকা। পূর্ব পাকিস্তান- ৭.৬২, পশ্চিম পাকিস্তান-১০,২৫৫। তৃতীয় পরিকল্পনা- (১৯৬৫-৭০) : মোট ৪,৪৮১ মিলিয়ন টাকা। পূর্ব পাকিস্তান- ৬৯০৪, পশ্চিম পাকিস্তান- ১১,৩৮৫।

কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন বরাদ্দ (১৯৪৭-৪৮) হইতে (১৯৬০-৬১)

বিনিয়োগ : পূর্ব পাকিস্তান- ১৭২ কোটি টাকা, পশ্চিম পাকিস্তান- ৪৩০ কোটি টাকা। ঋণ : পূর্ব পাকিস্তান- ১৮৪ কোটি টাকা, পশ্চিম পাকিস্তান- ২২৪ কোটি টাকা। অনুদান : পূর্ব পাকিস্তান- ৭৬ কোটি টাকা, পশ্চিম পাকিস্তান- ১০১ কোটি টাকা।

সুতরাং এটা অতি স্পষ্ট যে, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকারসমূহ চরমভাবে ক্ষুন্ন করেছে, পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের ন্যায্য হিস্যা থেকে করেছে বঞ্চিত এবং হরণ করেছে তাদের মৌলিক মানবাধিকার। তাইতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া পূর্ব পাকিস্তানের মানুষগুলো

[৪৪] *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮-৪১৯, ৪২২-৪২৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ন্যায্য হিস্যা আদায়ে এক পর্যায়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়। তবুও টনক নড়েনি শাসকগোষ্ঠির। শাসকগোষ্ঠির হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে ঢাকা সহ পূর্ব পাকিস্তানের সকল সেনানিবাসে বাঙালি সৈন্যদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে তারা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। গর্জে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা। পাক হানাদার বাহিনী চেয়েছিল অস্ত্রের জোরে বাঙালিদের দাবিয়ে রাখতে। কিন্তু তাদের এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়। নিজেদের মানবাধিকার সুরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধীনতার দাবিতে রূপলাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়। ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ থেকে শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার যুদ্ধ। পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতা ও নিষ্ঠুর আচরণে চরমভাবে লঙ্ঘিত হয় মানবাধিকার। তারা কেড়ে নেয় অসংখ্য মা বোনের ইজ্জত, লুণ্ঠন করে নেয় অর্থ-সম্পদ, জ্বালিয়ে দেয় অসংখ্য ঘর-বাড়ি, হত্যা করে বহু বুদ্ধিজীবি ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের। অতঃপর টানা ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এবং ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ হানাদার মুক্ত হয়। পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়। পূর্বাঞ্চলে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের।[৪৫]

অতঃপর যদি আধুনিক সভ্যতার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়, তাহলে নিকট অতীত ও বর্তমান সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আরো নির্মম চিত্র অবলোকন করা যায়। দু'টি বিশ্ব যুদ্ধের পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত যে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছে স্বাধীন প্রায় সব রাষ্ট্রের সংবিধানে ওই ঘোষণাপত্রে বর্ণিত মানবাধিকারগুলো মৌলিক অধিকার হিসেবে স্থান পেয়েছে। মানবাধিকার সংরক্ষণের এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হলেও বর্তমান বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মানবাধিকার বিষয়ক ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জিং অধ্যায় বলে মনে করেন। শুরুতেই খোদ জাতিসংঘ মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথ উন্মুক্ত করেছে, ফলে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ কয়েকটি রাষ্ট্রকে 'ভেটো' প্রয়োগের নিরঙ্কুষ ক্ষমতা প্রদান করে মানবাধিকার সংরক্ষণের পথকে সংকুচিত করে ফেলেছে।

মানবাধিকার সনদকে পদতলে পিষ্ট করে মুসলিমদের উপর মিয়ানমারের জেল-জুলুম ও নির্যাতন, ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসনে সেখানকার নিরীহ বেসামরিক মানুষ হত্যা, আফগানিস্তান ও ইরাকে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীর নগ্ন আগ্রাসন, গণহত্যা, স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা হরণ, সিরিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় সার্ব বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা, আলবেনিয়ায় গণহত্যা, স্বাধীনতাকামী কাশ্মীর ও মিন্দানাওয়ে মুসলিম নিধন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতির ফলে আজ জাতিসংঘের অস্তিত্বকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের মতে, ক্ষমতা মানুষকে বেশি কলুষিত করে। এ সূত্র ধরে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র কর্তৃক কলুষিত হচ্ছে আজ বিশ্ব মানবাধিকার।

বর্তমান শতাব্দীতে জাতিসংঘ ও ওআইসি এর অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মানবাধিকার সমস্যা প্রকট হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। বিশ্বের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী মৌলিক মানবাধিকার-সংক্রান্ত সমস্যার শিকার। ক্ষুধা, দরিদ্রতা, অপুষ্টি, বেকারত্ব, নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘন, সামাজিক, রাজনৈতিক,

---

[৪৫] *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০, ৪৪২।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সীমাহীন সমস্যার পাহাড় রীতিমতো উদ্বেগের কারণ।[৪৬] নিম্নে মানবাধিকার লঙ্ঘিত ঘটনাবলির অন্যতম কয়েকটি ঘটনা অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো। যেগুলোকে মরুভূমির বিশাল বালু রাশির মধ্যকার মাত্র কয়েকটি বালুকণা তুল্য বলা যেতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর এ যুদ্ধ শেষ হয়। এ যুদ্ধে মিত্রশক্তি বিজয় লাভ করে। মিত্রশক্তির নেতৃত্বে ছিল ফ্রান্স, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র। পক্ষান্তরে সেন্ট্রাল পাওয়ার্সের নেতৃত্বে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও অটোমান সাম্রাজ্য। এ যুদ্ধে ইতিহাসের বেশ কয়েকটি ভয়াবহ লড়াই সংঘটিত হয়। রাসায়নিক ও বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শত্রুপক্ষকে পরাজিত করতে নির্দয়ভাবে এসব মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উভয় পক্ষের ৯০ লাখ সামরিক এবং ৭০ লাখ বেসামরিক লোক মারা যায়। অর্থাৎ সব মিলিয়ে কমপক্ষে দেড় কোটি লোক নিহত হয়। এছাড়া আহত হয় প্রায় সোয়া ২ কোটি লোক। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোতে খাদ্য সংকটে অসংখ্য লোক মারা যায়। যুদ্ধকালে মিত্রশক্তি কর্তৃক জার্মানির উপর নৌ অবরোধের কারণে যুদ্ধের শেষ দু'বছরে পুষ্টিহীনতায় ৮ লাখ বেসামরিক জার্মান মারা যায়। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মহামারি আকারে ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়িয়ে পড়লে এ রোগে বিশ্বব্যাপী ২ কোটির বেশি লোক মারা যায়। এ যুদ্ধের বড় বড় যুদ্ধক্ষেত্রগুলো বিরাট ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়, অর্থনৈতিক অবস্থা চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধ শেষে পরাজিতদের চরম অমানবিকতা ও লাঞ্ছণার শিকার হতে হয় এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশ শোক ও হতাশায় নিমজ্জিত হয়।[৪৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর এবং শেষ হয় ১৯৪৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। এ যুদ্ধে অক্ষশক্তি ছিল জার্মানী, জাপান ও ইতালী। আর মিত্রশক্তি ছিল যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, কানাডা, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, জাতীয়তাবাদী চীন প্রভৃতি সামরিক জোট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উভয় পক্ষই তাদের ইচ্ছা ও সুবিধামতো চরম অমানবিক ও ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মোট ৫ কোটি লোক নিহত হয়। তন্মধ্যে সৈন্য ছিল ১ কোটি ৯০ লাখ।[৪৮]

হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ : দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জাপানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে মার্কিন সামরিক বাহিনী ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে জাপানের হিরোশিমায় বিশ্বের প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। আণবিক বোমা নিক্ষেপে তাৎক্ষণিক নিহত হয় এক লাখ ২০ হাজার মানুষ এবং পরে মারা যায় এর দ্বিগুণ- এটা ছিল এক মহাপ্রলয়। আণবিক বোমাবর্ষণ কতটা ভয়ংকর ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত 'লিটল বয়' নামক বোমাটি ছিল ইউরেনিয়াম - ২৩৫ সমৃদ্ধ ৬৪ কেজি ওজনের। বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ার স্থানটিতে ১৬ কিলোটনের (৬৭ টিজে) সমপরিমাণ একটি বিস্ফোরণ ঘটে। এ বোমার ধ্বংসযজ্ঞের আয়তন ছিল এক মাইল ব্যাসার্ধ। ৪ দশমিক ৪ বর্গমাইল স্থানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকানদের হিসাব মতে, শহরের ৪ দশমিক ৭ বর্গমাইল এলাকা ধ্বংস হয়ে যায়। জাপানি কর্মকর্তাদের মতে, হিরোশিমার ৬৯ শতাংশ ভবন ধ্বংস হয়ে যায় এবং আরো ৭-৮ শতাংশ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিস্ফোরণে ৭০ থেকে ৮০ হাজার লোক নিহত হয়। তন্মধ্যে

---

[৪৬] *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪, সোমবার, পৃ. ৪, শিরোনাম- মানবাধিকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, প্রবন্ধকার: শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন।

[৪৭] সাহাদত হোসেন খান, *প্রথম বিশ্বযুদ্ধ,* (ঢাকা, আফসার ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ- মে ২০১৭), পৃ. ১১, ১২, ৩৪, ৩৫, ৫০-৫২, ৫৬-৫৭।

[৪৮] সাহাদত হোসেন খান, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্রাজেডি*, (ঢাকা, আফসার ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১৬), পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

সৈন্য ছিল ২০ হাজার। আর আহত হয় ৭০ হাজার। বিস্ফোরণে হিরোশিমার ৯০ শতাংশ ডাক্তার ও ৯৩ শতাংশ নার্স নিহত বা আহত হয়। আণবিক বোমাবর্ষণে শূণ্য দশমিক ২ থেকে শূণ্য দশমিক ৩ সেকেন্ড পর্যন্ত হিরোশিমার তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইটে পোঁছে। যেসব লোক এ তাপমাত্রায় কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি ছিল তারা জ্বলে ছাই হয়ে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং ইট ও পাথরগুলো গলে যায়। বোমা বিস্ফোরণে শহরটি ফুটছিল, আগুনে ঝলসে যাচ্ছিল এবং কুণ্ডলি পাঁকিয়ে ধোঁয়া উড়ছিল। ১৯৪৫ সালের শেষ নাগাদ এক হিসাবে বলা হয়েছে, বিষাক্ত তেজস্ক্রিয়ার ফলে আরো ৬০ হাজার লোক মারা যায়। হিরোশিমায় আণবিক বোমাবর্ষণে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় এক লাখ ৪০ হাজারে। এরপর তেজস্ক্রিয়তার কারণে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২০০৪ সালের ৬ আগস্ট পর্যন্ত হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ৩৭ হাজার ৬২ জন। আর ২০০৪ সালের শেষ নাগাদ জাপানে ঐ বোমায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৭০ হাজার।[৪৯]

নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ : প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষেপের তিন দিন পর ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট জাপানের নাগাসাকিতে 'ফ্যাটম্যান' নামক বিশ্বের দ্বিতীয় আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়। আণবিক বোমাটি ছিল ৮ কেজি ওজনের প্লুটোনিয়াম-২৩৯ সমৃদ্ধ এবং ১৯-২৩ কিলোটন শক্তিসম্পন্ন। নাগাসাকিতে আণবিক বোমাবর্ষণে তৎক্ষণাৎ ৭০ হাজার লোক নিহত হয় এবং ৯ আগস্ট তারিখে নিক্ষিপ্ত বোমার প্রতিক্রিয়ায় তার চেয়ে বেশি লোক মারা যায়। ১৯৯০-দশকের শেষ দিকে সরকারিভাবে জাপানি পরিসংখ্যানে বলা হয়, আণবিক বোমাবর্ষণে মৃত্যুর সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যায়। পরবর্তীতে আণবিক বোমার বিকিরণ ও তেজস্ক্রিয়তায় বেশি লোক মৃত্যুবরণ করে।[৫০]

গণধর্ষণ : প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উভয় পক্ষের বাহিনীই লক্ষ লক্ষ নারীকে গণধর্ষণের মতো ভয়াবহ গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়েছিল। এ অপরাধের পুরো হিসাব দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে এ ধর্ষণের ঘটনা কতটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তার কিছুটা অনুমান করা যায় দ্বিতীয় বিশ্বেযুদ্ধে পরাজিত পক্ষের নারীদের গণধষর্ণের কিছু বিবরণ থেকে। এ যুদ্ধে পরাজিতদের নারীদেরকে গণধর্ষণ করার ইতিহাস বিংশ শতাব্দির ইতিহাসে বৃহত্তম অপরাধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এবং পরবর্তীতে সোভিয়েত দখলদারিত্বকালে পরাজিত জার্মানিতে অধিকাংশ ধর্ষণ চালিয়েছে সোভিয়েত লাল ফৌজ। ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ২০ লাখ পর্যন্ত। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে প্রতি বছর আনুমানিক ২০ লাখ মহিলার অবৈধ গর্ভপাত ঘটনো হয়। শুধু বার্লিনে কমপক্ষে এক লাখ মহিলা ধর্ষিতা হয়। আনুমানিক দশ হাজার ধর্ষিতা মহিলা মারা যায়। পূর্ব জামার্নিতে সোভিয়েত দখলদারিত্বকালে সোভিয়েত সৈন্যদের ঔরসে কত লাখ শিশুর জন্ম হয়েছে আজ পর্যন্ত তার কোন হিসাব নেই। অধিকাংশ মা পাপের ফসল হিসেবে এসব অবৈধ সন্তানকে পরিত্যাগ করে। ২০১৫ সালে ৩ ফেব্রুয়ারী জার্মান দৈনিক ডার স্পাইগেলে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, আমেরিকান পদাতিক সৈন্যরা ৮ লাখ ৬০ হাজারের বেশি জার্মান মহিলা ও তরুণীকে ধর্ষণ করেছে। এমনকি জার্মান পুরুষ এবং বালকদেরকেও যৌন উৎপীড়ন করা হয়। ধর্ষণের এ ভয়াবহ অপরাধ অধিকৃত জার্মানির সোভিয়েত সেক্টর, বিট্রিশ, ফরাসি ও আমেরিকান সেক্টরে সংঘটিত হয়েছে। ব্রিটিশরা ৪৫ হাজার এবং ফরাসিরা ৫০ হাজার জার্মান নারীকে ধর্ষণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও ধর্ষণ বন্ধ হয়নি। এছাড়া জাপান, ইতালি, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড সর্বত্রই

---

[৪৯] সাহাদত হোসেন খান, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ীদের যুদ্ধাপরাধ*, (ঢাকা, রাবেয়া বুকস্, প্রকাশকাল ২০১৮), পৃ. ১১, ১২, পৃ. ১৯, ২৩।

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮, ৪০।

গণধর্ষণের অপরাধ ঘটে। মার্কিন সৈন্যরা জাপানের ওকিনাওয়াতে অন্তত ১০ হাজার নারীকে ধর্ষণ করেছে। ইতালিতে ৬০ হাজারের বেশি নারীকে ধর্ষণ করা হয়।[৫১]

মূলত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নির্মমতা ও ভয়াবহতা পুরো বিবরণ দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এ যুদ্ধ কত শিশুকে এতীম বানিয়েছে, কত মা-বোনকে বিধবা করেছে, কত মানুষের হৃদয়ে রক্ষক্ষরণ ঘটিয়েছে, কতজনের সুখের সংসার ভেঙ্গেছে, কত মানুষকে পঙ্গু ও অচল করে দিয়েছে, কত মানুষের ঘর-বাড়ি সব কিছু ধ্বংস করে নিঃস্ব বানিয়েছে এর বিবরণ কখনো পাওয়া যাবে না। এ দু'টি যুদ্ধ যে কতটা বর্বর ও অমানুষিক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল তা অভাবনীয়। বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে পশুতে পরিণত করেছিল। বর্তমানে বা নিকট অতীতে বিশ্বব্যাপী যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে বা হয়েছে, এ দু'টি যুদ্ধের তুলনায় সেগুলো কোন যুদ্ধই নয়। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল মানব ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বা বৃহত্তম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। কোন যুদ্ধই এ যুদ্ধের মতো এতোটা বিধ্বংসী নয়। এ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নারীকে গণধর্ষণ, বেসামরিক লোক হত্যা, আত্মসমর্পণকারী সৈন্য-যুদ্ধবন্দি-আহতদের নির্মমভাবে হত্যা, লাশ বিকৃতকরণ, আত্মসমপর্ণকারী ও পরাজিতদের বাধ্যতামূলক দাস বানানো ইত্যাদি কোন অপরাধই বাদ যায়নি। এমন কোন দেশ নেই এ যুদ্ধে কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। যুদ্ধে মিত্রশক্তি জয় লাভ করলেও মানবতা ও নীতিবোধ বিজয়ী হতে পারেনি।

কাশ্মীরে মুসলিমদের করুণ অবস্থা: ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর এখনো জ্বলছে। কাশ্মীরের ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের উপর আগ্রাসীদের নির্মম অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। কাশ্মীরী মুসলিমদের উপর ভারতীয় বিরাট সেনাবাহিনী ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও মাতৃজাতির সম্ভ্রম বিনষ্টের মাধ্যমে লোমহর্ষক ইতিহাসের সূচনা করেছে, যা গোটা বিশ্ব-মুসলিম বিবেককে দারুনভাবে আঘাত করেছে।

কাশ্মীরের যে বিষয়টি সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হলো সেখানে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। ২০০০ সালের মার্চ মাসে এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে বলা হয়, কাশ্মীরে ৯ বছর ব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামকালে বর্বর পুলিশ অথবা নিরাপত্তা বাহিনী শত শত লোককে গ্রেফতার করার পর তারা নিখোঁজ রয়েছে। এ্যামনেষ্টির হিসাবে ১৯৯০ সাল থেকে কাশ্মীরে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কারণে ৮ শতেরও বেশী লোক নিখোঁজ হয়েছে। নিখোঁজ লোকদের মধ্যে সাধারণ লোক, আইনজীবি, ব্যবসায়ী, শিক্ষক এবং শ্রমিকও রয়েছে। এ্যামনেষ্টির রিপোর্টে বলা হয়, ভারতের সাথে কাশ্মীরী মুজাহিদদের যুদ্ধে এ পর্যন্ত ১৭ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে।

কাশ্মীর পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত অংশটির নাম আজাদ কাশ্মীর আর ভারত নিয়ন্ত্রনাধীন অংশটুকু ছাড়াও গোটা কাশ্মীরকে জম্মু ও কাশ্মীর বলা হয়ে থাকে। কাশ্মীরের একটি জেলার নাম জম্মু। জম্মুতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ট। আর সমগ্র কাশ্মীরের শতকরা আশিজন মুসলিম। কাশ্মীরীরা ১৯৮৯ সাল থেকে তাদের স্বাধীনতার অধিকার আদায়ের লক্ষে সংগ্রাম শুরু করে। এ সংগ্রামে ২০০০ সাল পর্যন্ত দশ বছরে প্রায় ৪০ হাজার কাশ্মীরী ভারতীয় সেনাবাহিনীর গুলিতে মৃত্যুবরণ বরণ করে।[৫২]

মুসলিম রক্তে রক্তাক্ত আরাকান: চলতি শতকের নির্মম নির্যাতনের শিকার বার্মার অন্যতম মুসলিম অধুষ্যিত অঞ্চল আরাকান। বার্মার সামরিক শাসকের কবলে মুসলিম রোহিঙ্গারা যেন বন্দী। রোহিঙ্গারা

---

[51] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮, ১৫৪-১৫৬, ১৭৪, ২০০, ২৭৭, ৩১০, ৩৩১।

[৫২] মাওলানা হাবীবুর রহমান আশরাফী, *রক্তাক্ত বিশ্ব মুসলিম*, (থানভী লাইবেরী, আগষ্ট ২০০০), পৃ. ৭৯-৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দীর পর শতাব্দী আরাকানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেও নে-ইউনের আমলে পাস করা বর্ণবাদী নাগরিকত্ব আইনের ফলে আজ তারা ভাসমান বাসিন্দা।

বর্তমানে রোহিঙ্গারা ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈষম্যের শিকার। আরাকানী মুসলিমদের ইতিহাস হিমালয় সম দুঃখের ইতিহাস, বুকভরা কান্নার ইতিহাস। দিনের বেলায় বর্মী সেনারা কারণে-অকারণে মুসলিম জনপদে চালায় হাজারো অকথ্য নির্যাতন, যেন এটাই তাদের পেশা, আবার রাতে কর্তৃপক্ষের মদদে দস্যু ও সন্ত্রাসীরা চালায় অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচার।

২০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৫ লাখ রোহিঙ্গা তাদের দেশ ও আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে প্রতিবেশী বাংলাদেশ সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিয়েছে। আরাকানী মুসলিমদের উপর হাজারো নিপীড়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরলে তা এক বিরাট গ্রন্থের আকার নিবে। তবুও নিম্নে সামান্যতম কিছু তুলে ধরা হলো।

১৭৮৪ সালে পেলে বর্ণবাদী বর্মী বৌদ্ধরাজা বুদাপায়ী মুসলিম রাজ্য আরাকানের অন্তকলহ ও দুর্বলতার সুযোগে আরাকান দখল করে নেয়। ৪২ বছরের শাসনামলে সে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে হাজার হাজার নিরীহ মুসলিমকে হত্যা করে, ধ্বংস করে মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, জ্বালিয়ে দেয় মুসলিম অধুষ্যিত জনপদ। যার ফলে লাখ লাখ মুসলিম পালিয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় আশ্রয় নেয়। মুসলিম বিদ্বেষী ব্রিটিশ শাসনাকালেও এ অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। বুদাপায়ীর উত্তরসূরী সামরিক শাসক নে-উইন ও শাসক সওমং এর সময়ে এসে রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করে এবং ১৩টি সশস্ত্র সামরিক অপরেশন ও দাঙ্গা লাগিয়ে লাখো মুসলিমকে হত্যা ও দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ১৯৭৮ সালে নে-ইউনের সময় পরিচালিত নাগামিন কিং ড্রাগন অপারেশনে ১০ হাজার মুসলিম নিহত হয় এবং ৩ লাখেরও অধিক উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশসহ মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমায়। প্রায় ৪০ হাজারের মত বৃদ্ধ ও শিশু উদ্বাস্তু অনাহারে ক্যাম্পে মারা যায়। এরপর আরাকানে সবচেয়ে বেশী মুসলিম হত্যা সংগঠিত হয় ১৯৪২ সালে। তখন আরাকানের থাকিন পার্টির নেতা নোরাঙ্গের নেতৃত্বে মগ সৈন্যদেরকে অস্ত্র-সস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে লেলিয়ে দেয়া হয় মুসলিমদের উপর। মগ সৈন্যদের পাশবিক নির্যাতনের ক্ষত শুকানোর পূর্বেই ১৯৪৮ সালে আবার নেমে আসে আরাকানী মুসলিমদের উপর কালরাতের ছোবল। ১৯৬৪ সালে জাতীয়করণের নামে বিত্তশালী মুসলিমদের ঘরবাড়ী, দোকানপাট-জায়গা-জমি, বিভিন্ন যানবাহন ইত্যাদি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সেখানে মুসলিমদের হজ্জ আদায় করার সুবিধা প্রদান করা হয়নি।

বর্মী মুসলিম জনতার করুণ হাহাকারের চিত্র আজও বিদ্যমান। সেখানে মুসলিম মায়েদের উপর হচ্ছে অহরহ নির্যাতন। মা বোনদের ইজ্জতের মূল্য নেই বিন্দুমাত্রও। যুবক ভাইদেরকে অন্যধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য করা হচ্ছে, সন্তানহারা বর্মী মায়েদের আহাজারীতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত।

১৯৯২ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত বর্মী মগ-মিলিশিয়া ও সামরিক বাহিনীর নির্যাতনে বাংলাদেশে প্রায় দুই লাখেরও বেশী মুসলিম আশ্রয় নেয়। তারা আরাকানের মাটি থেকে মুসলিমদের চিরতরে উচ্ছেদের নেশায় সশস্ত্র বর্বর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। দু'শত বছরের বিভিন্ন সময়ে সশস্ত্র হামলার শিকার রোহিঙ্গা মুসলিম শরনার্থীদের নর-নারী এবং শিশুর করুণ আর্তনাদ ও আহাজারীতে নাফ নদীর এপারের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠে। পূর্বে নিপীড়নের হোতা ছিল সামন্তবাদী রাজারা আর এখন সমাজতন্ত্রের মুখোশ ধারীরা।[৫৩]

---

[৫৩] *রক্তাক্ত বিশ্ব মুসলিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৯০।

সম্প্রতি ২০১৭ সালের আগষ্ট মাসে মিয়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের ওপর যে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছে, তা আরো ভয়াবহ, বর্বর ও লোমহর্ষক। মিয়ানমার বৌদ্ধদের পরিচালিত নির্যাতন থেকে প্রাণ বাঁচাতে রাখাইন থেকে ২০১৭ সালের ২৫ আগষ্ট থেকে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৬ লাখ ৫৫ হাজারের অধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা, বিশেষ করে শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। শরণার্থীদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ হচ্ছে শিশু, এরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে। ঝুঁকির তালিকায় এরপর আছেন নারীরা। এছাড়া শরণার্থীদের মধ্যে ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী অথবা গুরুত আহত বা যথেষ্ট বৃদ্ধ, এরাও ঝুঁকিতে রয়েছে।[৫৪] আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাখাইন রাজ্য থেকে রোহিঙ্গাদের উৎখাত করতেই মানবতাবিরোধী অপরাধ করছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী। প্রতিবেদনে রাখাইনে হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের লোমহর্ষক চিত্র উঠে এসেছে। মিয়ানমারে বৌদ্ধরা মূলত রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা, জাতিগত নিধনযজ্ঞ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ করছে।[৫৫]

রক্তাক্ত চেচনিয়াঃ চেচনিয়া সুদৃঢ় ঈমানীশক্তিতে বলিয়ান স্বাধীনতাকামী মজলূম মুসলিমের তাজা রক্তে রঞ্জিত একটি জনপদের নাম। এই ক্ষুদ্র মুসলিম প্রজাতন্ত্রটি রুশ হানাদার বাহিনী কর্তৃক বর্বর হামলার শিকার। উপর্যুপরি বোমা হামলা ও গোলাবর্ষণের মাধ্যমে রাজধানী গ্রোজনীকে প্রায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে।

রুশ ফেডারেশনের ২১টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মধ্যে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট প্রজাতন্ত্র হলো চেচনিয়া। আয়তন ৭৭০০ বর্গমাইল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার সময় সোভিয়েতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করে পৃথক হয়ে যায়। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এক গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের রায়ের ভিত্তিতে চেচনিয়াও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। রুশ বাহিনীর সাবেক জেনারেল জওহর দুদায়েভ প্রজাতন্ত্রটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সাম্রাজ্যবাদী রুশ প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই মুসলিম প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেননি।

রুশ শাসক চেচনিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যায়িত করে তাদেরকে কঠোর হাতে দমনের সিদ্ধান্ত নেয়। স্বাধীনতা ঘোষণার তিন বছর পর্যন্ত চুপচাপ থেকে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ করে ইয়েলৎসিন অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত ৪০ হাজার সৈন্য চেচনিয়ায় প্রেরণ করেন। ৫ মাস একটানা যুদ্ধ হয়। চেচেন গেরিলাদের রণকৌশলের কাছে রুশ বাহিনী পরাজিত হয়। ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ইয়েলৎসিন যুদ্ধ বিরতির চুক্তি লঙ্ঘন করে রুশ বাহিনীকে পুনরায় চেচনিয়ায় আক্রমণ করার আদেশ দেন। রাশিয়ার বিশ্বাস ঘাতকতায় মুজাহিদরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। এবারও যুদ্ধে

---

[৫৪] দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, রোববার, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ পৃ. ১ কলাম ১ এবং পৃ. ৪ কলাম ৫, শিরোনাম- 'রোহিঙ্গারা আসছেই'।

[৫৫] দৈনিক *আলোকিত বাংলাদেশ*, বৃহস্পতিবার, ১৯ অক্টোবর ২০১৭, পৃ. ১ কলাম ২, এবং পৃ. ২ কলাম ৫, শিরোনাম- 'হত্যা ধর্ষণ নির্যাতনের লোমহর্ষক বর্ণনা'।

Dhaka University Institutional Repository

রাশিয়া প্রচণ্ড মার খেয়ে পুনরায় শান্তি চুক্তি করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং ১৯৯৬ সালের ৩১ আগস্ট উভয় পক্ষ শান্তি চুক্তিতে সাক্ষর করে। কিন্তু রাশিয়া বার বার শান্তি চুক্তি লঙ্ঘন করে একতরফা চেচনিয়ার উপর হামলা চালায়। ৫ বছর মেয়াদী চুক্তি অনুসারে ২ হাজার সালের ৩০শে জানুয়ায়ী পর্যন্ত চেচনিয়ায় স্থিতাবস্থা বজায় থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিন বছর যেতে না যেতেই চুক্তি লঙ্ঘন করে রাশিয়া চেচনিয়ার উপর এক অসম যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। রাশিয়া এবার চেননিয়ার উপর সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং রুশদের হাতে বহু চেচেন শহর পতন ঘটে। রুশ হামলায় বহু বেসামরিক লোক নিহত হয়। রাশিয়ার আকাঙ্খা হলো, চেচনিয়াকে ধ্বংস করে দেয়া; চেচনিয়া থেকে মুসলিমদের উৎখাত করে রুশদের নির্বাসিত করা। তাই তারা মুসলিমদের উপর গুম, নির্যাতন ও অত্যাচার, গণহত্যাসহ সব ধরনের বর্বরতা চালায়।[৫৬]

বসনিয়ায় বর্বরতা: বসনিয়া হার্জেগোভিনা মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ট একটি প্রজাতন্ত্র। এ অঞ্চলের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবস্থা খুবই করুণ। সেখানের জুলুম নির্যাতনের খবর পত্র-পত্রিকায় শতভাগের একভাগও প্রকাশিত হয় না। সার্বরা বসনীয় মুসলিম শিশুদের মায়ের সামনেই জবাই করে, জীবিত শিশুদের অঙ্গ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ছেলের সামনে মায়ের, ভাইয়ের সামনে বোনের, স্বামীর সামনে স্ত্রীর ইজ্জত হরণ করে, যুবকদের প্রকাশ্যে জবাই করে, কাউকে বা জীবিত দাফন করে, জনসাধারণকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য বন্দী মুসলিমদেরকে রশি দিয়ে গাড়ির পেছনে বেঁধে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায়।

বসনিয়ার বর্বর সার্ব (খ্রীস্টান চরমপন্থী) যুদ্ধ বাজরা যুদ্ধকালীন সময়ে যে বর্বরতা, গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে চরম পৈশাচিক চালিয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ একে একে আবিস্কার হচ্ছে। সার্বরা সেব্রোনিসা দখল করে শহরের ৮ হাজার মুসলিমকে সাঁরি বেঁধে হত্যা করে যে পার্বত্য এলাকায় মাটি চাপা দিয়েছিল তা ইতোমধ্যে আবিস্কৃত হয়েছে। এরপর উত্তর বসনিয়ার একটি পরিত্যক্ত লোহার খনিকে বৃহৎ গণকবর হিসেবে ব্যবহার করারও আলামত পাওয়া গেছে। এখানে প্রায় ৮ হাজার মুসলিম ও ক্রোটকে মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। মধ্য বসনিয়ায় ভেজুকা ও উত্তর বসনিয়ায় ৬টি গণকবর আবিস্কৃত হয়েছে। এ খবর বসনিয়া টেলিভিশনের।[৫৭]

২০১৫ সালের ২২ ডিসেম্বর 'দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ' পত্রিকায় 'বসনিয়ার যুদ্ধ সমাপনী ডেটন চুক্তি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে: "নব্বই দশকের গোড়ার দিকের বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার যুদ্ধ ছিল ১৯৪৫ সালের পর থেকে ইউরোপ অঞ্চলে হওয়া সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। এতে প্রায় এক লাক মানুষ নিহত এবং ২০ লাখের বেশি লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছিল, সেই সঙ্গে বসনিয়ার নারীদের সম্ভ্রমহানি, প্রিজন ক্যাম্প, মুসলিমদের গণহত্যাসহ অসংখ্য সমস্যা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছিল, যার সমাপ্তি ঘটেছিল এক 'অসম' শান্তিচুক্তির হাত ধরে। আর এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দীর্ঘসূত্রতার কারণ ছিল যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে জাতিসংঘ ও ন্যাটোর অদূরদর্শীতা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে মতৈক্যের অভাব।

২০১৫ সালের নভেম্বরে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা আর্কাইভ প্রকাশিত ডকুমেন্ট জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতা বিস্তারিত তুলে ধরেছে।

---

[৫৬] *রক্তাক্ত বিশ্ব মুসলিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১২১।

[৫৭] *রক্তাক্ত বিশ্ব মুসলিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১৫।

যুদ্ধ বিষয়ে পারদর্শী প্রবীণ সাংবাদিক ফ্লোরেন্স হার্টমান তার সম্প্রতি প্রকাশিত 'দ্য স্রেব্রেনিকা অ্যাফেয়ার' এ লিখেছেন, আগে প্রকাশিত মার্কিন ডকুমেন্টের উপর ভিত্তি করে এখনই বলা যায়, বসনিয়ান সার্বদের স্রেব্রেনিকা আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কে পশ্চিমা শক্তিগুলো অনেক আগে থেকেই অবহিত ছিল। ওই হামলার পরপরই ৮ হাজারেরও বেশি বসনিয়ান পুরুষ ও যুবককে হত্যা করা হয়।

জাতিসংঘের 'নিরাপদ এলাকা'ভুক্ত একটি শরণার্থী শিবির থেকে ৪০ হাজারেরও বেশি নারী ও শিশুকে উদ্বাস্তু অবস্থায় বের করে দেয়া হয়, যাদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব ছিল ডাচ শান্তিরক্ষী বাহিনীর।"[৫৮]

অতঃপর মানুষের কতিপয় মৌলিক অধিকারের বর্তমান অবস্থা অবলোকন করা যাক। এ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রতিবেদনে দৃষ্টিপাত করলেই তা সহজে অনুমান করা যাবে। যেমন-

জাতিসংঘের প্রতিবেদন: ২০১৫ সালে বিশ্বে বাস্তুচ্যুত মানুষ ৬ কোটি

২০১৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রায় সকল দৈনিক পত্রিকায় জাতিসংঘের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যাতে বলা হয়েছে: চলতি বছর বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এ বছর সারাবিশ্বে যুদ্ধ সহিংসতা ও নিপীড়নে ৬ কোটিরও বেশি মানুষ ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

গতকাল (১৮ ডিসেম্বর ২০১৫) জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদনে জানানো হয়, ঘর ছাড়া মানুষের সংখ্যা ২০১৫ সালের আগের যেকোন বছরের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। চলতি বছরের প্রথমার্ধ থেকেই বিপুল সংখ্যক মানুষ শরণার্থী, আবাসন প্রার্থী অথবা বাস্তুচ্যুত জীবনযাপন করেছে। পুরো বছরের হিসাব আকাশচুম্বী হবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছে ইউএনএইচসিআর। প্রতিবেদনে সংস্থাটি বলেছে চলতি বছর ১০ লাখের মতো মানুষ ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ পৌঁছেছে। সিরিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে এ সংখ্যা দিনদিনই বাড়ছে।

সংস্থাটি আরো জানায়, বিশ্বে প্রতি ১২২ জনে একজন ঘর ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বে প্রতিদিন ৪ হাজার ৬০০জন মানুষ শরণার্থী জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। ইউএনএইচসিআর'র প্রধান অ্যান্টোনিও গুটেরেস এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমাদের সময়কে জোড়পূর্বক বাস্তুচ্যুতি সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত করছে।

এছাড়া আন্তঃবাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর (আইডিপি) সংখ্যা এবার ২০ লাখ থেকে বেড়ে ৩ কোটি ৪০ লাখে গিয়ে দাড়িয়েছে বলে জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে। শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেনেই চলতি বছরের প্রথমার্ধে ৯ লাখ ৩৩ হাজার ৫০০ নতুন আইডিপির সৃষ্টি হয়েছে। ইউক্রেন সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছে ৫ লাখ ৫৯ হাজার, আর কঙ্গোয় এ সংখ্যা ৫ লাখ ৫৮ হাজার।[৫৯] প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মিয়ানমারের অন্তত ২ লাখ মানুষ প্রতিবেশী বাংলাদেশে 'শরণার্থীর মতো' জীবন-যাপন করছে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ ও

---

[৫৮] *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ২২ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, ২০১৫ সাল, পৃ. ১০, শিরোনাম- বসনিয়ার যুদ্ধ সমাপনী ডেটন চুক্তি, লেখক: তানজিনা বিনতে নূর।

[৫৯] *দৈনিক বাংলাদেশ সময়*, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫, শনিবার, পৃ. ১ ও ২, শিরোনাম- 'চলতি বছরে বিশ্বে ঘরছাড়া হয়েছেন ৬ কোটি মানুষ, ডেস্ক রিপোর্ট।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন দেশে সংঘাতের কারণে প্রতিনিয়ত মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। ঘরবাড়ি হারিয়ে দেশের ভেতরেই বা অন্যদেশে শরণার্থী হিসেবে জীবনযাপন করছে।[৬০]

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার দিবস পালন করা হয়। অথচ সারা বিশ্বে চলছে পশুত্ব আর পিশাচদের অত্যাচার। এটা কোন মানবাধিকার? মানবাধিকার আর কতকাল এত নির্লজ্জ বিদ্রুপের শিকার হতে থাকবে? এটাই এখন বিজ্ঞ মহলের প্রশ্ন।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর প্রতিবেদনঃ বিশ্বে আধুনিক দাস ৪ কোটি ৩ লাখ এবং শ্রমে নিয়োজিত আছে ১৫ কোটি ২০ লাখ শিশু

সভ্যতার বিকাশে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করা হলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের অবসান হয়নি পুরোপুরি। গোটা বিশ্বে এখনও আধুনিক দাসত্বের শিকার অসংখ্য মানুষ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) হিসেবে বর্তমান বিশ্বে ৪ কোটি ৩ লাখ মানুষ আধুনিক দাসত্বের শিকার। এর মধ্যে ২ কোটি ৪৯ লাখ বল প্রয়োগে বাধ্য হয়ে কাজ করছেন। অবশিষ্ট ১ কোটি ৫৪ লাখ চাপের কারণে বিয়ে করতে বা যৌনকর্ম করতে বাধ্য হচ্ছেন। আধুনিক দাসের ৭১ শতাংশই নারী ও কিশোরী। পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ৯০ লাখ। বাণিজ্যিক যৌন খাতের ৯৯ শতাংশই নারী। চাপ প্রয়োগের ফলে বাধ্য হয়েছেন এমন অভিবাসীদের প্রায় ৮৪ শতাংশই নারী ও কিশোরী। আধুনিক দাসদের চারজনের মধ্যে একজন শিশু। সংখ্যার বিচারে এর পরিমাণ প্রায় ১ কোটি। আধুনিক দাসদের ৩৭ শতাংশ শিশু অবস্থায় বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছে। এর পরিমাণ প্রায় ৫৭ লাখ। ২০১৬ সালের যে কোনো সময়ে অন্তত আড়াই কোটি মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। এর মধ্যে ১ কোটি ১৬ লাখ মানুষ ব্যক্তি খাতে শ্রমের মাধ্যমে শোষণের শিকার। এ সময়ে ৫০ লাখ মানুষ জোর প্রয়োগে যৌনকর্মে বাধ্য হন। একই সময়ে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ সরকারি ব্যবস্থাপনায় চাপ প্রয়োগে শ্রম দিতে বাধ্য হয়েছেন। চাপের কারণে বিয়ের আওতায় ২০১৬ সাথে অন্তত ১ কোটি ৫৪ লাখ মানুষ বসবাস করতে বাধ্য হয়েছেন। এ ধরনের ৬৫ লাখ ঘটনা ঘটেছে গেল ৫ বছরে। অনিচ্ছায় বিয়ের শিকার এক-তৃতীয়াংশই শিশু। এদের অধিকাংশই শিশুকন্যা।

আন্তর্জাতিক মাইগ্রেশন সংস্থা (আইওএম) ও ওয়াত ফ্রি ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথভাবে দুইটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে আইএলও। এর একটি আধুনিক দাসত্ব নিয়ে তৈরি করা। অপর প্রতিবেদনটি শিশুশ্রম সংক্রান্ত। শিশুশ্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয় : ২০১৬ সাথে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী ১৫ কোটি ২০ লাখ শিশু শ্রমে নিয়োজিত ছিল। এসব শিশু কর্মে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য হয়েছে। তন্মধ্যে ৬ কোটি ৪০ লাখ কন্যাশিশু এবং ৮ কোটি ৮০ লাখ ছেলেশিশু। এ সময়ে বিশ্বের ১০ শিশুর একজন শ্রমে নিয়োজিত ছিল। আফ্রিকায় সর্বোচ্চ ৭ কোটি ২১ লাখ শিশু শ্রমে নিয়োজিত। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৬ কোটি ৬২ লাখ। এর বাইরে ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় সাড়ে ৫ কোটি, আরব বিশ্বে ১ কোটি ২০ লাখ এবং আরব দেশগুলোর ১ কোটি ২০ লাখ শিশু শ্রমে নিয়োজিত আছে। শিশু শ্রমিকের ৩৮ শতাংশই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে আছে এক-তৃতীয়াংশ শিশু শ্রমিক। দুই-তৃতীয়াংশের বেশি শিশু শ্রমিক সপ্তাহে ৪৩ ঘন্টার বেশি কাজ করছে।

---

[৬০] *দৈনিক সমকাল*, ১৯ ডিসেম্বর, শনিবার, ২০১৫, পৃ. ২০ ও ১৪, শিরোনাম– *এক বছরে বাস্তুচ্যুত ৬ কোটি মানুষ*, সমকাল ডেস্ক।

শিশুশ্রম ব্যবহারে কৃষি খাত বেশ বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছে। এ খাতে নিয়োজিত আছে শিশু শ্রমিকের ৭০ দশমিক ৯০ শতাংশ। সেবা খাতে নিয়োজিত আছে শিশু শ্রমিকের ১৭ দশমিক ১০ শতাংশ।[৬১]

ইউনিসেফ এর প্রতিবেদন : বিশ্বের ১৮ কোটি শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত

বিশ্বের ১৮ কোটি শিশু তাদের মা-বাবার শৈশবের তুলনায় অন্ধকার ভবিষৎ ও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। জাতিসংঘের শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) এক বিশ্লেষণে এই তথ্য উঠে এসেছে। বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে এই বিশ্লেষণ করেছে সংস্থাটি। প্রতিবেদনেবলা হয়, ৩৭টি দেশের ১৮ কোটি শিশু চরম দারিদ্র্যের মাঝে বসবাস, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং সহিংসতায় প্রাণহানির ঝুঁকিতে আছে। ২০ বছর আগেও ওই দেশগুলোর শিশুরা এত ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ছিল না।[৬২]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৮ উপলক্ষে এক প্রতিবেদনে বলেছে : বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষের অতি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুবিধা নেওয়ার সুযোগ নেই। বিশ্বের ৮০ কোটি মানুষ তাদের পরিবারের মোট ব্যয়ের অন্তত ১০ শতাংশ চিকিৎসা সেবায় নিজেদের পকেট থেকে বহন করে। চিকিৎসা সেবার ব্যয় বহন করতে বছরে প্রায় ১০ কোটি মানুষ অতি দরিদ্র হয়ে পড়ছে।[৬৩]

বিশ্বের কয়েকজন নিষ্ঠুর শাসক

মানুষের অধিকার লঙ্ঘনকারী বিশ্বের অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর শাসকের সংখ্যা অনেক। দিনদিন এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের কয়েকজন নিষ্ঠুর শাসকের নিষ্ঠুরতার সামান্য বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

এডলফ হিটলার: বিশ্বের সবচেয়ে নিষ্ঠুর শাসকদের মধ্যে এডলফ হিটলারের অবস্থান সবার শীর্ষে। তিনি ১১-১৪ মিলিয়ন মানুষ হত্যার জন্য দায়ী, যার মধ্যে ৬ মিলিয়নই ছিল ইয়াহুদী। তিনি ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন। হিটলারের রাজ্য জয় ও বর্ণবাদী আগ্রাসনের কারণে লাখ লাখ মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়।

জোসেফ ষ্ট্যালিন: তিনি একজন রুশ সমাজতন্ত্রী রাজনীতিবিদ। তার শাসনামলে অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের দরুন লাখ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা যায়। কমিউনিষ্ট এই নেতা ১৫ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। শুধু ১৯৩২ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ৬ লাখ মানুষ মারা যায় সরকারি বাহিনীর অত্যাচারে।

পল পট: কমিউনিষ্ট শাসক পল পট ১৯৭৫ সালে কম্বোডিয়ার শাসক হন এবং একনায়করূপে আবির্ভূত হন। পল পট প্রায় ১৭ লাখ কিংবা তার চেয়েও অনেক বেশি মানুষকে হত্যা করে। এই ১৭ লাখ মানুষ ছিল পুরো কম্বোডিয়ার জনসংখ্যার ২০ শতাংশ।

---

[৬১] দৈনিক *আলোকিত বাংলাদেশ*, বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ৭ কলাম ১; শিরোনাম- 'বিশ্বে আধুনিক দাস ৪ কোটি ৩ লাখ'।

[৬২] দৈনিক *প্রথম আলো*, বুধবার, ২২ নভেম্বর ২০১৭, পৃ. ৭ কলাম ৬; শিরোনাম- 'মা-বাবার তুলনায় ১৮ কোটি শিশুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার'।

[৬৩] দৈনিক *সমকাল*, শনিবার, ৭ এপ্রিল, পৃ. ২০ : কলাম ৬ এবং পৃ. ১৩ : কলাম ৬, শিরোনাম- 'চিকিৎসার ৬৭ শতাংশ ব্যয় যায় ব্যক্তির পকেট থেকে'।

Dhaka University Institutional Repository

ইদি আমিন দাদা: তিনি উগান্ডার 'কসাই' বলে নামে পরিচিত। সেখানকার মানুষ তাকে এ নামেই বেশি চিনে। ইদি আমিন ১৯৭১ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ৮ বছর ধরে উগান্ডা শাসন করেন। প্রায় ৩ লাখ মানুষ মারা যায় তার হাতে। তিনি ছিলেন শেতাঙ্গবিরোধী বর্ণবাদী এবং এন্টি এশিয়ান। তিনি জাতিগত বিশুদ্ধতার নামেই প্রায় ৬০ হাজার এশিয়ানকে হত্যা করেন।

ভ্লাড টেপেস: তিনি ছিলেন তৎকালীন রোমানিয়ার ১৫ শতাব্দির শাসক যাকে কেন্দ্র করে রক্তচোষা ড্রাকুলা কাহিনী লেখা হয়। অত্যন্ত নিষ্ঠুর এই শাসকের শাসনকাল ছিল মূলত ১৪৫৬ থেকে ১৪৬২ সাল পর্যন্ত। তার নিষ্ঠুরতা ছিল কল্পনাতীত। তার হাতে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ মারা যায়। এই নিষ্ঠুরতার কারণেই রোমানিয়াতে তাকে ড্রাকুলা অর্থাৎ শয়তানের পুত্র বলে ডাকা হতো।[৬৪]

[৬৪] *দৈনিক মানবকণ্ঠ*, বৃহস্পতিবার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৫, শিরোনাম- 'বিশ্বের নিষ্ঠুর শাসকরা'।

[তৃতীয় অধ্যায়]

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে আধুনিক ব্যবস্থাসমূহ

বিংশ শতাব্দীতে মানবাধিকার শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার দেখে কেউ হয়ত মনে করতে পারেন, এ শব্দটির উৎপত্তি বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জাতিসংঘ কর্তৃক দেয়া মানবাধিকার ঘোষণার বহু পূর্বেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম মানবাধিকার বাস্তবিক অর্থে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। মহানবী ﷺ মানুষকে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানবীয় মূল্যবোধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধের নীতিসমূহের মধ্যে যে সমন্বয় সাধন করে গেছেন, তার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল ﷺ-এর যুগে মানবাধিকার 'হুকূকুল ইবাদ' নামে পরিচিত ছিল। মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-ই সর্বপ্রথম কুরআন বর্ণিত মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ব্যবস্থা সমাজে বাস্তবায়ন করেন। তাঁর পূর্বে মানবাধিকারের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম চৌদ্দশ বছর আগে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করে। যার কিছু সাম্প্রতিককালে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে সন্নিবেশিত মানবাধিকারের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা হচ্ছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা বা মানাবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধের আধুনিক ব্যবস্থা। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

(ক) জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা

১৯৪৮ সালে ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ মানবাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩০ দফা সংবলিত যে ঘোষণা প্রণয়ন করেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

সাধারণ পরিষদ

সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির
একটি সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে জারি করছে এই
মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

As a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

ঐ লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ মানবিক অধিকার সমূহের এই সর্বজনীন ঘোষণাপত্রটিকে সর্বদা স্মরণ রেখে শিক্ষাদান ও জ্ঞান প্রসারের মাধ্যমে এ সকল অধিকার ও স্বাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রগতিশীল ব্যবস্থাদির দ্বারা সদস্য রাষ্ট্যসমূহের জনগণ ও তাদের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের অধিবাসীবৃন্দ উভয়ের মধ্যে ঐগুলির সর্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি ও মান্যতা অর্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

Dhaka University Institutional Repository

Article 1.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. **(ধারা–১ঃ** সব মানুষই বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সম-মর্যাদা ও অধিকারাদি নিয়ে জন্মায়। তাদেরকে বুদ্ধি ও বিবেক দেয়া হয়েছে এবং তাদের উচিত ভ্রাতৃত্বসূলভ মনোভাব নিয়ে একে অন্যের প্রতি আচরণ করা।)

Article 2.

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. **(ধারা–২ঃ** যেকোন ধরনের পার্থক্য যেমন জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক অথবা অন্য মতবাদ, জাতীয় অথবা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম কিংবা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধিকারে স্বত্ববান। অধিকন্তু কোন ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী, তা স্বাধীন, অছিভুক্ত এলাকা, অস্বায়ত্তশাসিত কিংবা অন্য যে কোন ধরনের সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, তা রাজনৈতিক, সীমানাগত ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা যাবে না।)

Article 3.

Everyone has the right to life, liberty and security of person. (**ধারা–৩ঃ** প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার আছে।)

Article 4.

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. **(ধারা–৪ঃ** কাউকে দাস হিসেবে কিংবা দাসত্বে রাখা চলবে না; সব ধরনের দাসপ্রথা ও দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।)

Article 5.

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. **(ধারা–৫ঃ** কাউকে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানুষিক কিংবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তিভোগে বাধ্য করা যাবে না।)

Article 6.

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. **(ধারা–৬ঃ** আইনের সামনে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার আছে।)

Article 7.

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination. **(ধারা–৭ঃ** আইনের কাছে প্রত্যেকই সমান এবং কোন ধরনের বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেকেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণাপত্র লঙ্ঘনকারী কোনরূপ বৈষম্য কিংবা এরূপ বৈষম্যের কোন উস্কানির বিরুদ্ধে সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার সবারই আছে।)

Article 8.

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law. **(ধারা–৮ঃ** যে কার্যাদির ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হয় সেগুলোর জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার-আদালতের মাধ্যমে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।)

Article 9.

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. **(ধারা–৯ঃ** কাউকে খেয়ালখুশীমত গ্রেফতার, আটক কিংবা নির্বাসন করা যাবে না।)

Article 10.

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. **(ধারা–১০ঃ** প্রত্যেকেরই তার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত যে কোন ফৌজদারী অভিযোগ নিরূপনের জন্য পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-আদালতের ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানী লাভের অধিকার আছে।)

Article 11.

(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence. (2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. **(ধারা–১১ঃ** ক. যে কেউ কোন দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এমন গণ-আদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার তার আছে। খ. কাউকেই কোন কাজ বা দোষের জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না যদি সংঘটনকালে তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ গণ্য না হয়ে থাকে। আবার দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনকালে যতটুকু শাস্তি প্রযোজ্য ছিল তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।)

Article 12.

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. **(ধারা–১২ঃ** কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ী বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়ালখুশীমত হস্তক্ষেপ কিংবা সম্মান ও সুনামের উপর আক্রমণ করা চলবে না।)

Article 13.

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. **(ধারা–১৩ঃ** ক. প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার সকলেরই আছে। খ. প্রত্যেকেরই নিজ দেশসহ যে কোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার আছে।)

Dhaka University Institutional Repository

Article 14.

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. **(ধারা–১৪ঃ** ক. প্রত্যেকেরই নির্যাতন এড়ানোর জন্য অন্য দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা ও ভোগ করার অধিকার রয়েছে। খ. অরাজনৈতিক অপরাধসমূহ বা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির বিরোধী কার্যকলাপ থেকে সত্যিকারভাবে উদ্ভুত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রার্থনা করা নাও যেতে পারে।)

Article 15.

(1) Everyone has the right to a nationality. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. **(ধারা–১৫ঃ** ক. প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার আছে। খ. কাউকে যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা কিংবা তাকে তার জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।)

Article 16.

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State. **(ধারা–১৬ঃ** ক. পূর্ণ বয়স্ক ও নারীদের জাতিগত, জাতীয়তা বা ধর্মের কারণে কোন সীমাবদ্ধতা ছাড়া বিয়ে ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে। বিয়ের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে তাদের সম-অধিকার থাকবে। খ. শুধু বিবাহ-ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীর অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির দ্বারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে। গ. পরিবার হলো সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক গোষ্ঠী। তাই এর অধিকার আছে সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার।)

Article 17.

(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property. **(ধারা–১৭ঃ** ক. প্রত্যেকেরই একাকী এবং অন্যের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার আছে। খ. কাউকে তার সম্পত্তি থেকে খেয়ালখুশীমত বঞ্চিত করা চলবে না।)

Article 18.

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. **(ধারা–১৮ঃ** সকলেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার আছে। নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতা এবং একাই কিংবা অপরের সাথে যোগসাজশে এবং প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান, প্রচার, উপাসনা ও পালনের মাধ্যমে প্রকাশ করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।)

Article 19.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. **(ধারা–১৯ঃ**

সবারই অভিমত ও মতামত প্রকাশের স্বাধিকার রয়েছে; কোন হস্তক্ষেপে ছাড়া মতামত পোষণ এবং যে কোন উপায়াদির মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও অবহিত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।)

Article 20.

(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. (2) No one may be compelled to belong to an association. **(ধারা–২০ঃ** ক. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার আছে। খ. কাউকেই কোন সংঘভুক্ত হওয়া জন্য বাধ্য করা যাবে না।)

Article 21.

(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country. (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. **(ধারা–২১ঃ** ক. সকলেরই প্রত্যক্ষভাবে বা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। খ. সবাররই নিজ দেশের সরকারী চাকুরীতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার আছে। গ. জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি; এই ইচ্ছা সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নৈমিত্তিকভাবে এবং প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে; গোপন ব্যালট বা অনুরূপ অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।)

Article 22.

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. **(ধারা–২২ঃ** সমাজের সদস্য হিসেবে সবারই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে; সকলেই জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদ অনুযায়ী তার মর্যাদা ও অবাধে ব্যক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায়ে স্বত্ববান।)

Article 23.

(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. (3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. (4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. **(ধারা–২৩ঃ** ক. সকলেরই কাজ করার, অবাধে চাকুরী নির্বাচন করার, কাজের ন্যায্য ও অনুকূল পরিবেশ লাভ করার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হওয়ার অধিকার আছে। খ. সবারই কোন বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার আছে। গ. প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের এবং পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদানে সক্ষম এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে

Dhaka University Institutional Repository

সেই সাথে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাদি সংযোজিত লাভের অধিকার আছে। ঘ. প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার আছে।)

Article 24.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. **(ধারা–২৪ঃ** প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার আছে। যুক্তিসঙ্গত কাজের সময়ের সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।)

Article 25.

(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. **(ধারা–২৫ঃ** ক. প্রত্যেকেরই নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার আছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কার্যাদির সুযোগ, বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য কিংবা অনিবার্য কারণে জীবন যাপনে অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। খ. মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা পাওয়ার অধিকারী। প্রত্যেক শিশুই চাই সে বৈবাহিক বন্ধনের ফলে বা বৈবাহিক বন্ধনের বাইরের জন্ম হোক, অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।)

Article 26.

(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. **(ধারা–২৬ঃ** ক. প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার আছে। অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণ লভ্য হবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে প্রত্যেকের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে। খ. শিক্ষা পরিচালিত হবে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ, মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার জন্য। সমঝোতা, উদারতা ও সকল জাতি, বর্ণ, ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্ব উন্নয়ন ও শান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবে। গ. সন্তানদেরকে যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে তা আগে থেকে বেছে নেওয়ার অধিকার পিতামাতার আছে।)

Article 27.

(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its

benefits. (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. **(ধারা–২৭ঃ** ক. প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ, শিল্পকলা চর্চা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলসমূহের অংশীদার হওয়ার অধিকার আছে। খ. প্রত্যেকেরই অধিকার আছে বিজ্ঞান, সাহিত্য বা শিল্পকলা-ভিত্তিক সৃজনশীল কাজ থেকে নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থসমূহ রক্ষণ করার।)

Article 28.

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized. **(ধারা–২৮ঃ** সবাই এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য স্বত্ববান যেখানে এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ পূর্ণভাবে আদায় করা যেতে পারে।)

Article 29.

(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. **(ধারা–২৯ঃ** ক. সমাজের প্রতি সকলেরই কর্তব্যাদি আছে কেবল যার অন্তর্গত হয়েই তার ব্যক্তির অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। খ. প্রত্যেকেরই নিজ অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ প্রয়োগকালে কেবল ঐ ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকবে যা শুধু অপরের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের যথার্থ স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সাধারণ কল্যাণের ন্যায্য প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য আইনের দ্বারা নিরূপিত হয়। গ. এসব অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগকালে কোন ক্ষেত্রেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লঙ্ঘন করা যাবে না।)

Article 30.

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. **(ধারা–৩০ঃ** এই ঘোষণায় উল্লিখিত কোন বিষয়কে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যাতে মনে হয় যে, এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত কোন অধিকার অথবা স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার আছে।)[৫৮]

উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি রাষ্ট্রের নাগরিক বেঁচে থাকার অধিকার লাভ করবে; স্বাধীনতা ও সম্পদের অধিকার হবে; ব্যক্তিগত নিরাপত্তা লাভ করবে। সমমর্যাদা ও জাতীয়তা লাভ করবে; ধর্ম-বর্ণ-প্রজন্ম নির্বিশেষে সামাজিক ও রাজনৈতিক সাধিকারের অধিকারী হবে ও রাজনৈতিক মত প্রকাশে স্বত্ববান হবে। এসব ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা যাবে না।

[৫৮] মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, (আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮৩), পৃ. ৭০-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ব্যর্থতার কারণসমূহ

জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা যে ব্যর্থ হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর ব্যর্থতার অনেক কারণ রয়েছে। তার কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হলো।

প্রথম কারণ

জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা সকল বিচারেই মৌলিক ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। কেননা সে অধিকারসমূহ সরকার ও রাষ্ট্রসমূহের মুকাবিলায় চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু এ ঘোষণায় মানুষ হিসেবে যে অপর মানুষের উপর অধিকার রয়েছে, সে বিষয়ে কোন কথাই উল্লেখ নেই। কেবল এতটুকু বলেই শেষ করা হয়েছে যে, নাগরিকগণ পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বের ভাবধারাপূর্ণ আচরণ করবে। অথচ আসল বিষয় হলো, একজন মানুষের উপর অপর মানুষের যে অধিকার রয়েছে তা রাষ্ট্র ও সরকারের উপর নাগরিকের অধিকারের তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও ব্যাপক। কিন্তু জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণায় তা উল্লিখিত হয়নি।

বস্তুত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটিই মানব জীবনের সারনির্যাস। এ কারণে কুরআন ও হাদীসে মানুষের অধিকার ও দায়িত্বের কথা একই সাথে ব্যাপক ও জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে যেমনি পিতার অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে সন্তানের অধিকার ও কর্তব্যের কথা। যেমন স্বামীর অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, তেমনি স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে। ভাই ও নিকট্মায়ীদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের কথা, একই সাথে বলা হয়েছে প্রতিবেশি ও সঙ্গীর অধিকার ও কর্তব্যের কথা। গরীব-মিসকীনের অধিকার ও কর্তব্যের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে ধনীর অধিকার ও কর্তব্যের কথা। শাসকের অধিকার ও কর্তব্যের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে শাসিতের অধিকার ও কর্তব্যের কথাও। এক কথায়- অধিকার ও কর্তব্যের যত দিক ও বিভাগ রয়েছে তার কোন একটিও কুরআন-হাদীসে বাদ যায়নি। এ বিষয়ে নতুন কোন দিকই বাদ যায়নি, যে বিষয়ে কারো কিছু বলার সুযোগ থাকতে পারে। কুরআন-হাদীসে এ বিষয়ে অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা কোন মানুষের কল্পনায়ও আসতে পারে না। কুরআনে বর্ণিত মানবাধিকারসমূহ এতই ব্যাপক যে এতে কোন পরিবর্তন সাধন কিংবা নতুন কিছু সংযোজনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অবকাশ ও প্রয়োজন আছে শুধু অনুধাবন ও উপলব্ধির, শুধু বিশ্বাস ও গ্রহণের এবং শুধু অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করার।[৫৯]

দ্বিতীয় কারণ

জাতিসংঘের বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার আরেকটি দিক হলো তাতে শুধুমাত্র অধিকারের কথা বলা হয়েছে, অথচ দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বিন্দুমাত্র-ও বলা হয়নি। আর অধিকারের বিষয়টিকেও সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, শান্তি, সমতা, চিকিৎসা ও ধর্ম পালন– মাত্র এই কয়েকটির মধ্যে। তাহলে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য কোথায় গেল? আমানতদারীতা বা প্রকৃত মালিকের কাছে আমানতের বস্তু প্রতিশ্রুত সময়ে যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেয়া কী কর্তব্য নয়? মানুষের উপর কী অপর মানুষের কোন অধিকার নেই? অন্য লোকের সে অধিকার যথারীতি আদায় করা কি কর্তব্য নয়? তাহলে সে দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হলো না কেন? বলা না হলে মানবাধিকার কী একতরফা

---

[৫৯] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে মানবাধিকার*, (খায়রুন প্রকাশনী, চতুর্থ প্রকাশ, জুন ২০১১), পৃ. ১৮-১৯।

হয়ে যায় না, আর সে একতরফা অধিকারকে কীভাবে 'বিশ্ব মানবাধিকারের' ঘোষণা বলা যায়? তাছাড়া অন্য মানুষের ক্ষতি করা, তাকে কষ্ট দেয়া বা তার সাথে মন্দ আচরণ করা কী যুক্তিযুক্ত? মানুষকে সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য নয় কী?

কর্মে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা, অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ না করা, ধোঁকা না দেয়া, জুলুম না করা, অপরকে না ঠকানো, মুনাফিকী না করা, মিথ্যা পরিহার করা, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া, বিশ্বাসঘাতকতা না করা, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া, নম্রতা অবলম্বন, কারো ব্যাপারে অযথা মন্দ ধারণা পোষণ না করা, কারো দোঁষ খুঁজে না বেড়ানো, গীবত না করা, চোগলখুরী না করা ও হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো পরিহার করা– এগুলো কী মানুষের কর্তব্য নয়? এর সবই যে মানুষের একান্ত কর্তব্য তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সুতরাং এসব সহজাত ও মৌলিক কর্তব্যের কথা বলা হয়নি যে ঘোষণায়, তা বিশ্ব মানবাধিকারের ঘোষণা হতে পারে না?[৬০]

তৃতীয় কারণ

এই ঘোষণাপত্রের কার্যকরণ শক্তি বলতে কিছুই নেই। ঘোষিত অধিকারগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে পাইয়ে দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। উপস্থাপিত অধিকারগুলো নৈতিক উপদেশ, আবেদন-অনুরোধ কিংবা কেবলই নীতিগত ব্যাপার। তা কার্যকর না করলে অপরাধীকে কোন প্রকার শাস্তি দেয়ার কোন ক্ষমতাই জাতিসংঘের হাতে নেই; বরং সেটা সংশ্লিষ্ট দেশ বা সরকারের ইচ্ছাধীন। কেবল অধিকারের কথা বললেই দায়িত্ব পালিত হয় না, আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সে অধিকার পেয়েও যায় না।

ইসলামে অধিকার ও কর্তব্যের কথা শুধু ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি; কেবল বলে দিয়েই দায়িত্ব এড়াতে চায়নি। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই হলেন সেই অধিকারসমূহের বাস্তবায়ন শক্তি। ইসলামী শরীয়ত ঘোষিত কোন অধিকার ও কর্তব্য কেউই অমান্য করতে কিংবা বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতে পারে না।[৬১]

চতুর্থ কারণ

এ ঘোষণাপত্রের কোন আইনগত মর্যাদা নেই। এ ঘোষণাপত্রের বাস্তব অবস্থা ও জাতিসংঘের অসহায়ত্বের অবস্থা মন্তব্য করতে গিয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ও আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ বলেন: মানবাধিকার কমিশন ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিবেদন অনুমোদন করে যার মধ্যে পূর্বেকার চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ উল্টে দেয়া হয়েছে। তাতে এই সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা হয় যে, "কমিশন স্বীকার করে যে, মানবাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের এখতিয়ার তার নেই।"[৬২] অর্থাৎ ঘোষণাপত্র প্রচারের এক বছর আগেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এর কোন আইনগত মর্যাদা থাকবে না। কোন সদস্য রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় এই ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন করতে চাইলে করতে পারে অথবা ইচ্ছা হলে ময়লার ঝুড়িতেও নিক্ষেপ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে হ্যান্স কেলসন বলেন: "নিরেট আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কোন সদস্য রাষ্ট্রের উপর ঘোষণাপত্রের দফাগুলো মেনে নিতে ও ঘোষণাপত্রের খসড়া কিংবা তার উপক্রমনিকায় উল্লেখিত মানবাধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। ঘোষণাপত্রের ভাষার এমন কোন ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় যা থেকে

---

[৬০] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

[৬১] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামে মানবাধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

[৬২] Gaius Ezejiofor, *Protection of Human Rights Under The Low*, (1964), p. 80.

Dhaka University Institutional Repository

এই অর্থ বের করা যেতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট সদস্য রাষ্ট্র নিজ দেশের নাগরিকগণকে মানবাধিকার ও স্বাধীনতা দিতে আইনত বাধ্য।"[৬৩]

পঞ্চম কারণ

এ ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ বিদ্যমান। এ ঘোষণাপত্র একজন ব্যক্তিকে কী কী জিনিস দিয়েছে সে বিষয়ে কার্ল মেনহেইম লিখেছেন:

"ঘোষণাপত্র কাউকে এই আইনগত অধিকার দেয়নি যে, সে ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকারসমূহ ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন একটি থেকে বঞ্চিত হলে আন্তর্জাতিক আদালতে কিংবা জাতিসংঘের সর্বোচ্চ ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিষ্ঠান– আন্তর্জাতিক জাষ্টিস আদালতে আপিল করতে পারবে। উক্ত আদালতের আইনের ২৪ নং দফায় পরিষ্কার ভাষায় লেখা আছে যে, আদালতের সামনে শুধুমাত্র রাষ্ট্রই একটি পক্ষ হিসেবে উপস্থিত হতে পারে।"[৬৪] আরো জ্ঞাতব্য যে, জাতিসংঘ সনদে যে কয়েকটি বিষয়কে মানবাধিকাররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে তা-ও মানছে না এ সনদে সাক্ষরকারী দেশসমূহ।

ষষ্ঠ কারণ

এ ঘোষণাপত্র অকার্যকর ও চরম ব্যর্থতার আরেকটি কারণ হলো, শুরুতেই খোদ জাতিসংঘ মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথ উন্মুক্ত করেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক কয়েকটি রাষ্ট্রকে 'ভেটো' প্রয়োগের নিরঙ্কুষ ক্ষমতা প্রদান এরই একটি নির্লজ্জ উপমা। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোই সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। তারা নিজেদের আধিপত্য আর নিকৃষ্ট স্বার্থ হাসিলের জন্য নানা অজুহাতে কম ক্ষমতাসম্পন্ন ও দুর্বল রাষ্ট্রের উপর বাড়িয়েছে হায়েনার থাবা। অথচ জাতিসংঘ একেবারে নিশ্চুপ। এ সংস্থার নিশ্চুপের কারণ হল, শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করারও ক্ষমতা এ সংস্থার নেই। তাই এ অধিকার নাম সর্বস্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

সপ্তম কারণ

ঘোষণাপত্রের ব্যর্থতার মূল কারণ হচ্ছে- স্রষ্টার পরিবর্তে অন্যকে ক্ষমতার আসনে বসানো, অন্যের প্রভূত্ব ও অভিভাবকত্ব মেনে নেয়া। বস্তুত এ পর্যন্ত মানবজাতির মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে জাতীয় সংবিধান বা আন্তর্জাতিক সনদ যা কিছুই করা হয়েছে সবই পরিণামে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মানবজাতি যে নিজেদের অধিকার সংরক্ষণের কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা নির্ধারণে সফল হয়নি এবং যে কারণে এ ব্যাপারে তাদের চেতনা শক্তি, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী ব্যর্থ হলো তার সম্পর্কে কুরআন বলছে- এ সকল অপ্রীতিকর অবস্থার কারণ মাত্র একটি। তা হলো- মানবজাতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান সত্তার স্থান ও মর্যাদার পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং এমন মনগড়া প্রভূদের নিজেদের আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নিয়েছে যারা আজ তাদের ঘাড় মটকাচ্ছে এবং তাদের অধিকারগুলো পদদলিত করছে।

যে আল্লাহ্ প্রদত্ত সিরাতে মুস্তাকিম (সহজ, সুদৃঢ়, সমতল ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ) ত্যাগ করে নিজের কল্পনাপ্রসূত অন্য কোন পথ অনুসরণ করবে, সে অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাতে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হবে। এতে কোনই সন্দেহ নেই। সুতরাং মানুষকে সরাসরি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বকে স্বীকার করে

---

[৬৩] Hans kelson, *The Low of United Nations*, (London, 1950), p. 29.

[৬৪] Karl Mannheim, *Diagonosis of Our Time*, (London 1947), p. 15

নিয়ে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদতে নিয়াজিত হতে হবে এবং অন্যকে প্রভূ বানানোর মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে।[৬৫] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

এরা কি আল্লাহ্র দ্বীন ছাড়া অন্য দ্বীনের সন্ধান করছে? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছেয় ও অনিচ্ছেয় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন।[৬৬]

আল্লাহ্ আরো বলেন:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ العَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? অতএব, তোমাদের যারা এমন করে তাদের পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়া আর কী প্রতিদান হতে পারে? কিয়ামতের দিন তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বেখবর নন।[৬৭]

---

[৬৫] মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-১০৬।

[৬৬] আল-কুরআন: সূরাহ আলে ইমরান, ৩/৮৩।

[৬৭] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

[চতুর্থ অধ্যায়]

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামের ব্যবস্থাসমূহ

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামে বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা রয়েছে। যা নিম্নে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো।

[১]. মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ঈমান, ইবাদত, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা এবং বিভিন্ন সাবধানবাণী ও শাস্তি

ঈমান, ইবাদত, ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজে নিষেধ, বিভিন্ন সাবধানবাণী ও শাস্তির ভীতি দ্বারা ইসলাম মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে সচেষ্ট। এ বিষয়ে নিম্নে আলোচপাত করা হলো।

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ঈমান

ইসলামে ঈমানের[৬৮] স্থান সর্বপ্রথম। তাই ইসলাম মানুষকে প্রথমে ঈমান গ্রহণেরই আহ্বান জানায়। দ্বীন ইসলামে ঈমানের গুরুত্ব বিভিন্নভাবে বুঝানো যেতে পারে। যেমন- ঈমান হচ্ছে বীজ-সদৃশ আর ইসলাম হচ্ছে সেই বীজ থেকে অঙ্কুরিত বৃক্ষ। বীজ ছাড়া যেমন বৃক্ষের অস্তিত্ব অসম্ভব, তেমনি ঈমান ছাড়া ইসলাম অবাস্তব। ইসলাম একটা দেহ সদৃশ, আর ঈমান হচ্ছে, সেই দেহে অবস্থিত প্রাণ। প্রাণহীন দেহ মূল্যহীন। তেমনি ঈমান ছাড়া ইসলাম গ্রহণও যথার্থ নয়। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদের ভিত্তিই হচ্ছে ঈমান। এজন্যই দ্বীন-ইসলামে ঈমানের গুরুত্ব সর্বাধিক।

ঈমান থাকলেই কেবল ইসলাম পালিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঈমানবিহীন ইসলাম গৃহীত হয় না। কারণ, মহান আল্লাহ্‌র প্রতি যার ঈমান আছে, সে-ই আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ পরিহারে প্রস্তুত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি যার ঈমান নেই সে তা পালন করবে– এরূপ আশা অর্থহীন। কেননা, আল্লাহ্‌র প্রতি তার এ অবিশ্বাসই তাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ-বিরোধী কার্যকলাপে উৎসাহিত করবে বা তাকে অন্যায় কাজে নিয়োজিত করবে।

তাইতো মহান আল্লাহ্‌ কুরআনুল কারীমে বান্দাদের জন্য যে বাস্তব কর্মের বিধান পেশ করেছেন, তার সবগুলোতেই তিনি এভাবে সম্বোধন করেছেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (হে ঈমানদারগণ) বলে। ‘ঈমান’ অর্থ হচ্ছে সত্য বলে মেনে নেওয়া। এ ‘ঈমানে’ শুধু মৌখিক স্বীকৃতির কথা নেই; বরং তা মানতে প্রস্তুত হওয়ার কথাটিও অন্তর্ভুক্ত আছে। পাশাপাশি যিনি ঐ সংবাদ দিচ্ছেন তাকেও সত্য বলে মেনে নেয়া অনিবার্য।

---

[৬৮] ঈমান আরবী শব্দ। এর অর্থ: বিশ্বাস করা। ইসলামী পরিভাষায় মহান আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, তাক্বদীরের ভাল-মন্দ এবং আখিরাতে পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয়। যিনি উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন, মৌখিকভাবে এর স্বীকৃতি দেন এবং বাস্তবে সেই মোতাবেক ‘আমল করেন- তাকে বলা হয় ঈমানদার। এ প্রসঙ্গে ইমাম হাসান আল-বসরী (রহ.) বলেন: শুধুমাত্র মনের ইচ্ছা কিংবা বাইরের সাজ পোশাকই ঈমান নয়; বরং তা হল মনের দৃঢ়তা এবং আমলের মাধ্যমে তাকে সত্যায়িত করা। ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন: ঈমান হল মৌখিক স্বীকৃতি ও কাজে পরিণত করার নাম- [হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, (দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-লেবানন, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০০), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪]।

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা জানা যে, দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্ প্রেরিত নবী ও রাসূলগণই মানুষকে ঈমান গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। তা হল, এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার আহ্বান। যিনি একক, যাঁর কোন শরীক নেই– এ কথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। আর এ কথাকে সত্য মেনে নিলে এর সংবাদদাতা ও এ দিকে আহ্বানকারী নবী–রাসূলগণকেও সত্য বলে মেনে নিতে হয়। এ হচ্ছে ঈমানের প্রথম ও দ্বিতীয় দিক। আর তৃতীয় দিক হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই- এ কথাকে মেনে নিলে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধগুলোও সত্য মানতে হয় এবং সত্য মেনে নিতে হয় তার পরিণতিকে। অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক জীবন পরিচালনা না করলে আল্লাহ্র ক্রোধ, অসন্তুষ্টি ও আযাব ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে চললে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে এবং পরকালে জান্নাত লাভে ধন্য হওয়া যাবে।

ঈমান ও আমল

আমল ছাড়া ঈমান যথার্থ নয়। আমল না থাকলে ঈমান অপ্রমাণিত থেকে যায়। তাই ঈমানের সাথে সাথেই তদনুযায়ী আমল একান্ত জরুরী। ঈমান অনুযায়ী আমল হল, আল্লাহ্ যা আদেশ করেছেন তা যথাযথভাবে পালন করা এবং আল্লাহ্ যা কিছু হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। এ আমলই ঈমানদারকে প্রকৃত মু'মিনে পরিণত করে, সত্যিকারের ঈমানদার বানিয়ে দেয়। মূলত যার মধ্যে প্রকৃত ঈমান রয়েছে, তার ঈমানই তাকে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, তা করতে বাধা দিবে। এটাই ঈমানের অবদান। তাই ঈমান থাকলেই সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। যেমন, সমাজ বিধ্বংসী ও মানুষের অধিকার বিনষ্টকারী কতিপয় কর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে সে তাকে নির্লজ্জতা ও অপকর্মের আদেশ দেবে।[৬৯]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।[৭০]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

হে মু'মিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা

---

[৬৯] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নূর, ২৪/২১।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেননা, সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। (আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/২০৮)

[৭০] আল-কুরআন: সূরাহ হুজরাত, ৪৯/৬।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ ঈমান আনলে তাদের মন্দ নামে ডাকা পাপ। যারা এহেন কাজ থেকে তাওবা করে না তারাই যালিম।[৭১]

কারো পিছনে লেগে থাকা, কারো গীবত করা একটি সামাজিক ব্যাধি। যা সমাজ ব্যবস্থাকে এক পর্যায়ে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তাই এ ধরনের মন্দ কাজ থেকে মু'মিনদেরকে নিষেধ করে আল্লাহ্ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা পাপ। আর তোমরা (কারো) গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।[৭২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না, অনুমতি প্রার্থনা এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেয়া ব্যতীত। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ লাভ কর। সেখানে যদি তোমরা কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য বেশি পবিত্র'। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি অবগত।[৭৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীরা এবং তোমাদের যারা বয়োঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন (তোমাদের কাছে আসতে) তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে তিন সময়ে– ফজর সলাতের পূর্বে, আর যখন দুপুরে রোদের প্রচণ্ডতায় তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ এবং 'ইশার সলাতের পর। এ তিনটি তোমাদের পোশাকহীন হওয়ার সময়। এ সময়গুলো ছাড়া অন্য সময়ে (প্রবেশ করাতে) তোমাদের উপর আর তাদের উপর কোন দোষ নেই। তোমাদের একজনকে অন্যের কাছে যেতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দেশ খুবই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, বড়ই প্রজ্ঞাময়।[৭৪]

---

[৭১] আল-কুরআন: সূরাহ হুজরাত, ৪৯/১১।

[৭২] আল-কুরআন: সূরাহ হুজরাত, ৪৯/১২।

[৭৩] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নূর, ২৪/২৭-২৮।

[৭৪] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নূর, ২৪/৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত আয়াতে কারো ঘরে প্রবেশের নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যাতে নৈতিক অবক্ষয় না ঘটে। চাকর-চাকরানী এবং বালক-বালিকার জন্য ঘরের ভেতরে বিভিন্ন ব্যক্তির শয়ন কক্ষে প্রবেশের ব্যাপারে বিধি-নিষেধও পেশ করা হয়েছে। কেননা, এর ফলে ব্যক্তিরা যেমন বিভিন্ন সময় বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যেতে পারে, তেমনি আকস্মিকভাবে নানা অশোভনীয় ব্যাপার দেখতে পেয়ে নৈতিকভাবেও বিপর্যয়ে পড়ে যেতে পারে। তাই এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ বিধান করা হয়েছে। এ বিধানের ভিত্তিও ঈমান। ঈমান যে কী কী ভাবে মানুষকে নৈতিক অপরাধ থেকে রক্ষা করে এ বিধান তার একটি প্রকৃত ও স্পষ্ট নিদর্শন।

আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণিত শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। আসলে এই মাদক ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে নামায ও আল্লাহ্র যিকির থেকে বিরত রাখতে চায়। কাজেই তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে?[৭৫]

ধনীর সম্পদে দরিদ্রের হক রয়েছে। যা যাকাত ও দানের মাধ্যমে আদায় করতে হয়। দরিদ্ররা এ হক গ্রহণের ক্ষেত্রে ধনী দাতার কাছ থেকে কোনরূপ কষ্টকর আচরণ পাবে না এটাও তাদের একটি অধিকার। তাদের এ অধিকার যেন লঙ্ঘিত না হয় সেজন্য এরূপ ক্ষেত্রেও মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা বলে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান ব্যর্থ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সাওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।[৭৬]

সুদের লেনদেন ঋণ গ্রহীতাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এরূপ লেনদেনে সমাজের দরিদ্র লোকেরা আরো নিঃস্ব হয়। এতে ধনী ও দরিদ্রের শ্রেণি বিভেদ, শোষণ ও নিপীড়ন প্রকট হয়ে ওঠে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথ সুগম হয়। তাই মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের যে সব বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।[৭৭]

---

[৭৫] আল-কুরআন: সূরাহ আল-মায়িদা, ৫/৯১।

[৭৬] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/২৬৪।

[৭৭] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারো।[৭৮]

ধন-সম্পদ সংরক্ষণ মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। কাজেই অর্থনৈতিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে সামাজিক জীবনে যেন কোন ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়, কেউ যেন তার ধন-সম্পদ সুরক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য এ অধিকার সুনিশ্চিত করতে মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়ে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋনের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দিবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ্ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। আর ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও কম-বেশি না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় অথবা দূর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে দু'জন সাক্ষী কর। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা করোনা, তা ছোট হোক বা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করণ আল্লাহ্‌র কাছে সুবিচারকে অধিক কায়িম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত।[৭৯]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না।[৮০]

[৭৮] আল-কুরআন: সূরাহ আলে ইমরান, ৩/১৩০।

[৭৯] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/২৮২।

[৮০] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নিসা, ৪/২৯।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষদের কাছে ন্যায়সঙ্গত আচরণ ও সুবিচার পাওয়া নারীদের অন্যতম অধিকার। নারীর প্রতি সহিংসতা বা অন্যায় আচরণ একটি সভ্য সমাজের জন্য কাম্য নয়। তাই আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল নয়। তাদের প্রকাশ্যে অশ্লীলতায় সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া তোমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছ তার কিছু অংশ নিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখ না। নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্, অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[৮১]

মানুষের অন্যতম অধিকার হলো- সত্য সাক্ষ্য দেওয়া ও ন্যায় বিচার লাভ করা। ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার ক্ষুন্ন হলে সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। সমাজে বিপর্যয় দেখা দেয় ও সমাজ অন্যায়-অবিচারে ভরে যায়। তাই সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার্থে এ অধিকার সুরক্ষায় আল্লাহ্ মু'মিনদের নির্দেশ দিয়ে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর, এটাই আল্লাহ্ভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।[৮২]

কারো কাছে কিছু আমানত রাখা হলে সেটা সে সুরক্ষিত রাখা, কোন ধরনের খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা না করা এক মানুষের প্রতি আরেক মানুষের অধিকার। যে সমাজে মানুষের মাঝে আমানতদারীতা বিদ্যমান সেখানে মানবাধিকার বহুলাংশে সুরক্ষিত। আর যে সমাজে কোন ক্ষেত্রেই আমানতদারীতা নেই, তা বিপর্যস্ত ও ধ্বংসাত্মক সমাজ। সেজন্য আল্লাহ্ মু'মিনদের নির্দেশ দিয়ে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করোনা এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-বুঝে।[৮৩]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত নিষিদ্ধ কাজগুলো সমাজে কত যে অশান্তি ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি করতে পারে, তা সমাজবিদগণ অকপটে স্বীকার করেন। এসব অশান্তি ও বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার মৌলিক উপায় হচ্ছে সত্যিকারের ঈমান।

---

[৮১] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নিসা, ৪/১৯।

[৮২] আল-কুরআন: সূরাহ আল-মায়িদা, ৫/৮।

[৮৩] আল-কুরআন: সূরাহ আনফাল, ৮/২৭।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে, নির্লজ্জ ও অপকর্মে ধাবিত হতে, কোন ফাসিকের সংবাদ বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ করতে, কাউকে উপহাস করতে, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেতে, কোন নারীর প্রতি অবিচার করতে, অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতে, আমানতে খিয়ানত করতে, কিছু কিছু অমূলক ধারণা পোষণ, অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো এবং পরস্পরের গীবত তথা দোষ গেয়ে বেড়ানো, দান করে খোটা দেয়া প্রভৃতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়েছে যাবতীয় মাদক, জুয়া এবং শিরকী কার্যাবলী, যা কিনা বড় বড় অপরাধের নিয়ামক। এই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ঈমানদারদের সম্বোধন করেই। কেননা এই কাজগুলো ঈমানের পরিপন্থী। প্রকৃত মু'মিন কখনোই এই নিষিদ্ধ কাজগুলো করতে পারে না। সুতরাং এখানেও ঈমানের ভূমিকাই প্রবল। সমাজ-বিধ্বংশী এসব কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং সকল প্রকার নৈতিক পদস্খলন, চরিত্রহীনতা ও যাবতীয় পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার অবলম্বন হচ্ছে ঈমান। এই ঈমানের তাগিদেই মানুষ এসব কাজ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বিরত থাকবে।

মানবাধিকারের সাথে ঈমানের সম্পর্ক যে কতটা গভীর তা নিম্নের কয়েকটি হাদীস থেকেও উপলব্ধি করা যায়।

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা এবং হাত থেকে অপর মুসলিমরা নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মু'মিন সেই ব্যক্তি যার থেকে মানুষ নিজের জীবন ও সম্পদকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করে।[৮৪]

আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ খুৎবা খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথা বলেননি যে, যার আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই এবং যার ওয়াদা-অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দ্বীনও নেই।[৮৫]

আবূ উমামাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঈমান কী? জবাবে তিনি ﷺ বললেন, যখন তোমার নেক (সৎ) কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎ কাজ তোমাকে পীড়া দিবে তখন তুমি মু'মিন।[৮৬]

'আমর ইবনু আবাসা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইসলাম কী? তিনি ﷺ বললেন, মার্জিত কথাবার্তা বলা এবং (অভুক্তকে) আহার করানো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঈমান কী? তিনি বললেন, (গুনাহের কাজ থেকে) ধৈর্য ধরা এবং দান-খয়রাত করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বললেন, যার জিহ্বা এবং হাত থেকে অপর মুসলিমরা নিরাপদ থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন ঈমান উত্তম? তিনি ﷺ বললেন, সৎ স্বভাব (উত্তম আচরণ)।[৮৭]

মুয়ায ইবনু জাবাল (রাযি.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম ঈমান সম্পর্কে? জবাবে তিনি ﷺ বললেন, কাউকে ভালবাসলে আল্লাহ্র উদ্দেশেই ভালবাসবে এবং কারো সাথে শত্রুতা করলে তাও আল্লাহ্র জন্যই করবে আর নিজের জিহ্বাকে আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল

---

[৮৪] অলীউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-খতীব আত-তিব্রীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, (আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, তৃতীয় প্রকাশ ১৯৮৫), ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, ফাসলুস সানী, হাদীস নম্বর ৩৩, পৃ. ১৭।

[৮৫] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, ফাসলুস সানী, হাদীস নম্বর ৩৫, ১৭।

[৮৬] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, ফাসলুস সালিস, হাদীস নম্বর ৪৫, পৃ. ২০।

[৮৭] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, ফাসলুস সালিস, হাদীস নম্বর ৪৬, পৃ. ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

রাখবে। মুয়ায (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এছাড়া আমি আর কী করব? তিনি ﷺ বললেন, তুমি অপরের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করো। আর অপরের জন্য তা-ই অপছন্দ করবে যা নিজের জন্য অপছন্দ করে থাক।[৮৮]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন: তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।[৮৯]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك.

'উবাদাহ ইব্‌নুস সামিত (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাঁর পাশে একজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বলেছেন: তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বাই'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং সৎকাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূর্ণ করবে, তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে সেটা তার জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ। আর কেউ এর কোনটিতে লিপ্ত হলে ও আল্লাহ্‌ তা গোপন রাখলে, তবে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছে হলে তাকে ক্ষমা করবেন আর ইচ্ছে হলে শাস্তি দিবেন। আমরা এর উপর বাই'আত গ্রহণ করলাম।[৯০]

নির্লজ্জ ও বেহায়াপনা এমনই মন্দ স্বভাব যা মানুষকে যেকোন অপরাধের দিকে ধাবিত করতে সক্ষম। বাস্তবেও দেখা যায় যে, অধিকাংশ অপরাধীই নির্লজ্জ ও বেহায়া প্রকৃতির হয়ে থাকে। লজ্জাহীনতা ঈমানের পরিপন্থী। তাই একজন প্রকৃত ঈমানদার নির্লজ্জ হতে পারে না।

---

[৮৮] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, ফাসলুস সালিস, হাদীস নম্বর ৪৮, পৃ. ২১।

আরেক বর্ণনায় রয়েছে:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُول اللهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلهِ وَأَبْغَضَ لِلهِ وَأَعْطَى لِلهِ وَمَنَعَ لِلهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ .

আবূ উমামাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা একমাত্র আলাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই হয়ে থাকে তার ঈমান পরিপূর্ণ লাভ করল (সেই পূর্ণ ঈমানদার)। (ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস ইবনু শাদ্দাদ সিজিস্তানী, *সুনান আবূ দাউদ*, দারুল হাদীস কাহিরা, ১৯৯৯, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুস্ সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ: ঈমান বৃদ্ধি ও কমতির দলীল, হাদীস নম্বর ৪৬৮১, পৃ. ২০০০)

[৮৯] ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, (দারু ইবনে হাযম, কাহিরা, প্রথম সংস্করণ ২০১০), কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: নিজের জন্য যা পছন্দনীয়, তা স্বীয় ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করা ঈমানের অংশ, হাদীস নম্বর ১৩, পৃ. ১১।

[৯০] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ নম্বর ১১, হাদীস নম্বর ১৮, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, ঈমানের ষাটের অধিক শাখা রয়েছে। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।[৯১]

একথা সত্য যে, এ যুগে এমন বহু লোক পাওয়া যায় যারা নিজেকে মুসলিম পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এর কারণ হলো, তাদের ইসলাম গ্রহণ যথার্থ নয়। তারা ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবণ করতে পারেনি এবং পারেনি মুসলিম কাকে বলে তা বুঝতে। আয়ত্ত করতে পারেনি দ্বীনের নবী ﷺ-এর আদর্শ ও সুন্নাতকে। এ কারণে তারা যেমন প্রকৃত মুসলিম হতে পারেনি; তেমনি পারেনি প্রকৃত মু'মিন হতে। কারো ইসলাম গ্রহণ বিশুদ্ধ না হয়ে যদি বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শন হয় বা হত্যার ভয়ে হয় তাহলে সেই ঈমান ফলদায়ক হয় না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন:

قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

আরব মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম; আপনি বলে দিন, তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বলো, আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিম হয়েছি।[৯২]

যারা মানুষের অধিকার নষ্ট করে তারা কোন না কোনভাবে মুনাফিকীতে লিপ্ত রয়েছে। যা কিনা প্রকৃত ইসলাম ও ঈমান গ্রহণের পরিপন্থী।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ε قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আম্র (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: চারটি স্বভাব যার মধ্যে রয়েছে সে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিহার না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. যখন আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে; এবং ৪. ঝগড়ার সময় গালাগালি করে।[৯৩]

মুনাফিকের উল্লিখিত আলামতগুলো মানবাধিকারের পরিপন্থী। এগুলো দ্বারা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার ক্ষুন্ন হয়। সেজন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এগুলোকে মুনাফিকের নিদর্শন আখ্যা দিয়েছেন। অতএত, যার ভেতরে এ স্বভাবগুলো থাকবে সে প্রকৃত মুসলিম বা প্রকৃত মু'মিন নয়। কেননা, ঈমান এবং নিফাক একত্রে থাকতে পারে না। প্রকৃত ঈমান অবশ্যই মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আচরণ পরিশোধিত করে, তাকে খাটি মানুষে পরিণত করে।

একথা বলিষ্ঠভাবেই বলা যায় যে, প্রকৃত ঈমান অবশ্যই মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে একটি শক্তিশালী মাধ্যম। অপরাধ প্রতিরোধে ঈমান এমনই মজবুত নিয়ামক যা মানুষকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক

---

[৯১] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: ঈমানের বিষয়সমূহ, হাদীস নম্বর ৯, পৃ. ১১।

[৯২] আল-কুরআন: সূরাহ হুজ্‌রাত, ৪৯/১৪।

[৯৩] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: মুনাফিকের চিহ্ন, হাদীস নম্বর ৩৪, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

উভয় দিক থেকেই অপরাধ থেকে নিবৃত রাখতে সাহায্য করে। বিশ্ববাসীর সামনে আজ এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, মানুষকে শুধু শাস্তি দিয়ে, ভীতি জাগিয়ে বা নতুন নতুন আইন করেই অপরাধ থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয় যদি না তারা মন থেকেই স্বেচ্ছায় অপরাধ ত্যাগে অনুপ্রাণিত হয়, অপরাধকে ঘৃণা করতে শিখে।

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম বলেন: কুরআন মজীদ যে ঈমান গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে, সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ যে ঈমানের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ গঠন করেছিলেন, সে ঈমান হচ্ছে অপরাধ প্রতিরোধী একটি তুলনাহীন শক্তি। এই শক্তি চির নতুন, শাশ্বত– যে ঈমানের ভিত্তিতে আজও সমাজ গঠন করা হলে তা-ও একটি আদর্শ সমাজ হবে এবং তাতে অপরাধ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে না গেলেও তার মাত্রা, সংখ্যা ও প্রকোপ বহুলাংশে কম হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।[৯৪]

[৯৪] *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইবাদত

ইবাদতের অর্থ হচ্ছে বশ্যতা, আনুগত্য, বিনয় ও বাধ্যতা। যে বিনয় ও আনুগত্যের উর্ধ্বে কিছু নেই, তাই ইবাদত। বিনয় ও আনুগত্যের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র আইন পালন করাই ইবাদত।

ইমাম রাগিব তার লুগাত গ্রন্থে বলেন: উবুদিয়াত অর্থ বিনয়-নম্রতা-অধীনতা প্রকাশ করা। আর ইবাদত হচ্ছে, তারই সর্ব্বোচ্চ ও চূড়ান্তমাত্রা। কেননা ইবাদত অর্থ- সর্বশেষ মাত্রার আনুগত্য-অধীনতা-আত্মসমর্পণ। তা কেবল সেই মহান সত্তা-ই পাওয়ার অধিকারী যিনি চূড়ান্ত মান ও পরিমাণের দাতা; আর তিনিই আল্লাহ্।

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ তার 'রিসামাতুয উবুদিয়া' গ্রন্থে বলেন: ইবাদতের আসল অর্থ- বিনয়-আনুগত্য। বিনয়-অধীনতার সাথে ভালবাসাও অন্তর্ভুক্ত। তাতে যেমন আল্লাহ্‌র জন্য চরম আনুগত্য ও বিনয় থাকবে; তেমনি থাকবে আল্লাহ্‌র জন্য চরম মাত্রার ভালবাসাও।

ইবনু তাইমিয়াহ আরো বলেন: ইবাদত শব্দের তাৎপর্য দু'দিক থেকে প্রতিভাত হয়। তা হল- বিনয় এবং ভালবাসা– যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই পেতে পারে না। কেউ যদি কারো প্রতি বিনীত-অনুগত হয়েও অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ রাখে, তাহলে সে নিশ্চয়ই তার ইবাদতকারী নয়। অনুরূপভাবে কেউ যদি কাউকে ভালবাসে অথচ তার বিনীত-অনুগত না হয়, তবে সেও নিশ্চয়ই তার ইবাদতকারী নয়। সুতরাং দু'টির কোন একটির অনুপস্থিতি আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য যথেষ্ট নয়। ব্যক্তির কাছে একমাত্র আল্লাহ্‌ই হবেন সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়; সবকিছুর তুলনায় অনেক বেশি বড় ও অধিক সম্মানযোগ্য। মুলত বান্দার কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ বিনয় ও ভালবাসা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউই পেতেই পারে না।[৯৫]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

আপনি বলুন, যদি তোমাদের কাছে তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের বংশের লোক, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা মন্দায় পড়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসগৃহ যা তোমরা পছন্দ কর– আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশী পছন্দ হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র আদেশ আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ ফাসিক লোকদেরকে সুপথে পরিচালিত করেন না।[৯৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: তিনটি গুণ যার মধ্যে রয়েছে ঈমানের মিষ্টতা ও স্বাদ সেই পাবে: এক. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই তার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হওয়া। দুই.

---

[৯৫] *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৯।

[৯৬] আল-কুরআন: সূরাহ আত-তাওবা, ৯/২৪।

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন ব্যক্তির সাথে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে। তিন. ঈমানের পর কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া তার কাছে এরূপ অপছন্দনীয় যেরূপ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপছন্দনীয়।[৯৭]

'দ্বীন'ই আল্লাহ্‌র ইবাদতের তাৎপর্যের অন্তর্ভুক্ত। মানব জীবনে সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ তা'আলার শরীয়ত মেনে চলা, একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই আত্মসমর্পণ করা এবং শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা ইবাদতের মূলমন্ত্র। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ যথাযথ মেনে চললেই উবুদিয়াতের তাৎপর্য আল্লাহ্‌র জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হবে। যে কাজ মানুষের নৈতিকতা ও দেহের জন্য ক্ষতিকর, ইসলাম তা করতে নিষেধ করেছে। চাই তা ছোট হোক বা বড়। সেজন্যই সকল প্রকার পাপ, সীমালঙ্ঘন, স্বেচ্ছাচারিতা ও ঘৃণ্য কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামে ইবাদতের পরিধি অনেক অনেক বিস্তীর্ণ, বিশাল ও ব্যাপক। এর তাৎপর্য কিছু সুনির্দিষ্ট ইবাদত সম্পন্ন করা বা কতিপয় পরিচিত অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

মানব চরিত্রে ইবাদতের প্রভাব

ইসলামে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক ইবাদত হচ্ছে নামায, রোযা যাকাত ও হজ্জ। এ চারটি ইবাদতেই রয়েছে মানুষের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এ ইবাদতগুলোর লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষকে যাবতীয় হীনতা ও অপরাধ থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দায় পরিণত করা। যাবতীয় অন্যায় ও অপরাধ মুক্ত জীবন গঠনে এ ইবাদত সহায়তা করতে পারে। এ ইবাদতগুলো মূলত মানুষকে এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রস্তুত করে। তাই নীচে এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হলো-

(এক) সলাত: প্রতিটি সুস্থ, সাবালক ও মুসলিম ব্যক্তির উপর প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ফরয। সলাত এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার গভীর সম্পর্ক তৈরি করে। সলাত আদায়ের মাধ্যমে বান্দার মনে আল্লাহ্‌র ভয় ও আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। সলাতে মন ও দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে বান্দা নিজে আল্লাহ্‌র হুকুমের কাছে অবনত করে দেয়। আর যেন এটাই বলতে চায় যে, হে আল্লাহ্! আমার মন ও সমগ্র দেহ আপনার আদেশ মানতে প্রস্তুত।

বান্দার দিনের সূচনা হয় ফজর সলাতের দ্বারা। সে সলাতের জন্য তার দেহ ও মনকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে নেয়। আল্লাহু আকবার বলে সলাত আরম্ভ করে হামদ-সানা পাঠ, কুরআন তিলাওয়াত, রুকু ও সাজদাহ করে সে নিজেকে একমাত্র আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়। সে সলাতে এ ওয়াদাই দিয়ে থাকে যে, সারাদিনের কাজ-কর্মে সে যাবতীয় অপরাধ থেকে দূরে থেকে নিজেকে পবিত্র রাখবে। এরপর সলাত শেষে সে নিজের কর্মে নিয়োজিত হয়। এ সলাতের মাধ্যমেই মানসিক ও আত্মিকভাবে কাজ-কর্মে নিষ্কলুষ ও অপরাধমুক্ত থাকার পাথেয় সংগ্রহ করে নেয়। অতঃপর তার কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেই পুনরায় শুরু হয় যুহরের সলাতের ওয়াক্ত। সে পুনরায় একইভাবে সলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে নিজেকে অবনত করে। তারপর পর্যায়ক্রমে আসে আসর, মাগরিব ও ইশার সলাতের সময়। এভাবে দিন-রাতে সে সলাতের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে অবনত করে এটাই প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে ও তাঁর নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকতে ওয়াদাবদ্ধ। সে আল্লাহ্‌র দাসত্বে কোনরূপ সীমালংঘন করেনি। সুতরাং সারাদিনে কোন মূহুর্তে আল্লাহ্‌কে ভুলে না যাওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে এ সলাত। তাই একজন প্রকৃত মুসল্লীর পক্ষে আল্লাহ্‌র না-ফরমানি কাজ করা

---

[৯৭] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: বল প্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করা, অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি কুফরী গ্রহণের পরিবর্তে দৈহিক নির্যাতন, নিহত ও লাঞ্ছিত হওয়াকে বেছে নেয়, হাদীস নম্বর ৬৯৪১, পৃ. ৮২৮।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব হতে পারে না। কেননা, এ সলাতে মানুষকে অপরাধ থেকে নিবৃত করার উপকরণ রয়েছে। তাইতো সলাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ

"নিশ্চয়ই সলাত মানুষকে সবধরনের নির্লজ্জ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৯৮]

এ সলাত জামাআতের সাথে মসজিদে আদায় করা বাঞ্ছণীয়। মসজিদে উপস্থিত হয়ে এক মুসলিম ভাই অপর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত লাভ করে থাকে। সেখানে সকলে অভিন্ন উম্মাত হয়ে একই উদ্দেশ্যে এক ইমামের পিছনে একই কাতারে দাঁড়িয়ে এক আল্লাহ্র জন্য ইবাদত সম্পন্ন করে থাকে। সকলেই 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' অর্থাৎ আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক- এ কথা বলে সলাত শেষ করেন। এ কথা বলে সলাত শেষ করার মাধ্যমে এটাই জানানো হচ্ছে যে, আমার থেকে আপনার জান-মাল, ইজ্জত সব কিছুর নিরাপত্তা ঘোষণা দিচ্ছি। আমার ভাইদের কোন অধিকার ক্ষুন্ন করা আমার দ্বারা হবে না। সুতরাং মানবাধিকার রক্ষার শিক্ষা সলাতের মধ্যেও নিহিত। এছাড়া মসজিদে এক মুসলিম ভাই অপর মুসলিম ভাইয়ের খোঁজ-খবর নিতে পারে। কেউ মসজিদে না এলে তার কোন অসুবিধা হয়েছে কিনা সেটা জানার গুরুত্বও তারা অনুভব করে। এভাবেই মুসল্লীদের মাঝে সুস্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় একে অপরের প্রতি ভালবাসা। এ সলাতই মানুষের মনে সৃষ্টি করে আল্লাহ্র ভয়, তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহ্র হুকুম না মানার ভয়াভহ পরিণতিকে। তাইতো একই কাতারে শামিল হওয়া মুসলিম ভাইয়ের জন্য সে তা-ই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে থাকে। সে তার ভাইয়ের প্রতি অন্যায় অবিচার করা থেকেও বিরত থাকে। কারণ সে এটা বিশ্বাস করে যে, কারো অধিকার বিনষ্ট করলে এর জন্য পরকালে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি তার জন্য অবধারিত।

(দুই) সিয়াম[৯৯]: ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে রমাযান মাসে সিয়াম-সাধনা করা। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার প্রশিক্ষণে রয়েছে মানুষকে সব ধরনের অন্যায়-অপরাধ থেকে মুক্ত করার অবদান এবং মানুষের অন্তরকে প্রবৃত্তি থেকে পরিচ্ছন্ন করার নিয়ামক। এ সিয়াম মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে সিয়াম পালনকারীকে সব ধরনের অপরাধমূলক কাজ অর্থাৎ লোভ-লালসা, প্রবৃত্তির অনুসরণ, যৌন স্পৃহা, অহংকার, সীমালংঘন- এক কথায় আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় না-ফরমানী থেকে বিরত রাখে। সিয়াম-সাধনার এ প্রশিক্ষণ বান্দার মনে আল্লাহ্ভীতি সৃষ্টি করে বান্দাকে মুত্তাকী বানায়। মহান আল্লাহ্ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে। যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা আল্লাহ্ভীরু হতে পার।"[১০০]

রোযা অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার জন্য কিছু হালাল কাজকেও সাময়িকভাবে হারাম করেছেন। যেমন রোযাদার ব্যক্তি দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস ও পানাহার থেকে বিরত থাকবে।

---

[৯৮] আল-কুরআন: সূরাহ আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫।

[৯৯] সিয়াম আরবী শব্দ। এর একবচন হলো সওম। অর্থ: কোন কিছু থেকে বিরত থাকা। ইসলামী পরিভাষায়: প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ত, সক্ষম, মুসলিম নারী-পুরুষকে সুবহি সাদিক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে পানাহার, যৌনসম্ভোগ, অশ্লীল-গর্হিত প্রভৃতি কাজ ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকতে হয় বলে ঐ বিশেষ বিরতির নাম দেয়া হয়েছে সিয়াম।

[১০০] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

তোমাদের জন্য রমাযানের রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস বৈধ করা হয়েছে, তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নির্ধারিত বস্তু খোঁজ কর এবং তোমরা আহার ও পান করতে থাক যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা থেকে ঊষাকালের সাদা রেখা প্রকাশ না পায়। অতঃপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর, আর মাসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না। এসব আল্লাহ্র আইন, কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। আল্লাহ্ মানবজাতির জন্য নিজের আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে।[১০১]

'আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

যে ব্যক্তির (বিয়ের) সামর্থ নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার প্রবৃত্তিকে দমন করে।[১০২]

রোযাদার ব্যক্তি একমাস দিনের বেলায় নিজের স্বীর সাথে যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট হয়। যদিও স্ত্রী সহবাস তার জন্য বৈধ তথাপি রোযার কারণে সে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস বর্জন করছে। কাজেই এটা আশা করা যায় যে, সে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে বছরের বাকী এগার মাস নিষিদ্ধ যৌন সম্ভোগ (ধর্ষন, যেনা-ব্যভিচার ইত্যাদি অপরাধ) থেকে বিরত থাকবে। ফলে যৌন অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার লংঘনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

রমাযান মাসে পানাহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এ মাসে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য পানীয় গ্রহণ নিষিদ্ধ। সামনে হালাল সুস্বাদু খাবার ও পানীয় উপস্থিত থাকা সত্ত্বে অত্যন্ত পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত বান্দা তা আল্লাহ্র ভয়ে খায় না। এর দ্বারা সে এটাই বুঝাতে চায় যে, যে মহান আল্লাহ্ তার জন্য এসব খাবার হালাল করে দিয়েছেন, সেই আল্লাহ্র হুকুমেই এই সময়টাতে তা ভক্ষণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। সুতরাং কোন মুসলিম যখন একমাস বৈধ খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় যে, বাকী এগার মাস সে অবৈধ খাদ্যাভাস থেকে বিরত থাকবে। ফলে তার পক্ষে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা, চুরির মাল ভক্ষণ করা, প্রতারণা ও ধোঁকার মাধ্যমে রিযিক তালাশ করা সম্ভম হবে না। সুতরাং রিযিক তালাশের জন্য (অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থান যোগানের জন্য) সমাজে যেসব মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে তা বন্ধে প্রকৃত সিয়াম সাধনার অবদান অনস্বীকার্য।

---

[১০১] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/১৮৭।

[১০২] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সওম, অনুচ্ছেদ: অবিবাহিত ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করলে রোযা রাখবে, হাদীস নম্বর ১৯০৫, পৃ. ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং জানা সত্ত্বেও অসৎ উপায়ে মানুষের সম্পদ গ্রাস করার উদ্দেশে তা বিচারকের নিকট নিয়ে যেও না।[১০৩]

সিয়াম মুসলিমকে সকল প্রকার অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখে। যদিও এসব কাজ মুসলিমদের জন্য সব সময়ই নিষেধ তথাপি সিয়াম পালন অবস্থায় একাজ আরো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। তাই রোযাদার রোযা অবস্থায় আরো কঠোরভাবে অশালীন ও অশ্লীলতা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। সে অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে কাউকে আঘাত করে না, সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায় না ইত্যাদি। হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ ...,يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: সিয়াম ঢাল স্বরূপ। কাজেই রোযাদার অশ্লীলতা ও মূর্খতাসুলভ আচরণ করবে না। যদি কেউ তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় বা গালি দেয়, তবে সে যেন বলে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার। (আল্লাহ্ বলেন,) সে তো আমার জন্যই খাদ্য, পানীয় ও যৌনাচার বর্জন করে। সিয়াম আমারই জন্য। সুতরাং আমি নিজেই এর পুরস্কার দিব।[১০৪]

সিয়াম অবস্থায় মিথ্যা ও আজে-বাজে কথা বলা, চোগলখুরী করা, ধোঁকাবাজি, হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা, কপটতা, জুলুম এগুলো জায়িয নয়। এমনিভাবে চরিত্র বিনষ্টকারী উপায়-উপকরণ থেকে রোযাদার বিরত থাকবে। এগুলো রোযা এবং রোযা ছাড়া উভয় অবস্থায়ই ইসলামে নাজায়িয।

কোন ব্যক্তি যদি এভাবে একমাস নিজের রাগ দমন করে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে এবং কারো উপর কোন প্রকার অন্যায় ও বাড়াবাড়ি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে তাহলে অবশিষ্ট এগার মাস এ প্রশিক্ষণের অবদানেই সে যেকোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে সক্ষম হবে এটাই স্বাভাবিক।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার খাদ্য ও পানীয় বর্জনে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই।[১০৫]

---

[১০৩] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/১৮৮।

[১০৪] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সওম, অনুচ্ছেদ: রোযার ফাযীলাত, হাদীস নম্বর ১৮৯৪, পৃ. ২২৬।

[১০৫] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সওম, অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী কাজ বর্জন করে না, হাদীস নম্বর ১৯০৩, পৃ. ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং মিথ্যা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, ঝগড়া-বিবাদ ও নীতি বিবর্জিত কর্ম দ্বারা মানব সমাজে যেসব অন্যায়-অপরাধেদের সৃষ্টি হতে পারে সিয়াম সাধনার দ্বারা তা বন্ধ হয়ে যায় এবং পাশাপাশি মানবাধিকার সুরক্ষিত হয়।

(তিন) যাকাত[১০৬]: যাকাত মুসলিম ব্যক্তির অর্থনৈতিক ইবাদত। দারিদ্রের প্রতিকার এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। যাকাতের মাধ্যমে শ্রেণি বৈষম্য দূর হয়। সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা, সংকীর্ণতা, কৃপণতা, হিংসা প্রভৃতি থেকে মানুষের অন্তরকে পবিত্র করতে যাকাত ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই প্রকৃত সফলকাম।[১০৭]

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন কল্যাণ নেই; কিন্তু কল্যাণ আছে কেউ ঈমান আনলে আল্লাহ্র উপর, পরকালের উপর, ফিরিশতাদের উপর, সকল কিতাবের উপর, আর সকল নবী-রাসূলদের উপর এবং আল্লাহ্র ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী এবং দাস মুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় করলে, সলাত কায়িম করলে, যাকাত দিলে, কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলে আর অভাবে-রোগে-শোকে ও যুদ্ধ বিভ্রাটে ধৈর্যধারণ করলে। এরাই হল সত্যনিষ্ঠ দল, আর এরাই হচ্ছে সত্যিকারের পরহেযগার (মুত্তাকী)।[১০৮]

যে মুসলিম ব্যক্তি নিয়মিত যাকাত দেন সে কখনো অন্য লোকের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারে না। সম্পদের মোহ কখনো তাকে অন্যায় কাজে উদ্ধুদ্ধ করতে পারে না।

যাকাত ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করে গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হয়। এটা ধনীর সম্পদে গরীবের হক বা অধিকার। যাকাত থেকে যদি শান্তিপূর্ণভাবে সঠিক বন্টনের মাধ্যমে গরীব লোকেরা নিজের ন্যায্য অংশ লাভ করতে পারে তাহলে দরিদ্রদের মনে ধনীদের সম্পদের ব্যাপারে কোন হিংসা-বিদ্বেষ থাকতে পারে না। যাকাত ধনী গরীবের মধ্যকার দূরত্ব দূর করে পরস্পরকে ভাই-ভাইয়ে পরিণত করে দেয়। দরিদ্র লোকদেরকে অভাব-অনটন থেকে স্বচছল জীবন-যাপনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এ

---

[১০৬] যাকাতের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্রতা, আধিক্য, কোন জিনিসের উত্তম অংশ। ইসলামী পরিভাষায়: ধন-সম্পদের যে নির্দ্দিষ্ট অংশ শরীয়তের বিধান মোতাবেক আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা মানুষের উপর ফরয করা হয়েছে তাকেই যাকাত বলা হয়। অন্য কথায়, নিসাব পরিমাণ ধন-মালের অধিকারী ধনীরা ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী প্রতি বছর মালিকাধীন সম্পদ থেকে যে নির্দিষ্ট সম্পদ নির্ধারিত খাতে দান করেন তাকে যাকাত বলা হয়। কুরআন মাজীদে যাকাতকে সদাক্বাহ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যাকাত ব্যতীত অন্যান্য দান-খয়রাত সাধারণ সদাকা হিসেবে গণ্য।

[১০৭] আল-কুরআন: সূরাহ আল-হাশর, ৫৯/৯।

[১০৮] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত। ফলে অভাব-অনটনের কারণে ও প্রতিহিংসায় সমাজ জীবনে যেসব ক্ষেত্রে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে থাকে বা সৃষ্টি হয় তা বন্ধ হয়ে যায়। সমাজের ধনী-গরীব সকলের মধ্যে এক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যাতে তা দিয়ে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন।[১০৯]

ইসলামে যাকাত প্রবর্তনের হিক্মাত অনেক। এর উদ্দেশ্য মানবের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটানো। কুরআন ও হাদীস পর্যালোচনা করলে এগুলো আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়। যাকাত কাকে দিতে হবে- এ সম্পর্কে সূরাহ তাওবাহ্ এবং অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যাকাত প্রদান ও অন্যান্য সকল ধরনের উত্তম কাজে ব্যয় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এতেই আল্লাহ্ তা'আলার হিক্মাতগুলো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। নিম্নে যাকাত প্রবর্তনের কতিপয় হিকমাত উল্লেখ করা হল-

১। এটা মু'মিনদের হৃদয়কে নানা ধরনের পাপ থেকে পরিষ্কার করে এবং খারাপ কাজের প্রবণতা থেকে মনকে পরিষ্কার রাখে। আর তা আত্মার কৃপণতা, টাকা-পয়সার প্রতি অত্যধিক লোভ এবং এ লোভের কারণে অন্যান্য যে অকল্যাণ হয় তা থেকে অন্তরকে পাক-পবিত্র করে।

২। দরিদ্র মুসলিমদের সাহায্য করে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা ও তাদের সম্মান করা, যাতে তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের কাছে সাহায্য চেয়ে নিজেদেরকে অপমানিত না করে।

৩। ঋণভারে আক্রান্ত এমন ঋণগ্রস্ত মুসলিমদের ঋণ পরিশোধ করে দিয়ে তাদের মনের অস্থিরতা দূর করা এবং তাদের বোঝা লাঘব করা।

৪। দোদল্যমান হৃদয়গুলোকে ঈমান ও ইসলামের রংঙে রঞ্জিত করে নানা ধরনের সন্দেহ ও মনের ধোঁকা থেকে রক্ষা করা। যাতে ধীরে ধীরে তাদের ঈমানে দৃঢ়তা আসে এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস তৈরী হয়।

৫। সাথে সাথে যারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করবে তাদেরকে সহযোগিতা করা। তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা ইসলাম প্রচার করে আর কুফ্রী ও ফিতনা-ফ্যাসাদকে সমূলে উচ্ছেদ করে ন্যায়ের চর্চাকে মানুষের মাঝে বিকশিত করতে সক্ষম হয়। ফলে সমাজে কোন ফিতনা দেখা দিবে না এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে এক আল্লাহ্র জন্যই হবে।

৬। কোন মুসাফির মুসলিম যখন যাত্রাপথে কোন বিপদে পড়ে এবং যাত্রা শেষে ঘরে ফিরার মতো তার অর্থ-সম্পদ না থাকে তখন তাদেরকে ঐ পরিমাণ যাকাত দেয়া, যা দিয়ে তারা তাদের ঘরে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

৭। সম্পদকে পবিত্র করা, বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সম্পদের মালিককে নানা ধরনের বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আর এটা তখনি সম্ভব যখন আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁর আদেশের উপর চলার অভ্যাস পাওয়া যাবে।

---

[১০৯] আল-কুরআন: সূরাহ আত-তাওবা, ৯/১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

এগুলো হল- যাকাত আদায়ের কতিপয় হিক্‌মাত ও মহান উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও যাকাত আদায়ে অনেক উপকারিতা রয়েছে। কারণ, শরীয়তের হুকূমের গোপন রহস্য ও হিক্‌মাত পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না।

ধনীর সম্পদে গরীবের হক রয়েছে। এ চেতনাই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রাণ-শক্তি। এ চেতনা ধনীদের উপর দায়িত্ব অর্পন করেছে গরীবদের হক প্রদানের। এ চেতনা মুসলিমদের শোষণ-পীড়ন ও সীমালঙ্ঘনে জর্জরিতকরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ফলে ইসলামী সমাজে এ ধরনে কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়া সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

যাকাত হল ফকীর, মিসকীন ও তৎসম্পর্কিত কর্মচারী ও যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাবিজ্ঞানী।[১১০]

শাসক-প্রশাসকের দায়িত্ব হচ্ছে- এ হক আদায় করে গরীবদের মাঝে বন্টন করে তাদের মানবাধিকার সংরক্ষণ করা। তাই হাদীসে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

ইবনু 'আব্বাস (রাযি.) বলেন, নবী ﷺ মু'আয (রাযি.)-কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় বলেছেন: তুমি (সেখানকার অধিবাসীদের) এ সাক্ষ্য প্রদানের আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর প্রতি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করে দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে।[১১১]

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِى فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ .

[১১০] আল-কুরআন: সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯/৬০।

[১১১] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ: যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ১৩৯৫, পৃ. ১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

রাফি‘ ইবনু খাদীজ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী সৈনিকের সমান (মর্যাদা সম্পন্ন) যে পর্যন্ত না সে বাড়িতে ফিরে আসে।[১১২]

قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ε عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلّ مُسْلِمٍ.

জারীর ইব্নু ‘আবদুল্লাহ্ (রাযি.) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে সলাত ক্বায়িম করা, যাকাত দেয়া ও সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনার উপর বায়‘আত গ্রহণ করেছি।[১১৩]

(চার) হজ্জ: হজ্জ[১১৪] ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এ ইবাদতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা বর্ণ ও গোত্রের মুসলিমরা মক্কার উপকণ্ঠে একত্রিত হয় অভিন্ন লক্ষ্যে একই জাতিভুক্ত হিসেবে। এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী সকলেই তাঁর কাছে নিজেদের জীবনের সকল অপরাধ ও পাপ ক্ষমা প্রার্থনা করে আর পরবর্তী জীবনে অপরাধমুক্ত থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। এ হজ্জ তাকওয়া (আল্লাহ্ভীতি) অর্জনের সহায়ক। পার্থিব জীবনে অপরাধ করলে পরকালে শাস্তি পেতে হবে- এই ভয়কে আশ্রয় করে মানুষকে নানাবিধ অপরাধ থেকে বিরত রাখার অনন্য উপায় হজ্জ।

মহান আল্লাহ্ বলেন:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ

হজ্জ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে, অতঃপর এ মাসগুলোতে যে কেউ হজ্জ করার মনস্থ করবে, তার জন্য হজ্জের মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায়-আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয় এবং তোমরা যে কোন সৎ কাজই কর, আল্লাহ্ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয় সাথে নিও। তবে সর্বোত্তম পাথেয় হল তাকওয়া। হে জ্ঞানীরা! তোমরা আমাকেই ভয় কর।[১১৫]

হজ্জ সম্পন্ন করে হাজীগণ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করে এবং সেই পাথেয় নিয়ে তারা নিজ দেশে ফিরে আসে। এই শক্তিই তার পরবর্তী সমগ্র জীবনে সব ধরনের অপরাধ ও পাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য ঢালের মত কাজ করে। হাদীসে এসেছে-

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

---

[১১২] ইমাম আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ‘আস ইবনু শাদ্দাদ সিজিস্তানী, *সুনান আবূ দাঊদ*, (দারুল হাদীস কাহিরা, ১৯৯৯), ৩য় খণ্ড, কিতাবুল খারাজি ওয়াল ইমারাতি ওয়াল ফাই, বাবু ফীস সা‘আয়াতি আলাস সাদাকাতি, হাদীস নম্বর ২৯৩৬, পৃ. ১২৮৩-৮৪।

[১১৩] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ: যাকাত দেয়ার উপর বাই‘আত গ্রহণ, হাদীস নম্বর ১৪০১, পৃ. ১৬৯।

[১১৪] হজ্জ আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ: সংকল্প করা, মনে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করা। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়: নির্দিষ্ট সময়ে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট কাজ করার উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ গমন করাকে হজ্জ বলে। ইসলামের বিধান মতে- কা‘বা ঘরে, মিনায় ও ‘আরাফাহ্ ময়দানে গিয়ে নির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পাদন করার জন্য মাক্কার অভিমুখে যাওয়াকে হজ্জ বলা হয়।

[১১৫] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে হজ্জ করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও পাপ থেকে বিরত থাকল, (হজ্জ শেষে) সে যেন ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরল যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।[১১৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

আবূ হুরাইরা (রাযি.) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যদি কেউ হজ্জ করে এবং তাতে কোনরূপ অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ না করে, তবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।[১১৭]

জ্ঞাতব্য, হজ্জসহ যাবতীয় ইবাদত কবূল হওয়ার জন্য উপার্জন হালাল হওয়া শর্ত। সুতরাং যিনি হজ্জ করতে যাবেন তার হজ্জের জন্য ব্যয় করার অর্থ হালাল হতে হবে। মক্কায় আসা-যাওয়ার ভাড়া, সেখানে থাকা-খাওয়া, যানবাহনের খরচ, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ এবং শরীর হালাল আয়ে গঠিত হতে হবে। কাজেই হজ্জও অন্যের সম্পদ আত্মাৎ না করার ও অন্যকে না ঠকানোর শিক্ষা দিচ্ছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ .

আবূ হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি শুধুমাত্র পবিত্রকেই গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে ঐ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যে বিষয়ে (পূর্বে আগত) রাসূলগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ বলেন: "হে রাসূলগণ! তোমরা (পাক-পবিত্র) হালাল খাদ্য খাও এবং সৎকাজ কর।" আল্লাহ্ আরো বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের যে হালাল রিয্‌ক দান করেছি তা থেকে খাও। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করছে (ভ্রমণকারী তথা মুসাফিরের দু'আ সাধারণত বেশি কবূল হয়) তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধূলাবালি। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি দু' হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে কাতর স্বরে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে প্রার্থনা করছে অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারাম দ্বারাই সে উদরপূর্তি করেছে, তাহলে কিভাবে এ ব্যক্তির দু'আ কবূল হতে পারে?[১১৮]

আবূ হুরাইরা (রাযি.) থেকে আরেকটি মারফু হাদীসে এসেছে: মানুষ যখন হালাল অর্থসহ হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং বাহনে পা রেখে 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা' বলে, তখন আকাশ থেকে জবাব আসে: তোমার হজ্জের জন্য উপস্থিতি কবূল করা হল, তোমার উপস্থিতি কল্যাণময়, তোমার

---

[১১৬] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হজ্জ, অনুচ্ছেদ: হজ্জে মাবরুর এর ফাযীলাত, হাদীস নম্বর ১৫২১, পৃ. ১৮৫।

[১১৭] ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী, *জামে' আত-তিরমিযী*, (দারুল হাদীস কাহিরা, মিসর, প্রকাশকাল ২০১০), ৩য় খণ্ড, কিতাবুল হজ্জ, অনুচ্ছেদ নম্বর ২, হাদীস নম্বর ৮১১, পৃ. নম্বর ১০৯।

[১১৮] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, (দারু ইবনে হাযম, কাহিরা, ফুয়াদ আবদুল বাকী' সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ২০১০), কিতাবুয যাকাত, বাবু কুবূলিস সাদাকাতি মিনাল কাসবিত্ তায়্যিবি ওয়া তারবিয়াতুহা, হাদীস নম্বর ১০১৫, পৃ. ২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

পাথেয় হালাল, তোমার বাহন হালাল, তোমার হজ্জ নেকীর হকদার, পাপের নয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অপবিত্র খরচ নিয়ে হজ্জের জন্য বের হয় এবং বাহনে পা রেখে 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা' বলে তখন আকাশ থেকে এক আহ্বানকারী বলে 'লা লাব্বাইকা ওয়া লা সা'দাইকা' তোমার উপস্থিতি অগ্রাহ্য তোমার উপস্থিতি কল্যাণময় নয়। তোমার পাথেয় হারাম, তোমার খরচ হারাম, তোমার হজ্জ গাইরে মাবরূর (নেকী লাভের উপযোগী নয়)।[১১৯]

তাই দেখা যায়, হজ্জ হালাল উপার্জনের প্রেরণা দেয়। অন্যের অর্থ আত্মসাৎ, ঘুষ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত অর্থে হজ্জ করলে তা কবূল হয় না। তাই বলা যায়, হজ্জ অন্যের অধিকার সংরক্ষণের প্রেরণা দিয়ে মানবাধিকার সংরক্ষণ করে।

ঈমান ভিত্তিক ইবাদতের গুরুত্ব

অপরাধ প্রতিরোধে সকল ইবাদতের মূল ভিত্তি হচ্ছে- আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় ঈমান। এই ঈমানের ভিত্তিতেই সব ইবাদত ফরয হয়েছে। ঈমানই মানুষের আচার-আচরণকে সংশোধন, সুশোভন ও পরিসমার্জন ও সুদৃঢ় করে গড়ে তোলে। তথাপি ঈমানদার লোকদের সমাজে অপরাধ প্রবণতার বিস্তৃতি লক্ষণীয়। কিন্তু কেন? এসব লোকেরা তো ইবাদতের প্রায় সকল আনুষ্ঠানিকতাই সম্পন্ন করে থাকে।

ইবাদত হচ্ছে বটে, তবে তা নাম সর্বস্ব ইবাদত যাতে প্রকৃত প্রাণশক্তি নেই। মানুষের অন্তরে যতটুকু আল্লাহ্‌ভীতি জাগ্রত থাকলে সেই প্রাণশক্তি লাভ করা যায়, তার অভাব অত্যন্ত প্রকট। পাশাপাশি জাতীয় জীবনে অন্ধ অনুসরণের নামে যে ব্যাপক অভ্যাস দেখা যায়, তা-ও সেই প্রাণশক্তির পরিপন্থী। বস্তুত একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই মুসলিমের ইবাদতের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং তা সম্পাদন করা উচিত মানসিকভাবে; লৌকিকতার জন্য নয়। অন্যথায় সেই ইবাদত প্রাণহীন ও অকার্যকর।

মানুষের জীবনে ঈমান সুফল দিতে পারে, যদি সেই ঈমান হয় নির্ভুল আকীদা ভিত্তিক এবং কথার সাথে কাজেরও পূর্ণ মিল থাকে। এমন অনেক লোক আছে যারা মুখে ঈমানদার দাবি করলেও ঈমানের সাথে তাদের অন্তরের গভীর সম্পর্ক নেই। ফলে এরূপ ঈমানের দাবি নিতান্তই লোক দেখানো বা প্রতারণায় পরিণত হয়।[১২০] এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ *يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

এমনও লোক আছে যারা মুখে বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসের প্রতি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়। তারা আল্লাহ্ ও ঈমানদার লোকদের ধোঁকা দিচ্ছে। কিন্তু আসলে তারা নিজেদেরই ধোঁকা দিচ্ছে, যদিও তারা তা বুঝতে পারে না।[১২১]

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً

---

[১১৯] আল্লামা আবদুল আযীয বিন বায (রহ.), *হজ্জ উমরাহ ও যিয়ারাত*, (বঙ্গানুবাদ: আল্লামা আবূ মুহাম্মদ 'আলীমুদ্দীন, আলীমুদ্দীন একাডেমি, দ্বাদশ সংস্করণ ২০১০), পৃ. ৩১-৩২।

[১২০] *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-১১৩।

[১২১] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/৮-৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সাথে ধোঁকাবাজি করে; কিন্তু আসলে এ ধোঁকা তাদের নিজেদেরই উপর পড়ে। তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন নিতান্তই অনিচ্ছুকভাবে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় যে, তারা নামায পড়ছে অথচ তারা আল্লাহ্‌কে খুব কম-ই স্মরণ করে।[১২২]

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামে 'ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ'[১২৩] একটি অতীব কার্যকরী পন্থা। এ পন্থার বড় কাজ হচ্ছে কোনো অপরাধ যেন সংঘটিত হতে না পারে এবং অপরাধ হওয়ার কারণসমূহই যেন নির্মূল হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করা। প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ যেকোনো ধরনের অপরাধ দমনের ক্ষেত্রেই অপরাধ সংঘটিত হতে না দেওয়াই একটি অধিকতর সফল পন্থা। অর্থাৎ এমন উপায় অবলম্বন করা যাতে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আশংকাই যেন না থাকে কিংবা খুব কম আশংকা থাকে এবং অপরাধের মাত্রা একেবারে কমে আসে। যদি অপরাধ সংঘটিত হয়ও তা সাধারণ নিরাপত্তাহীনতা ও আতংক সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে না।

---

[১২২] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নিসা: ৪/১৪২।

[১২৩] অন্যায় ও অপরাধ দমনে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামে এটি 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার' হিসেবে পরিচিত। এটি একটি মহান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে বিমূখতা বা অবহেলা প্রদর্শন কোন জাতি বা সমাজের ধ্বংসকে অনিবার্য করে তুলে।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত প্রতিটি অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, আসল ঘটনার পূর্বে এমন সব অগ্রবর্তী ঘটনাবলী অবশ্যই সংঘটিত হয়, যার দরুন উক্ত ঘটনাবলী ঘটবে। এ ব্যাপারে 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' এর কাজই হচ্ছে, এগুলোর প্রচলন হতে না দেওয়া এবং এসব সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক ও সাবধান করা। যেমন ইসলামে পর্দার বিধানের কথাই ধরা যাক। নারী-পুরুষ উভয়কে স্বীয় লজ্জাস্থানের হিফাযত এবং দৃষ্টি অবনত করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ভিন পুরুষদের সামনে নারীদের উলঙ্গ ও সুসজ্জিত হয়ে অবাধে উন্মুক্তভাবে চলাফেরা করা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদি নিষেধ করা হয়েছে। পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ এমন নারী-পুরুষের একাকি সাক্ষাত, মিষ্টি আলাপও ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ এগুলো নিলর্জ্জ ও অন্যায় কাজ। এগুলো সামনে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পথকে সুগম করে দেয়। যেহেতু 'আমর বিল মা'রূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার'-এর বড় দায়িত্ব হলো- মানুষের চরিত্র ও ইজ্জত রক্ষা করা। তাই এ পর্যায়ে এ সংস্থাটির কাজ হলো- মানুষের মান-মর্যাদা বিনষ্ট হওয়ার মতো কোনো ঘটনাই যেন সংঘটিত না হয় সে ব্যবস্থা করা। ফলে পর্দাহীনতা, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার কারণে যেসব অপরাধ সমাজে সংঘটিত হয় এবং মানবাধিকার লংঘিত হয়ে থাকে তা মূলেই বন্ধ হয়ে যাবে, মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। যদি মুসলিম নারী-পুরুষের মাঝে শরীয়তসম্মত পর্দা পুরোপুরি পালন করা হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এ পর্যায়ের অপরাধ খুবই বিরল হয়ে যাবে। যদি কোথাও এ বিধান লংঘিত হয়, তাহলে 'আমর বিল মা'রূফ' ওয়ান নাহী আনিল মুনকার' বিভাগের লোকেরা তা শক্ত হাতে দমন করবে, তা হতে দেবে না।

অনুরূপভাবে সমাজে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাবের কথাই ধরা যাক। মাদকাসক্ত লোকদের দ্বারা সমাজে কতই না মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। অপরাধ দমনে ইসলাম এক্ষেত্রেও নিয়েছে যথাযথ কার্যকরী ও সফল ব্যবস্থা। তা হলো- যে সব উপায়-উপকরণ অপরাধ সংঘটনের পথকে সুগম করে সে সব উপকরণ উৎপাদন-ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। ইসলাম যাবতীয় মাদক উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, উপঢৌকন ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। 'আমর বিল-মারূফ ওয়ান নিহী আনিল মুনকার' এই মদপান, মদ উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানি, মদ উৎপাদনে সহযোগিতা, মদের ব্যবসা, মদ বিক্রয় ইত্যাদি সবই বন্ধ করে দেয়। ইসলামী শরীয়তে এসব কাজ চূড়ান্তভাবেই হারাম।

যদি মুসলিম সমাজে মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত উপর্যুক্ত নিষিদ্ধ কর্মগুলো পুরোপুরি বন্ধ করা হয়, স্বাভাবিকভাবেই এ পর্যায়ের অপরাধ খুবই বিরল হয়ে যাবে। যদি কোথাও এ বিধান লংঘিত হয়, তখন 'আমর বিল মা'রূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার' বিভাগের লোকেরা তা দৃঢ় হস্তে দমন করবে এবং কোনভাবেই তা হতে দেবে না। মূলতঃ যেসব উচ্চতর মূল্যবোধের ফলে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধ দমিত হতে পারে, 'আমর বিল-মা'রুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' সেই মূল্যবোধকেই মানুষের মনে সক্রিয় করে তুলে জাগিয়ে দেয়। এ ব্যবস্থা হলো- অপরাধ প্রতিরোধে আল্লাহ্‌র শরীয়তের মহান অবদান।

মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে যা ইচ্ছে করবে তা ঠিক নয়। ইসলামও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। কিন্তু ইসলাম ঘোষিত ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থ- সমষ্টিকে ধ্বংসের আয়োজন করার অধিকার নয়। সে অধিকার কখনো কাউকেই দেওয়া হয়নি।

'আমর বিল মা'রূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার' -এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে- মানুষের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যে, মহান আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দার পার্থিব কার্যাবলীর প্রতিদানস্বরূপ জান্নাত ও জাহান্নাম ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কবর জীবনে শাস্তি অথবা আযাবের ব্যবস্থাও রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ওপরই নির্ভর করছে বান্দার পরকালীন জীবনের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য। মানুষের অন্তরে এ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে 'আমর বিল মা'রূফ ওয়ান নাহী আনিল

Dhaka University Institutional Repository

মুনকার'-এর ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর। অপরাধ ত্যাগের প্রবণতা এ বিশ্বাস থেকেই উৎসারিত হয়। মানব মনে অপরাধ করার বাসনা জাগলেই এ বিশ্বাস তার বাস্তবায়নের পথে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং অপরাধ সংঘটিত হতে না দেওয়ার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি একটি সফল প্রতিরোধক। নিম্নে 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নির্দেশনাগুলো তুলে ধরা হলো:

মুসলিম জাতির উপর 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব অর্পণ

মহান আল্লাহ্ 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার'-এর মহান দায়িত্ব বিষয়ে মুসলিম উম্মতকে লক্ষ্য করে বলেছেন:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ

তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম।[১২৪]

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরা সর্বোৎকৃষ্ট জাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ দিবে, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখবে।[১২৫]

وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ

তোমরা একে অপরকে সৎ কাজে ও তাকওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে, কিন্তু পাপ কাজে ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করবে না। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। অবশ্যই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।[১২৬]

خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ

ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, ভাল কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ লোকদেরকে এড়িয়ে চল।[১২৭]

এ দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের অপরিহার্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ

(এরা তারাই) যাদেরকে আমি যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সলাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে।[১২৮]

---

[১২৪] আল-কুর'আন: সূরাহ আলে 'ইমরান, ৩/১০৪।

[১২৫] আল-কুর'আন: সূরাহ আলে 'ইমরান, ৩/১১০।

[১২৬] আল-কুর'আন: সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫/২।

[১২৭] আল-কুরআন: সূরাহ আল-আ'রাফ, ৭/১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে 'ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ'করণের প্রতি অধিক গুরুত্বদান

একটি সুষ্ঠু সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে 'ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ'করণের খুবই গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এ দায়িত্ব পালন ব্যতীত অন্যায় প্রতিরোধ ও মানবাধিকার সুরক্ষা কঠিন। সেজন্য ইসলাম এ বিষয়টির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং এ দায়িত্ব যথাযথ পালন কোনভাবেই যেন অবহেলিত ও বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে ইসলাম অত্যন্ত সজাগ ও সর্তক। হাদীসে এসেছে-

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: তোমাদের কেউ মন্দ কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বীয় হাতের দ্বারা (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) তা পরিবর্তন করে দেয়। যদি তার এই ক্ষমতা না থাকে, তবে সে মুখ দ্বারা (বুঝানো বা প্রতিবাদ করে) তা পরিবর্তন করবে। আর যদি এই সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে, তবে এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।[১২৯]

ইবনু মাস'ঊদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: কোন জাতির কাছে আমার পূর্বে যে নবীকেই পাঠানো হয়েছে, তাঁর উম্মাতের মধ্যে তাঁর সহায়তার জন্য একদল সাহায্যকারী ও সাহাবী থাকত। তাঁর সুন্নাতকে তারা আঁকড়ে ধরত এবং তাঁর আদেশ মেনে চলত। এদের পরে এমন লোকের আবির্ভাব হবে যে, তারা যা বলবে তা নিজেরা করবে না এবং এমন কাজ করবে তাদেরকে যা করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। অতএব, যে লোক হাত দিয়ে এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মু'মিন। এদের বিরুদ্ধে মুখ দিয়ে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। আর যে এদের বিরুদ্ধে যে মন দিয়ে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। এরপর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমানের স্তর নেই।[১৩০]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ε أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: স্বৈরাচারী বাদশা বা স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত কথা বলা সবচেয়ে উত্তম জিহাদ।[১৩১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ε قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا

---

[১২৮] আল-কুরআন: সূরাহ হাজ্জ, ২২/৪১।

[১২৯] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, (দারু ইবনে হাযম, কাহিরা, ফুয়াদ আবদুল বাকী' সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ২০১০), কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: মন্দ কাজে বাধা দেয়া ঈমানের অঙ্গ; ঈমান বাড়ে ও কমে; ভালো কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা উভয়টি ওয়াজিব, হাদীস নম্বর ৪৯, পৃ. ২৯; *জামে' আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল ফিতান, অনুচ্ছেদ- হাত, মুখ বা অন্তর দ্বারা অন্যায়ের পরিবর্তন করা সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ২১৭২, পৃ. ২১৬।

[১৩০] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নম্বর ৫০, পৃ. ২৯। ইমাম যাকারিয়া মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শারফ আন-নবূবী, *রিয়াদুস সালিহীন*, (দারু ইবনে হাযম, কাহিরা, মিসর, প্রথম সংস্করণ ২০০৮), অনুচ্ছেদ: সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ১৮৫, পৃ. ৭১।

[১৩১] *সুনান আবূ দাঊদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মালাহিম, অনুচ্ছেদ: আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ৪৩৪৪; *জামে' আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল ফিতান, অনুচ্ছেদ: স্বৈরাচারী শাসকের সম্মুখে ন্যায়সঙ্গত কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ, হাদীস নম্বর ২১৭৪, পৃ. ২১৭; *রিয়াদুস সালিহীন*, প্রাগুক্ত, হাদীস নম্বর ১৯৪, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন: তোমরা রাস্তার উপর বসা ছেড়ে দাও। লোকজন বলল, এ ছাড়া আমাদের কোন পথ নেই। কেননা, এটাই আমাদের উঠাবসার জায়গা এবং এখানেই আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। নবী ﷺ বলেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক কী? তিনি ﷺ বললেন, দৃষ্টি অবনমিত রাখা, (কাউকে) কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করা।[১৩২]

এ দায়িত্ব পালনের মর্যাদা

'ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ' কেবল দায়িত্বই নয়; বরং একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। এ মহান দায়িত্ব পালনকারীকে ইসলাম বিশেষ সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছে। তারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে মহা সম্মানিত ও সুসংবাদপ্রাপ্ত। এরূপ মর্যাদাদানে এ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও ধৈর্য সহকারে দায়িত্ব চালিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা রয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

(লুকমান বলল) হে আমার ছেলে! সলাত কায়িম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক এবং তোমার উপর যে বিপদ-আপদ আসে তাতে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ।[১৩৩]

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

তারা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, কৃতজ্ঞ, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকূ' ও সাজদাহ্কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহ্র দেওয়া সীমাসমূহের হিফাযতকারী। কাজেই মু'মিনদের সুসংবাদ দিন।[১৩৪]

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

তারা আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে এবং কল্যাণকর কাজে তৎপর থাকে, বস্তুতঃ তারা পুণ্যবানদের মধ্যে গণ্য।[১৩৫]

---

[১৩২] *রিয়াদুস সালিহীন*, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ১৯০, পৃ. ৭৩; *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবু মাযালিম, অনুচ্ছেদ: ঘরের আঙিনা ও রাস্তায় বসা .., হাদীস নম্বর ২৪৬৫, পৃ. ২৯২।

[১৩৩] আল-কুর'আন: সূরাহ লুকমান, ৩১/১৭।

[১৩৪] আল-কুর'আন: সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯/১১২।

[১৩৫] আল-কুরআন: সূরাহ আলে 'ইমরান, ৩/১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

যারা প্রেরিত উম্মী নবীকে অনুসরণ করবে, তারা তাঁর পরিচয় তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত পাবে। সে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে, পবিত্র বস্তুসমূহ তাদের জন্য হালাল করে, অপবিত্র বস্তুগুলো তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে, তাদের থেকে গুরুভার সরিয়ে দেয় আর সেই শৃংখল (হালাল-হারামের বানোয়াট বিধি-নিষেধ) যাতে ছিল তারা বন্দী। কাজেই যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করে আর তাঁর উপর অবতীর্ণ আলোর অনুসরণ করে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।[১৩৬]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ

মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোক পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় ও পাপ কাজ করতে নিষেধ করে, নামায কায়িম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।[১৩৭]

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ *أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

অতঃপর সে মু'মিনদের মধ্যে শামিল হয় আর পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয় এবং উপদেশ দেয় দয়া প্রদর্শনের। এরাই ডানপন্থী (সৌভাগ্যবান)।[১৩৮]

وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

শপথ যামানার। নিশ্চয় মানুষ ভীষণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।[১৩৯]

'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা' প্রদান না করার পরিণতি

যেখানে 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা' নেই সেখানে মানবাধিকার সুরক্ষিত নয়। সেখানে অশান্তি, হানাহানি ও অমানবিকতা চারদিক থেকে চেপে বসবে। সেই সমাজে নেমে আসবে আল্লাহ্র আযাব ও গযব। আর তাতে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেসব জ্ঞানী ও সৎ লোকেরাও যারা 'ভাল কাজের

[১৩৬] আল-কুরআন: সূরাহ আল-আ'রাফ, ৭/১৫৭।

[১৩৭] আল-কুরআন: সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯/৭১।

[১৩৮] আল-কুর'আন: সূরাহ আল-বালাদ, ৯৫/১৭-১৮।

[১৩৯] আল-কুর'আন: সূরাহ আল-'আসর, ১০৩/১-৩।

Dhaka University Institutional Repository

আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ' না করে চুপচাপ বসেছিল। দায়িত্ব পালনে পিছপা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তাদেরকে দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে উচ্চারিত কথার দ্বারা অভিশাপ দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে পাপ ও অসৎ কাজ করতে নিষেধ করত না। তারা অত্যন্ত জঘন্য কর্মনীতিই অবলম্বন করেছিল।[১৪০]

أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

আমরা এমন লোকদের মুক্তি দিলাম যারা অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকত, আর যারা অত্যাচারী ছিল বিপর্যয়মূলক কাজের কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করলাম।[১৪১]

হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: ঐ সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। নতুবা অবিলম্বে আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাঁর আযাব নাযিল করবেন। তখন তোমরা তাঁর কাছে দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সে দু'আ কবুল করবেন না।[১৪২]

عَنْ النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ ε قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا

নু'মান ইবনু বাশীর (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমালঙ্ঘনকারীর উদাহরণ হলো: একদল লোক লটারি করে একটি সমুদ্রযানে উঠল তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক নীচের তলায় আর কিছু সংখ্যক উপরের তলায় জায়গা পেল। নীচের তলার মানুষদের পানির দরকার হলে তারা তাদের উপরের তলার লোকদের নিকট দিয়ে পানি আনতে যায়। তারা (নীচের তলার লোকেরা) একে অন্যকে বলল, আমাদের এখান দিয়ে আমরা যদি একটি ছিদ্র করে নেই, তাহলে উপরের তলার লোকদেরকে কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন হতো না। যদি তারা (উপরের তলার লোকেরা) এখন তাদেরকে এই কাজ করতে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হবে। আর যদি তারা তাদেরকে বাধা দেয় (ছিদ্র করা থেকে বিরত রাখে) তাহলে নিজেরাও রক্ষা পাবে এবং সবাইকেও বাঁচাতে পারবে।[১৪৩]

---

[১৪০] আল-কুরআন: সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫/৭৮-৭৯।

[১৪১] আল-কুরআন: সূরাহ আল-আ'রাফ, ৭/১৬৫।

[১৪২] *জামে' আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল ফিতান, অনুচ্ছেদ: সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, হাদীস নম্বর ২১৬৯, পৃ. ২১৫।

[১৪৩] *রিয়াদুস সালিহীন*, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ১৮৭, পৃ. ৭২-৭৩; *জামে' আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল ফিতান, অনুচ্ছেদ নম্বর ১২, হাদীস নম্বর ২১৭৩, পৃ. ২১৭; *সহীহুল*

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসটি দ্বারা প্রতিয়মান হয়, 'আমর বিল মা'রূফ ওয়ান নাহী আনিল মুন্‌কার'-এর কাজটি বড় বড় অপরাধ সংঘটনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

উম্মু সালামাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: তোমাদের উপর কিছু শাসককে নিয়োগ করা হবে। তাদের কিছু কার্যকলাপের সাথে (ইসলামী শারী'আত অনুযায়ী হবার কারণে) তোমরা পরিচিত থাকবে আর কিছু কার্যকলাপ তোমাদের নিকট (শারী'আত বিরোধী হবার কারণে) অপরিচিত থাকবে। এমন অবস্থায় যে লোক এগুলোকে মন্দ জানবে সে (গুনাহ্‌র) দায়মুক্ত। আর যে লোক এর প্রতিবাদ করবে সে (জবাবদিহির ব্যাপারে) নিরাপদ। কিন্তু যে লোক এমন কাজের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করল এবং এর সাথে সহায়তা করল (সে নাফরমানী করল)।[১৪৪]

عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ε يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلاَ يُغَيِّرُوا إِلاَّ أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْل أَنْ يَمُوتُوا .

জারীর (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি: কোন ব্যক্তি কোন জাতির মধ্যে বাস করছে যাদের মাঝে পাপাচার হচ্ছে, তারা এ পাপাচার প্রতিরোধে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিরোধ করছে না, তাহলে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ্ তাদের চরম শাস্তি দিবেন।[১৪৫]

عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا . وَقَالَ مَرَّةً أَنْكَرَهَا . كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا .

আল-'উরস ইবনু 'আমীরাহ আল-কিন্‌দী (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: কোন স্থানে যখন অন্যায় সংঘটিত হয়, তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হলে, সে অনুপস্থিতদের মতই গণ্য হবে (অর্থাৎ তার গুনাহ হবে না)। আর যে ব্যক্তি অন্যায় কাজের স্থান থেকে অনুপস্থিত হয়েও তাতে সন্তুষ্ট হয়, সে অন্যায়ে উপস্থিতদের অর্ন্তভুক্ত।[১৪৬]

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ε دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

যায়নাব বিনতু জাহাশ (রাযি.) হতে বর্ণিত। একবার নবী ﷺ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন এবং বলতে লাগলেন, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আরবের লোকেদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলিল অগ্রভাগকে তার সঙ্গের শাহাদাত আঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিয়ে

বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: অংশীদারিত্ব, অনুচ্ছেদ: লটারির মাধ্যমে অংশ নিরূপণ ও ভাগ করা যাবে কিনা, হাদীস নম্বর ২৪৯৩, পৃ. ২৯৬।

[১৪৪] *জামে' আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল ফিতান, অনুচ্ছেদ নম্বর ৭৮, হাদীস নম্বর ২২৬৫, পৃ. ২৬৪; *রিয়াদুস সালিহীন*, প্রাগুক্ত, হাদীস নম্বর ১৮৮, পৃ. ৭৩।

[১৪৫] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মালাহিম, অনুচ্ছেদ: আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ৪৩৩৯।

[১৪৬] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মালাহিম, অনুচ্ছেদ: আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ৪৩৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

গোলাকার করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাযি.) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকজন থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হাঁ যখন পাপকাজ অতি মাত্রায় বেড়ে যাবে।[১৪৭]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ε إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ . ثُمَّ قَالَ { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ } إِلَى قَوْلِهِ { فَاسِقُونَ } ثُمَّ قَالَ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَىِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا . عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ε بِنَحْوِهِ زَادَ أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ

'আবদুল্লাহ্‌ ইবনু মাস'ঊদ (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন: বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম ত্রুটি ঢুকেছে এভাবে যে, তাদের কেউ অপরজনের সাক্ষাতে বলতো, এই যে! তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং যা অপকর্ম করছো, তা পরিত্যাগ করো। কেননা এগুলো করা তোমার জন্য বৈধ নয়। পরের দিন আবার ঐ অপকর্মকারীর সঙ্গে সাক্ষাত হলে সে অপকর্ম ত্যাগ না করা সত্ত্বেও (নিষেধকারী) তার সাথে একত্রে পানাহার ও মেলামেশা করা হতে বিরত থাকতো না। যখন তাদের অবস্থা এরূপ হলো, তখন আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরকে পরস্পরের সাথে একাকার করে দিলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন: "বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল.... ফাসিকূন" পর্যন্ত (সূরাহ আল-মায়িদা: ৭৮-৮১)। পুনরায় তিনি বলেন: কখনো নয়, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিবে এবং অবশ্যই অত্যাচারীর দুই হাত ধরে তাকে সৎপথে ফিরে আসতে ও সত্যের উপর অবিচল থাকতে বাধ্য করবে। অন্যথায় আল্লাহ্‌ তোমাদের পরস্পরের অন্তরকে একাকার করে দিবেন। অতঃপর তোমাদেরকেও বনী ইসরাঈলের মতো অভিশপ্ত করবেন।[১৪৮]

রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ সত্য থেকে বিচ্যুত মানুষদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রায়ই সাহাবীগণকে উজ্জীবিত করতেন, বিচ্যুত মানুষদের পরিণতি বর্ণনা করতেন। তাই তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে-

রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন: যখন বনী ইসরাঈল অন্যায় কাজে লিপ্ত হলো, তাদেরকে তাদের আলিমগণ তা থেকে বিরত থাকতে বলল, কিন্তু তারা তা করল না। তাদের সাথে আলিমগণ উঠা-বসা ও পানাহার করতে থাকল। তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের পরস্পরের হৃদয়কে মিলিয়ে দিলেন (ফলে আলিমরাও অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ল)। আল্লাহ্‌ তা'আলা দাউদ ও 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের মুখ দিয়ে তাদেরকে অভিশাপ দিলেন। কেননা, তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসেন এবং বলেন: কখনও নয়,

---

[১৪৭] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, অনুচ্ছেদ: ইয়াজুজ ও মাজূজের কিস্‌সা, হাদীস নম্বর ৩৩৪৬, পৃ. ৪০৪; *রিয়াদুস সালিহীন*, প্রাগুক্ত, হাদীস নম্বর ১৮৯, পৃ. ৭৩।

[১৪৮] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল মালাহিম, অনুচ্ছেদ: আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ৪৩৩৬, পৃ. ১৮৫৩; *রিয়াদুস সালিহীন*, প্রাগুক্ত, হাদীস নম্বর ১৯৬, পৃ. ৭৪-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমার জীবন যাঁর হাতে সেই সত্তার শপথ! তাদেরকে তোমরা (অত্যাচারীদেরকে) হাত ধরে টেনে এনে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত ছাড়বে না।[১৪৯]

অন্যায়-অত্যাচার সামাজিক শৃঙ্খলাকে ব্যাহত করে; নিরীহ মানুষকে কঠিন সমস্যায় ফেলে দেয়। তাই সামাজিক সংহতি রক্ষার জন্য অন্যায়-অবিচারের প্রতিরোধ আবশ্যক। যদি সমাজের কেউ তার প্রতিরোধে এগিয়ে না আসে তখন সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সমগ্র জাতির উপর আযাব পতিত হয়। তাই হাদীসে এসেছে-

আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোকেরা! এ আয়াত তোমরা পড়ে থাক: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের কথা ভাব, তোমরা সঠিক পথে থাকলে কারো পথভ্রষ্টতায় তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। তোমাদের সকলকেই আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। তারপর তোমাদেরকে তিনি বলে দিবেন, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কি করছিলে"– (সূরাহ আল-মায়িদা, ১০৫)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি (আবূ বকর) বলতে শুনেছি: লোকেরা যখন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও তার প্রতিরোধ না করবে, তখন আল্লাহ্ শীঘ্রই এমন লোকদের উপর 'আযাব পাঠাবেন।[১৫০]

যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে, কিন্তু নিজেই সে অনুযায়ী কাজ করে না, তার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

তোমরা মানুষকে ন্যায়ের পথে চলার আদেশ দিয়ে থাক আর নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর, তোমাদের বুদ্ধিকে কি কোন কাজেই লাগাও না?[১৫১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন এমন কথা বল যা নিজেরাই কর না? আল্লাহ্‌র কাছে এটা খুবই আপত্তিকর ব্যাপার যে, তোমরা এমন কথা বল যা নিজেরাই কর না।[১৫২]

প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে- সৎ কাজের আদেশ দেয়া, অসৎ কাজ থেকে অন্যকে বিরত রাখা এবং নিজেও তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা। সৎ কাজের আদেশকারী ও অসৎ কাজের বিরতকারী যদি নিজে সে অনুযায়ী আমল না করে তার পরিণতি সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে-

উসামাহ্ ইবনু যাইদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ

---

[১৪৯] *জামে' আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, অধ্যায়: তাফসীরুল কুরআন, অনুচ্ছেদ: সূরাহ মায়িদাহ থেকে, হাদীস নম্বর ৩০৪৭, পৃ. ৯৬-৯৭; *রিয়াদুস সালিহীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

[১৫০] *জামে' আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল ফিতান, অনুচ্ছেদ: অন্যায়ের প্রতিরোধ না করলে আযাব নাযিল হওয়া সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ২১৬৮, পৃ. ২১৫; *রিয়াদুস সালিহীন*, প্রাগুক্ত, হাদীস নম্বর ১৯৭, পৃ. ৭৫।

[১৫১] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/৪৪।

[১৫২] আল-কুরআন: সূরাহ সফ্, ৬১/২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

জনৈক লোককে কিয়ামাতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, ফলে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। এটা নিয়ে সে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেভাবে গাধা চক্রের মাঝে ঘুরে থাকে। তার চারপাশে জাহান্নামীরা একত্রিত হয়ে প্রশ্ন করবে, হে অমুক! তোমার এই অবস্থা কেন? তুমি কি উত্তম কাজের আদেশ দিতে না এবং অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করতে না? সে বলবে, হ্যাঁ আমি সৎ কাজের নির্দেশ দিতাম, কিন্তু তা আমি নিজে করতাম না। অন্যদেরকে আমি অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করতাম, কিন্তু আমি নিজেই আবার তা করতাম।[১৫৩]

[১৫৩] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা, অনুচ্ছেদ: জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য এবং তা মাখলুক হওয়া সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ৩২৬৭, পৃ. ৩৯৫; *রিয়াদুস সালিহীন*, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: যে লোক উত্তম কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে, কিন্তু নিজেই সে অনুযায়ী কাজ করে না, তার শাস্তি সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ১৯৮, পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে বিভিন্ন সাবধানবাণী

ইসলাম মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীর ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। যেন সে এর পরিণতি জেনে ভীত হয়ে অপরাধ ত্যাগ করে। পাশাপাশি যেসব মন্দ স্বভাব মানুষকে মানবাধিকার লঙ্ঘনে ধাবিত করে তা থেকে দূরে থাকার জন্য ইসলাম সতর্ক করেছে। কারণ, ইসলাম শুধু অপরাধীকে ভয় দেখিয়ে অপরাধ নির্মূল করতে চায় না; বরং যেসব বস্তু ও আচরণ অপরাধ সংঘটনের উপকরণ হিসেবে কাজ করে তাও বন্ধ করতে ইসলাম বদ্ধ পরিকর। তাই ইসলাম এগুলোকে কবীরা গুনাহ বা মহাপাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে তারা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি, অপরাধের ভয়াবহতা, জাহান্নাম, পরকালে শাস্তি ও কঠিন পরিণতির সম্মুখিন হওয়া, দুনিয়ায় ঈমানহারা ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অভিশাপ বর্ষিত হওয়া প্রভৃতি ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষার্থে অপরাধ পরিহারে সচেষ্ট হবে। কেননা, এর সবই মানুষের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করে দেয় এবং এসবের দ্বারা মানুষ হয় বড় ক্ষতিগ্রস্ত।

যুলুম-অত্যাচার করার পরিণতি

ইসলাম শারিরীক, মানুষিক ও আর্থিক সব ধরনের যুলুমকে হারাম করেছে এবং তার মন্দ পরিণতির কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। ইসলাম এটাও জানিয়ে দিয়েছে যে, এসব যুলুম, নাফরমানী, পাপকর্ম ও আল্লাহ্দ্রোহীতার কারণে অনিবার্যভাবে একটি জাতি কিংবা জনসমষ্টি একেবারে ধবংস হয়ে যায়, আর অত্যাচারীদের উপর নেমে আসে আল্লাহ্র কঠিন আযাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ

আর তুমি কখনও মনে করো না যে, অত্যাচারীরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বেখবর। তবে তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে।[১৫৪]

وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِداً

আর ঐসব জনপদ, যখন এর অধিবাসীরা অত্যাচার করেছিল, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি সঠিক সময় ঠিক করেছিলাম।[১৫৫]

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[১৫৬]

وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

যারা অত্যাচার করে তোমরা তাদের দিকে ঝুঁকে পড় না। তাহলে তাদের সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।[১৫৭]

---

[১৫৪] আল-কুরআন: সূরাহ ইবরাহীম, ১৪/৪২।

[১৫৫] আল-কুরআন: সূরাহ আল-কাহ্ফ, ১৮/৫৯।

[১৫৬] আল-কুরআন: সূরাহ আশ-শুরা, ৪২/৪২।

[১৫৭] আল-কুরআন: সূরাহ হুদ, ১১/১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ سعيد بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سبع أرضين.

সাঈদ ইবনু যায়িদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি যুলুম করে অর্ধহাত যমীন দখল করবে নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন অনুরূপ সাতটি যমীন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।[১৫৮]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: তোমরা অত্যাচার করা থেকে সাবধান থাক। নিশ্চয়ই অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকার হবে।[১৫৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ . قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة بِصَلَاة وَصِيَام وَزَكَاة وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّار .

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী জান দরিদ্র (দেওলিয়া) কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে তো সেই ব্যক্তিই দেওলিয়া যার কোন দিরহাম নেই, কোন সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন: আমার উম্মাতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি দেওলিয়া যে কিয়ামতের দিন সলাত, সিয়াম ও যাকাতের মত আমল নিয়ে উপস্থিত হবে কিন্তু উপস্থিত হবে এমতাবস্থায় যে, (দুনিয়াতে) সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়েছে, কারো রক্তপাত করেছে, কাউকে প্রহার করেছে। অতঃপর তার নেকীসমূহ থেকে একে দেয়া হবে, ওকে দেয়া হবে। যদি সকলকে পরিশোধ করার পূর্বে তার নেকী শেষ হয়ে যায় তবে অবশিষ্ট অভিযোগকারীদের পাপগুলো নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সেই পাপের মাধ্যমে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১৬০]

অবিচার করার পরিণতি

বিচার-ফায়সালা মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পার্থিব শৃংখলা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এর বিকল্প নেই। সত্যের উপর ভিত্তি করে বিচার-ফায়সালা করাই ইসলামী রীতি। এর ব্যত্যয় ঘটলে বিচারপ্রার্থী ও অভিযুক্তের প্রতি অবিচার হওয়াই স্বাভাবিক। আর এ অবিচারই মানবাধিকার লঙ্ঘন। তা-ই ইসলাম সত্যের ভিত্তিতে বিচার-ফায়সালা করার নির্দেশ দেয়। অবিচারের পরিণতি নির্দেশ করে হাদীসে বলা হয়েছে-

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ .

---

[১৫৮] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল বুয়ূ, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ২৯৩৮, পৃ. ৮৮৭।

[১৫৯] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ১৮৬৫, পৃ. ৫৮৪।

[১৬০] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদাব, বাবুয যালিম, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৫১২৭, পৃ. ১৪১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনু বুরাইদাহ (রাযি.) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকার বিচারক জান্নাতী এবং অপর দুই প্রকার বিচারক জাহান্নামী। জান্নাতী বিচারক হলো, যে সত্যকে বুঝে তদনুযায়ী ফায়সালা দেয়। আর যে বিচারক সত্যকে জানার পর স্বীয় বিচারে যুলুম করে সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক অজ্ঞতা প্রসূত ফায়সালা দেয় সেও জাহান্নামী।[১৬১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ.

'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিচারের ব্যাপারে ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাত করেছেন।[১৬২]

কোন নির্দোষকে অন্যের দোষে দোষী করার পরিণতি

ইসলাম চায় অপরাধী অপরাধের শাস্তি পাক। একজনের অপরাধ নির্দোষ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে তাকে অভিযুক্ত করা ইসলাম সমর্থন করে না। কেউ স্বীয় অপরাধ যদি নির্দোষ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়, তা হবে চরম অন্যায় ও মানবাধিকার লঙ্ঘন। তাই এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً

যে ব্যক্তি নিজেই কোন অপরাধ বা পাপ করে তা নিরপরাধ কোন ব্যক্তির উপর আরোপ করে তাহলে সে নিজেই উক্ত অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহ বহন করবে।[১৬৩]

মাপে বা ওযনে কম দেয়ার পরিণতি

মাপে বা ওযনে কম দেয়া হারাম। কম দেয়ার বিষয়টি মাপের মাধ্যমে হোক, গণনার মধ্যমে হোক বা অন্য যে কোন পন্থায় হোক প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দেয়া ইসলামে হারাম ও কবীরা গুনাহ। প্রাপককে প্রাপ্য কম দিলে তার হক নষ্ট করার পাপ হয়। এই প্রাপ্য পরিশোধ না করলে অথবা ক্ষমা না নিলে কিয়ামতের দিন ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ *الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلاَ يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ *لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

যারা মাপে কম দেয়, তাদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত। যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় আর লোকদের যখন মেপে দেয় বা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কী চিন্তা করে না যে, তারা কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে?[১৬৪]

আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

وَلَمْ يَنْقُصُوا المِكْيَالَ وَالمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ المَئُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ

আর মানুষ যখন ওযনে ও পরিমাপে কম দিবে তখন মানুষের উপর দুর্ভিক্ষ, খাদ্য সংকট এবং অত্যাচারী শাসকের দুঃশাসন নেমে আসবে।[১৬৫]

---

[১৬১] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আকযিয়া, বাবু ফিল কাযী য়ূখতিউ, হাদীস নম্বর ৩৫৭৩, পৃ. ১৫৪৬।

[১৬২] *জামে' আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, আবওয়াবুল আহকাম, বাবু মা জাআ ফির রাশি ওয়াল মুরতাশি ফিল হুকমি, হাদীস নম্বর ১৩৩৬, পৃ. ৪০১; *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আকযিয়া, বাবু ফী কারাহিয়াতির রাশওয়াতি, হাদীস নম্বর ৩৫৮০, পৃ. ১৫৪৯।

[১৬৩] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নিসা, ৪/১১২।

[১৬৪] আল-কুরআন: সূরাহ মুতাফ্ফীফিন, ৮৩/১-৫।

Dhaka University Institutional Repository

পণ্যের দোষ ক্রেতার কাছে লুকিয়ে রাখার পরিণতি

ভোক্তা অর্থের বিনিময়ে নিখুঁত ও নির্ভেজাল পণ্যদ্রব্য ভোগ করবে, এটাই ভোক্তার অধিকার। এ অধিকার সংরক্ষণে ইসলাম বাজার প্রশাসনের ব্যবস্থা করেছে। মানুষ যাতে নির্ভেজাল ত্রুটিহীন পণ্য ভোগাধিকার লাভ করে সেজন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছে। পণ্যের দোষ ক্রেতার কাছে লুকিয়ে বিক্রি করা অপরাধ হিসেবে পরিগণিত। তাই হাদীসে বলা হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাদ্যের একটি স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি উক্ত স্তূপে হাত ঢুকিয়ে ভেতরে খাদ্য ভেজা দেখতে পান। তখন তিনি বলেন: এটা কি, হে খাদ্যের মালিক? সে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! বৃষ্টি হয়েছিল তো তাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কেন ভেজা খাদ্যগুলো উপরে রাখলে না তাহলে মানুষ তা দেখতে পেতো। যে ধোঁকা দেয় তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।[১৬৬]

কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা না করারর পরিণতি

ইসলাম প্রয়োজনবোধে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। তবে শর্ত হলো, সকল স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে হবে। কেননা, একাধিক স্ত্রী থাকলে স্ত্রী হিসেবে স্বামীর কাছে সকলেই সমঅধিকার প্রাপ্য। স্বামী সকল স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষা না করলে বঞ্চিত স্ত্রীর অধিকার ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু ইসলাম স্বামীকে এ অধিকার হরণের অনুমতি দেয় না; বরং স্ত্রীদের প্রতি যেন কোনভাবেই অন্যায় ও অবহেলা না করা হয়, সেজন্য এরূপ স্বামীর ব্যাপারে ইসলাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: যার দু'টি স্ত্রী রয়েছে এতদসত্ত্বেও সে একজনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়লো তাহলে সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠবে যে, তার এক পার্শ্ব নিম্নগামী থাকবে।[১৬৭]

স্বামীর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ স্ত্রীর পরিণতি

যে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয়, স্বামীর অবদান অস্বীকার করে, সে স্বামীর অধিকার ক্ষুন্নকারী স্ত্রী। স্ত্রীর ভরণ-পোষণকারী ও কর্তা হিসেবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এ অধিকার রয়েছে যে, তার বিশেষ প্রয়োজনের ডাকে স্ত্রী সারা দিবে এবং তার কৃত অবদান ও ইহ্সানকে অস্বীকার করে তাকে আঘাত করবে না। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ শুধু স্বামীর অধিকারকেই ক্ষুন্ন করে না; বরং এ কাজ

---

[১৬৫] মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আবূ আবদুল্লাহ আল-কাযবীনী, *সুনান ইবনু মাজাহ*, (দারু ইবনুল জাওযী, কাহিরা-মিসর, প্রথম প্রকাশ ২০১১), কিতাবুল ফিতান, বাবু আল-উকূবাত, হাদীস নম্বর ৪০১৯, পৃ. ৪১৪।

[১৬৬] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ- নবী ﷺ-এর বাণী: যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়, হাদীস নম্বর ১০২, পৃ. ৩৯।

[১৬৭] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ফিল কাসমি বায়নান নিসা, হাদীস নম্বর ২১৩৩, পৃ. ৯১৩।

Dhaka University Institutional Repository

মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রীর পক্ষ থেকে এরূপ অসদাচরণ কখনো স্বামীকে রাগান্বিত করে অপরাধ প্রবণতার দিকেও ধাবিত করতে পারে। একে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে ঝগড়া-বিবাদ, বিবাহ বিচ্ছেদ, অন্য নারীর সাথে স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠা প্রভৃতি সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তাই ইসলাম স্ত্রীর এরূপ মন্দ আচরণ প্রকাশ নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি এর থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে তাকে এ কাজের ভয়াবহ পরিণতি জানিয়ে সতর্ক করেছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ ساخطا عَلَيْهَا حَتَّى يرضى عَنْهَا

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যখন স্বামী স্ত্রীকে (প্রয়োজনে) বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা অমান্য করে। স্বামী তখন অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়। তখন ফিরিশতাগণ ঐ স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করেন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে: ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা অমান্য করে। তাহলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ ঐ স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত থাকেন।[১৬৮]

আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

وَأُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: " يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ "

আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলো, অথচ আজকের মতো এতো ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমার জীবনে আমি আর কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কী কারণে? তিনি বললেন: তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে? তিনি বললেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহ্সান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারা জীবন সদাচরণ কর, তারপর সে তোমার থেকে (যদি) সামান্য ত্রুটি পায়, তবে বলে ফেলে, তোমার কাছ থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না।[১৬৯]

মানুষ হত্যা করার ভয়াবহ পরিণতি

বেঁচে থাকার অধিকার হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকার। মানুষের জীবন অবসান করার অধিকার কেবল আল্লাহ্র অধিকার। সুতরাং কোন মানুষের জন্য কাউকে হত্যা করা হারাম। যে ব্যক্তি মানুষের এ বেঁচে থাকার অধিকারটুকু ছিনিয়ে নেয়, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে এমন খুনির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً

[১৬৮] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুন নিকাহ, বাবু আশরাতুন নিসা, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৩২৪৬, পৃ. ৯৬৮।

[১৬৯] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, আবওয়াবুল কুসুফ, বাবু সলাতিল কুসুফি জামা'আতান, হাদীস নম্বর ১০৫২, পৃ. ১২৮-১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার প্রতিদান হল জাহান্নাম। তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন, তাকে অভিশাপ করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ আযাব প্রস্তুত রেখেছেন।[১৭০]

أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً

নিশ্চয় যে ব্যক্তি প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ ছাড়া কাউকে হত্যা করে কিংবা ফাসাদ সৃষ্টি করে, সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল।[১৭১]

عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

জারীর (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: তোমরা আমার অবর্তমানে পরস্পরকে হত্যা করে কাফির হয়ে ফিরো না।[১৭২]

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

বারাআ ইবনু আযিব (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার চেয়ে একজন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা আল্লাহ্র নিকট বড় অপরাধ।[১৭৩]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ "

আনাস বিন মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা, মানুষকে হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।[১৭৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না। যে সুগন্ধি চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।[১৭৫]

আত্মহত্যা করার পরিণতি

মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করা শুধু অন্য মানুষের জন্যই হারাম নয়; বরং কেউ নিজেকে নিজেই শেষ করে দিবে ইসলাম তাও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কারণ মানুষের এ জীবন তার কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি আমানত। এ আমানত বিনষ্ট করার অধিকার তাকে দেয়া হয়নি। যে আত্মহত্যা করবে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে ইসলাম এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

---

[১৭০] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নিসা, ৪/৯৩।

[১৭১] আল-কুরআন: সূরাহ আল-মায়িদা, ৫/৩২।

[১৭২] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইল্‌ম, বাবু আল-ইনসাতি লিলউলামা, হাদীস নম্বর ১২১, পৃ. ২৫।

[১৭৩] *সুনান ইবনু মাজাহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু তাগলীযু ফী কাতলি মুসলিম যুলমান, হাদীস নম্বর ২৬১৯, পৃ. ২৭২।

[১৭৪] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু কওলিল্লাহি তা'আলা: "ওয়া মান আহইয়া ..."-(সূরাহ আল-মায়িদা: ৩২), হাদীস নম্বর ৬৮৭১, পৃ. ৮১৯।

[১৭৫] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু ইসমি মান কাতালা যিম্মীয়ান বিগাইরি জুরমিন, হাদীস নম্বর ৬৯১৪, পৃ. ৮২৪।

Dhaka University Institutional Repository

وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً *وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً

তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অতি দয়ালু। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে আত্মহত্যা করবে আমি তাকে অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর এ কাজ আল্লাহ্র জন্য সহজ।[১৭৬]

জুনদুব (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন:

" كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللَّهُ: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ "

(তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যকার) এক ব্যক্তি আঘাতের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। আল্লাহ্ তার সম্পর্কে বলেন: আমার বান্দা আমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের জীবনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।[১৭৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে লাফিয়ে পড়ে সর্বক্ষণ আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং সেটাই হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান। যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে তার বিষ তার হাতে থাকবে, জাহান্নামে সে সর্বক্ষণ বিষ পান করে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং জাহান্নাম হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান। যে ব্যক্তি লৌহার অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে, তার হাতে সেই লৌহাস্ত্রই থাকবে এবং জাহান্নামে সর্বক্ষণ নিজের পেটে সে তা ঢুকাতে থাকবে।[১৭৮]

সন্তান হত্যা করার পরিণতি

ইসলামে মানুষ হত্যা মহাপাপ। আর যদি তা নিজের সন্তানকে হত্যা হয়, সেটা আরো মারাত্মক। কেননা, প্রতিটি সন্তানের এ অধিকার রয়েছে যে, পিতামাতা তাকে হত্যা করবে না, এ পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার অধিকারটুকু ছিনিয়ে নিবে না। চাই অভাব-অনটনের ভয়ে হোক, সম্পদে অংশীদার হবে এ ভয়ে হোক বা কন্যা সন্তান হিসেবে জন্ম নিয়েছে এ কারণে হোক- সর্বাবস্থায় সন্তান হত্যা ইসলামে নিষিদ্ধ। এমনকি পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে মায়ের গর্ভে থাকাবস্থায় হলেও। ইসলাম এটা জানাচ্ছে যে, সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্, তিনিই রিযিকদাতা এবং পুত্র ও কন্যা সন্তান সৃষ্টির ইচ্ছাও তাঁরই। কাজেই আল্লাহ্র বান্দা ও মানুষ হিসেবে প্রতিটি সন্তানের এ পৃথিবীতে আগমন ও বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করা চরম অন্যায়। তাই এ অধিকার রক্ষার্থে ইসলাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً

---

[১৭৬] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নিসা, ৪/২৯-৩০।

[১৭৭] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, অনুচ্ছেদ- আত্মহত্যাকারী সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে, হাদীস নম্বর ১৩৬৪, পৃ. ১৬৪।

[১৭৮] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তিব্ব, অনুচ্ছেদ- বিষ পান করা, বিষের সাহায্যে চিকিৎসা করা, ভয়ানক কিছু দ্বারা চিকিৎসা করা যাতে মারা যাবার আশঙ্কা আছে এবং হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা, হাদীস নম্বর ৫৭৭৮, পৃ. ৭০৭।

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা দারিদ্রতার বয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তাদেরকে রিযিক দেই এবং তোমাদেরও আমিই দিচ্ছি। তাদের হত্যা করা বড় পাপ।[১৭৯]

যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে হত্যা করে সন্তোষ প্রকাশ করে তার পরিণতি

ইসলাম মানুষকে বিনা অপরাধে ও বেআইনীভাবে হত্যার অনুমতি দেয় না। কেননা, হত্যা মানুষের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার ও স্বাভাবিক মৃত্যুবরণের অধিকারকে হরণ করে। আর এই হত্যা যদি কোন মু'মিন বান্দাকে করা হয়, সেটা আরো মারাত্মক অন্যায়। তাই ইসলাম হত্যাকাণ্ড থেকে সাবধান করেছে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি অবহিত করেছে। যাতে মানুষ এর পরিণতি জেনে এ কর্ম ত্যাগ করে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ε أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً .

উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ইচ্ছা করে হত্যা করবে এবং তাকে হত্যা করে খুশি হবে, তার কোন ফরয ও নফল 'ইবাদাত আল্লাহ্ কবূল করবেন না।[১৮০]

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া ও অসম্মান করার পরিণতি

পিতামাতা সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে প্রতিপালন করে থাকে। পিতামাতার এ ঋণ শোধ করার ক্ষমতা কোন সন্তানেরই নেই। সন্তানের প্রতি পিতামাতার একটি বড় অধিকার হলো, তারা পিতামাতার অবাধ্য হবে না। কেননা, সন্তান পিতামাতার অবাধ্য হলে পিতামাতার এই বৃহৎ অধিকার ক্ষুন্ন হয়। ভুলণ্ঠিত হয় তাদের ইজ্জত-সম্মান। তাই ইসলাম পিতামাতার অধিকার ও সম্মান বিনষ্ট করার অনুমতি সন্তানকে দেয়নি; বরং এ হীন কর্মের পরিণতি জানিয়ে ইসলাম এ ব্যাপারে সতর্কবার্তা দিয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ويسبُّ أمه فيسب أمه .

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ করা। বলা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন ব্যক্তি কীভাবে তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়? জবাবে তিনি ﷺ বললেন: কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দিলে সেও তার পিতাকে গালি দেয় এবং তার মাতাকে গালি দেয়।[১৮১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ، - أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ - "

---

[১৭৯] আল-কুরআন: সূরাহ ইসরা, ১৭/৩১।

[১৮০] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম, বাবু ফী তা'যীমি কাতলিল মু'মিনি, হাদীস নম্বর ৪২৭০, পৃ. ১৮২৫-১৮২৬।

[১৮১] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু বির ওয়াস সিলা, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৪৯১৬, পৃ. ১৩৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

আনাস বিন মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা, মানুষকে হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।[১৮২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ

আবদুল্লাহ্‌ বিন আমর (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: উপকার করে খোঁটাদানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য এবং মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৮৩]

জেনে-বুঝে নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেয়ার পরিণতি

সন্তানের প্রতি পিতার একটি বড় অধিকার হলো- সন্তান নিজের পিতাকেই পিতা হিসেবে পরিচয় দিবে। কোন সন্তান নিজ পিতার পরিবর্তে অন্যকে নিজের পিতা বলে পরিচয় দিলে এর মাধ্যমে শুধু আপন পিতাকে চরম আঘাতই করা হয় না; বরং পিতার অধিকারও ছিনিয়ে নেয়া হয়। ইসলাম পিতার এ অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার অনুমতি কখনো দেয়নি; বরং এ ধরনের হীন সন্তানের ব্যাপারে ইসলাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي بَكْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حرَام

সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে দাবি করে, অথচ সে জানে যে, সেই ব্যক্তি তার পিতা নয়, তাহলে তার উপর জান্নাত হারাম।[১৮৪]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صرف وَلَا عدل

আলী (রাযি.) হতে বর্ণিত। যে ব্যক্তি নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবি করে অথবা নিজ অভিভাবক ব্যতীত অন্যকে অভিভাবক বলে স্বীকার করে, তার প্রতি আল্লাহ্‌, সকল ফিরিশতা, এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবূল হবে না।[১৮৫]

পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি

মানুষ সামাজিক জীব। পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। মানুষের এ সম্পর্ক একের প্রতি অপরের এক ধরনের অধিকার বা মানবাধিকার। তাই সম্পর্ক ছিন্ন করে এ অধিকার ক্ষুন্ন করা বড় অপরাধ। সম্পর্ক ছিন্নকারী মানুষ হয় ক্ষতিগ্রস্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

---

[১৮২] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু কওলিল্লাহি তা'আলা- "ওয়া মান আহইয়া ..."-(সূরাহ আল-মায়িদা: ৩২), হাদীস নম্বর ৬৮৭১, পৃ. ৮১৯।

[১৮৩] ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, ইমাম সুয়ূতী ও আল্লামা সিন্দির শরাহ সহ, (দারুল হাদীস কাহিরা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯), ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল আশরিবা, যিকরুর রিওয়াইয়াতি ফিল মুদমিনীরাল খামরি, হাদীস নম্বর ৫৬৮৮, পৃ. ৭৩৪।

[১৮৪] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল লি'আন, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৩৩১৪, পৃ. ৯৯০।

[১৮৫] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল মানাসিক, বাবু হুরমুল মাদীনাতি হারাশাহা আল্লাহু. ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ২৭২৮, পৃ. ৮৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ্ অভিশাপ করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিহীন করেন।[১৮৬]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الله ".

আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: আত্মীয়তার বন্ধন আল্লাহ্র আরশের সাথে জুলন্ত অবস্থায় থেকে বলে, যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক রাখবে আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ্ তাকে ছিন্ন করবেন।[১৮৭]

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ .

যুবাইর ইবনু মুতঈম (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৮৮]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لصَاحبه الْعقُوبَة فِي الدُّنْيَا مَعَ مايدخر لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ .

আবূ বাকরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা অপেক্ষা কোন পাপই এতো জঘণ্য নয়, যে পাপীকে আল্লাহ্ খুব শিঘ্রই এই পৃথিবীতে তার শাস্তি দেন এবং আখিরাতেও তার জন্য তা জমা করে রাখেন।[১৮৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُفَتَّحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ فَيُغْفَرُ فِيهِمَا لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ المُهْتَجِرَيْنِ، يُقَالَ: رُدُّوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। যেসব অপরাধী আল্লাহ্র সাথে শির্ক করেনি তাদেরকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি সম্পর্কে (আল্লাহ্ বলেন): এদেরকে ফিরিয়ে দাও যতক্ষণ না এরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে।[১৯০]

কারো বংশ মর্যাদায় আঘাত হানার পরিণতি

বংশ মর্যাদায় আঘাত হানলে মানুষের মান-ইজ্জত সংরক্ষণের অধিকার ক্ষুন্ন হয়। আর যে সমাজে মানুষ ইজ্জত-সম্মান পায় না, তা মানবতার সমাজ নয়; বরং মানবাধিকার বিপন্ন সমাজ। তাই কেউ যেন কারো মান-সম্মান রক্ষার অধিকার হরণ করতে না পারে সেজন্য ইসলাম এ ব্যাপারে সতর্ক করেছে। হাদীসে এসেছে-

---

[১৮৬] আল-কুরআন: সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭/২২-২৩।

[১৮৭] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু আশশাফাকাতু ওয়ার রহমাতু, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৪৯২১, পৃ. ১৩৭৮।

[১৮৮] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু আশশাফাকাতু ওয়ার রহমাতু, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৪৯২২, পৃ. ১৩৭৮।

[১৮৯] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু বির ওয়াস সিলা, ফাসলুল সানী, হাদীস নম্বর ৪৯৩২, পৃ. ১৩৭৯।

[১৯০] *জামে' আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, আবওয়াবুল বির্‌রি ওয়াস সিলাতি, বাবু মা জাআ ফিল মুতাহাজিরায়নি, হাদীস নম্বর ২০২৩, পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ "

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র কুফরীর পর্যায়ের। একটি হলো কারো বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা এবং অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা।[১৯১]

কাউকে যেনার অপবাদ দেয়ার পরিণতি

মানুষের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করা মানুষের অন্যতম অধিকার। কেউ যদি কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এ অধিকার হরণ করে তবে তাকে এ জন্য ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখিন হতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা সতীসাধ্বী নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত। তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ আযাব।[১৯২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বিরত থাক। বলা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেগুলো কী? তিনি ﷺ বললেন: ১. শিরক করা; ২. যাদু করা. ৩. অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা; ৪. সুদ খাওয়া; ৫. ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো এবং ৭. নিরীহ সতীসাধ্বী ঈমানদার নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়।[১৯৩]

সুদ গ্রহণ ও প্রদানের ভয়াবহ পরিণতি

সুদের লেনদেন বিশেষ করে দরিদ্র ঋণগ্রহীতাকে আরো নিঃস্ব ও সম্বলহীন করে। সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে গৃহহীন, আশ্রয়হীন, সহায়-সম্পত্তি সব হারিয়ে অতি সাধারণ জীবন-যাপনের সুযোগ বা অধিকারটুকুও হারিয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। যারা বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটাতেও অক্ষম। সুতরাং যে লেনদেন মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাপনের অধিকার বাধাগ্রস্ত করে, তা মানবাধিকার সংরক্ষণে বাধা। ইসলাম উত্তম জীবন-জীবিকা নির্বাহের নিমিত্তে একে অপরকে সাহায্য ও ঋণদানে উৎসাহিত করে। কিন্তু যেখানে সহযোগিতার বেশে মানুষ আরো নিঃস্ব ও গৃহহীন হয়, শুধু লভ্যাংশের দাবি চাপিয়ে দিয়ে ঋণগ্রহীতা থেকে অন্যায়ভাবে সম্পদ শোষণ করে নেয়া হয়, তা ইসলাম সমর্থন করে না। কাজেই সুদী লেনদেনে নানাভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। সেজন্য ইসলাম এ লেনদেন নিষিদ্ধ করেছে। যারা এরূপ লেনদেনে জড়িত হয় তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে।

---

[১৯১] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইতলাকি ইসমিল কুফরি আলাত তা'নিন নাসাবি ওয়ান নিহাইয়াতি আলাল মাইয়িতি, হাদীস নম্বর ৬৭, পৃ. ৩৩।

[১৯২] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নূর, ২৪/২৩।

[১৯৩] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবুল কাবায়ির ওয়া আলামাতুন নিফাক, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৫২, পৃ. ২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে সূদের মাধ্যমে যা বকেয়া রয়েছে তা বর্জন কর।[১৯৪]

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوَكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ .

জাবির (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুদগ্রহীতা, সুদদাতা ও সুদের লেখক ও সাক্ষীর উপর অভিশাপ করেছেন।[১৯৫]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً .

আবদুল্লাহ্ বিন হানযালা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: কোন ব্যক্তি জেনে-শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সুদ গ্রহণ করলে ছত্রিশবার যেনা করার চেয়ে কঠিন হবে।[১৯৬]

ঘুষদাতা ও গ্রহীতার পরিণতি

কাউকে তার প্রাপ্য প্রদানে বিলম্ব ও বাধাগ্রস্ত করা অথবা কাউকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অন্যতম অপকর্ম হলো ঘুষ। হকদারের হক আদায়ে ঘুষ একটি বড় অন্তরায়। যে সমাজে ঘুষের প্রচলন রয়েছে, সেখানে মানবাধিকার অরক্ষিত। তাই ইসলামে ঘুষের আদান-প্রদান মহাপাপ বিবেচ্য। সরকারী বা বেসরকারী কর্মচারী অথবা কোন দায়িত্বশীলকে প্রভাবিত করে প্রকৃত হকদারকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ঐ সম্পদে অংশগ্রহণ করা ইসলামে হারাম। ঘুষের পরিণতি সম্পর্কে হাদীসে এসেছে-

عَن خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

খাওলা আল-আনসারী (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: নিশ্চয়ই কিছু লোক আল্লাহ্র সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।[১৯৭]

عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষদাতার উপর অভিশাপ করেছেন।[১৯৮]

ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারীর পরিণতি

ধন-সম্পদের সুরক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা হলে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ হিফাযতের অধিকার হরণ করা হয়, ইয়াতীমকে ঠকানো হয়। এ অধিকার সুরক্ষায়

---

[১৯৪] আল-কুরআন: সূরাহ আল–বাকারা, ২/২৭৮।

[১৯৫] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল বুয়ূ, বাবুর রিবা, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ২৮০৭, পৃ. ৮৫৫।

[১৯৬] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল বুয়ূ, বাবুর রিবা, ফাসলুস সালিস, হাদীস নম্বর ২৮২৫, পৃ. ৮৫৯।

[১৯৭] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ইমারাত, বাবু রিযকুল ওয়ারাত ও হাদায়াতিহিম, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৩৭৪৬, পৃ. ১১০৬।

[১৯৮] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ইমারাত, বাবু রিযকুল ওয়ারাত ও হাদায়াতিহিম, ফাসলুল সানী, হাদীস নম্বর ৩৭৫৩, পৃ. ১১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সজাগ। তাই যারা ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করে তাদের ব্যাপারে ইসলাম সর্তকবাণী উচ্চারণ করেছে। ইয়াতীমের এ অধিকার লঙ্ঘনের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً

নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে এবং অচিরেই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১৯৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

আবূ হরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বিরত থাক। বলা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেগুলো কি? তিনি ﷺ বললেন: ১. শির্ক করা; ২. যাদু করা. ৩. অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা; ৪. সুদ খাওয়া; ৫. ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ণ করা এবং ৭. নিরীহ সতীসাধ্বী ঈমানদার নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া।[২০০]

জনগণের খিয়ানতকারী ও অত্যাচারী শাসকের পরিণতি

যে শাসক তার অধীনস্থ জনসাধারণের সাথে খিয়ানত করে, জনগণের প্রাপ্য অধিকার আদায় করে না, ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালায়, এমন শাসক মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী। তাই জনসাধারনের অধিকার রক্ষার্থে ইসলাম এমন অপরাধী শাসকের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। যাতে তারা জনগণের সাথে খিয়ানত ও অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকে।

[১৯৯] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নিসা, ৪/১০।

[২০০] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবুল কাবায়ির ওয়া আলামাতুন নিফাক, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৫২, পৃ. ২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[২০১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ .

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: কেউ কারো প্রতি যদি সম্মানের ব্যাপারে বা অন্য কিছুর ব্যাপারে অত্যাচার করে থাকে তাহলে সে যেন আজই তার কাছ থেকে মুক্ত হয়ে যায় সেই দিনের পূর্বে যেদিন দীনার-দিরহাম কিছুই থাকবে না। তার কোন সৎ আমল থাকলে অত্যাচারের পরিমাণ হিসাবে সেই আমল থেকে নেয়া হবে। আর যদি সৎ আমল না থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর পাপসমূহ উঠিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।[২০২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: أَلا كُلُّكُمْ راعٍ وكُلُّكُمْ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রায.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[২০৩]

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يقولُ: مَا مِنْ والٍ بلي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: কোন ব্যক্তি মুসলিমদের দায়িত্ব গ্রহণের পর খিয়ানত করা অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন।[২০৪]

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يجد رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: যার প্রতি আল্লাহ্ কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন, অতঃপর সে সুষ্ঠুভাবে তা পালন করে না, সে জান্নাতের গন্ধ পাবে না।[২০৫]

عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ شَرَّ الرعاءِ الحُطَمَة .

'আয়িয ইবনু আমর (রায.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অধীনস্ত জনগণের প্রতি অত্যাচার করে।[২০৬]

---

[২০১] আল-কুরআন: সূরাহ আশ-শুরা, ৪২/৪২।

[২০২] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবুয যালিম, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৫১২৬, পৃ. ১৪১৭।

[২০৩] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ইমারাত, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৩৬৮৫, পৃ. ১০৯০।

[২০৪] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ইমারাত, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৩৬৮৬, পৃ. ১০৯০।

[২০৫] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ইমারাত, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৩৬৮৭, পৃ. ১০৯০।

[২০৬] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ইমারাত, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৩৬৮৮, পৃ. ১০৯০।

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ . وَفِي رِوَايَةٍ: " وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ".

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: তিন ধরনের লোক রয়েছে যাদের সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না। (তারা হলো) ১. বৃদ্ধ যেনাকার; ২. মিথ্যাবাদী শাসক; ৩. অহঙ্কারী দরিদ্র।[২০৭]

অহঙ্কার করার ভয়াবহ পরিণতি

অহঙ্কার মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট করে। অধঃপতনের একটি বড় কারণ হচ্ছে অহঙ্কার। অহঙ্কার যেমন মানুষকে সমাজে লাঞ্ছিত করে তেমনি পরকালেও করে বড় ক্ষতিগ্রস্ত। মানুষ অহঙ্কার বশে নানা ধরনের অপরাধমূলক ও ধ্বংসাত্মক কাজ করে থাকে। অহঙ্কারী মানুষ কাউকে যুলুম করতে, অপদস্ত করতে বা কোন ধরনের অপরাধ করতে দ্বিধাবোধ করে না। অহঙ্কারী অন্যের উপর বিশেষ করে দুর্বলের উপর কর্তৃত্ব খাটাতে পিছপা হয় না। সুতরাং অহংকার মানবাধিকার সুরক্ষার পথে বৃহৎ অন্তরায়। অহংকারী ব্যক্তির কাছে মানবাধিকার শংকামুক্ত নয়। তাই ইসলাম মানুষকে কোন ব্যাপারে অহঙ্কার করতে নিষেধ করেছে এবং অহঙ্কারীর ভয়াবহ পরিণতিও জানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

অহঙ্কার বশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে অহঙ্কার করে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[২০৮]

وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الجِبَالَ طُولاً

তুমি পৃথিবীতে অহঙ্কার করে চলো না। নিশ্চয়ই তুমি যমীনকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারবে না।[২০৯]

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ

আমি ফিরিশতাগণকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সাজদাহ্ করো তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সাজদাহ্ করেছিল। সে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার করল, ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।[২১০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ وَقد أعجبتْه نَفسه خسف بِهِ لأرض فَهُوَ يتجلجل فِيهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة .

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: এক ব্যক্তি দু'টি চাদর পরে অহঙ্কার করে চলতে ছিল এবং এটা তার কাছে পছন্দনীয় ছিল। তাকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিয়ামত পর্যন্ত সে মাটির ভেতরে ঢুকতে থাকবে।[২১১]

---

[২০৭] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবুল গাযাবি ওয়াল কিবারি, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৫১০৯, পৃ. ১৪১৪।

[২০৮] আল-কুরআন: সূরাহ লুকমান, ৩১/১৮।

[২০৯] আল-কুরআন: সূরাহ আল-ইসরা, ১৭/৩৭।

[২১০] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/৩৪।

[২১১] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবুল জুলুস ওয়ান নাওম ওয়াল মাশয়ি, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৪৭১১, পৃ. ১৩৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ . مُتَّفق عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ مُسلم: كل جواظ زنيم متكبر

হারিসাহ বিন ওহাব (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: আমি কি তোমাদেরকে জানাব না জাহান্নামের অধিবাসী কারা? জাহান্নামের অধিবাসী হলো প্রত্যেক রূঢ় স্বভাবের অহঙ্কারী ব্যক্তি।[২১২]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ كِبْرٍ .

আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[২১৩]

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার পরিণতি

সমাজে অন্যায়, অবিচার, লুটতরাজ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়ার একটি বড় মাধ্যম মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। একমাত্র মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে অনেক সময় অসহায় নিরীহ ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে পড়ে; বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগ করে। এতে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً

যারা মু'মিন তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।[২১৪]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

ইবনু মাসউদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ; কোন ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ দখল করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন।[২১৫]

মদপান ও জুয়ায় অংশগ্রহণ করার পরিণতি

মদ ও জুয়া ইসলামে কঠোরভাবে হারাম। এটি হারাম হওয়ার পিছনে সামাজিক ও মানবিক কারণ রয়েছে। জুয়া জয়ী-পরাজয়ীর মধ্যে হিংসা ও দ্বন্দ্বের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, উভয়কে নেশাগ্রস্ত করে এবং মানুষের বিপদ ডেকে আনে। বিশেষত নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির সুস্থ জ্ঞান থাকে না। যা নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্ম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথকে সুগম করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কর্ম। কাজেই তোমরা এসব থেকে দুরে থাক।[২১৬]

---

[২১২] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু গাযবি ওয়াল কিবারি, ফাসলুল আওয়াল, ৫১০৬, পৃ. ১৪১৩।

[২১৩] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু গাযবি ওয়াল কিবারি, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৫১০৮, পৃ. ১৪১৩।

[২১৪] আল-কুরআন: সূরাহ ফুরকান, ২৫/৭২।

[২১৫] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ইমারাত, বাবুল আকযিয়াতি ওয়াশ শাহাদাতি, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৩৭৫৯, পৃ. ১১১০।

[২১৬] আল-কুরআন: সূরাহ আল-মায়িদা, ৫/৯০।

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ خَمْرٍ

আবূ দারদা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: সর্বদা নেশাদ্রব্য ব্যবহারকারী জান্নাতে যাবে না।[২১৭]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ، فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ، فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، كَانَ حَقا عَلَى اللَّهِ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘আমার (রাযি.)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি মদপান করে এবং নেশাগ্রস্ত হয় তার চল্লিশ দিনের সলাত কবূল হয় না এবং এমতাবস্থায় সে মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যদি সে তাওবাহ্ করে তবে আল্লাহ্ তার তাওবাহ্ কবূল করেন। যদি সে পুনরায় মদপান করে এবং নেশাগ্রস্ত হয় তবে আল্লাহ্ তার চল্লিশ দিনের সলাত কবূল করেন না এবং এমতাবস্থায় সে মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যদি সে তাওবাহ্ করে তবে আল্লাহ্ তার তাওবাহ্ কবূল করেন। যদি সে পুনরায় মদপান করে এবং নেশাগ্রস্ত হয় তবে আল্লাহ্ তার চল্লিশ দিন সলাত কবূল করেন না এবং এমতাবস্থায় সে মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যদি সে তাওবাহ্ করে আল্লাহ্ তার তাওবাহ্ কবূল করেন। সে যদি চতুর্থবার মদপানে লিপ্ত হয় তবে আল্লাহ্র জন্য আবশ্যক হয়ে যায় যে, তিনি কিয়ামতের দিন তাকে ‘রাদাগাতিল খাবাল’ থেকে পান করাবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাদাগাতিল খাবাল কি? তিনি বলেন, জাহান্নামীদের পুঁজের নহর।[২১৮]

আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا . আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি মদ্যপান করবে, তার চল্লিশ দিনের সলাত কবূল হবে না।[২১৯]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ كَافِرًا وَإِن انْتَشَى لَمْ يَقْبَل اللهُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا

ইবনু ‘উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি মদপান করলো কিন্তু মাতাল হলো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার পেটের মধ্যে বা শিরাতে ঐ মদের কিছু পরিমাণও বিদ্যমান থাকবে তার সলাত কবূল

---

[২১৭] *সুনান ইবনু মাজাহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবা, বাবু মুদমিনুল খামরি, হাদীস নম্বর ৩৩৭৬, পৃ. ৩৫০-৩৫১।

[২১৮] *সুনান ইবনু মাজাহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবা, অনুচ্ছেদ- যে ব্যক্তি মদ পান করে তার সলাত কবূল হয় না, হাদীস নম্বর ৩৩৭৭, পৃ. ৩৫১।

[২১৯] ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল আশরিবা, যিকরু রিওয়াইয়াতিল মুসবাতাতি আন সলাতি শারিবিল খামরি, হাদীস নম্বর ৫৬৮০, পৃ. ৭৩০।

Dhaka University Institutional Repository

হবে না। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে কাফির অবস্থায় মরলো। আর যদি সে মাতাল হয় তবে তার চল্লিশ দিনের সলাত কবূল হবে না। এ সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হলে সে কাফির হয়ে মরলো।[২২০]

চুরি ও ডাকাতি করার পরিণতি

ধন-সম্পদ সুরক্ষার অধিকার হলো মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এ অধিকার যেসব পন্থায় লঙ্ঘিত হয় চুরি ও ডাকাতি তার অন্যতম। যেখানে সম্পদ রক্ষার অধিকার ক্ষুন্ন সেখানে মানুষের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার অধিকারও বিপন্ন। তাই ইসলাম ধন-সম্পদ সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন রোধে চুরি ও ডাকাতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে এবং এ অপরাধে যেন লিপ্ত না হয়, সে ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يشرب الْخمر حِين يشْربهَا وَهُوَ مُؤمن وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا ينتهب نهبة ذَات شرف يرفع النَّاس إِلَيْهِ أَبْصَارهم فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِين يغل وَهُوَ مُؤمن فإياكم إِيَّاكُمْ

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে মু'মিন থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে মু'মিন থাকে না। মদপানকারী যখন মদপান করে তখন সে মু'মিন থাকে না। ছিনতাইকারী যখন ছিনতাই করে মানুষ তার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তখন সে মু'মিন থাকে না। আত্মসাৎকারী যখন আত্মসাৎ করে তখন সে মু'মিন থাকে না। তোমরা এসব অপকর্ম থেকে সাবধান থাক, তোমরা এসব অপকর্ম থেকে সাবধান থাক।[২২১]

অবৈধ উপার্জন ও হারাম ভক্ষণের পরিণতি

অন্যের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়া, কোন অপরাধের আশ্রয় নিয়ে সম্পদ আহরণ করা এ সবই অবৈধ উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ এ ধরনের হারাম সম্পদ উপার্জন করতে গিয়ে অপরকে ঠকানো, যখম করা, হত্যা করা প্রভৃতি অপরাধের আশ্রয় নিয়ে থাকে। তাই ইসলামে এ ধরনের উপার্জন ও তা খাওয়া হারাম। এর মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, বিপন্ন হয় মানবাধিকার। তাই এরূপ ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بالحرَامِ .

আবূ বকর (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: হারাম ভক্ষণ করা শরীর জান্নাতে যাবে না।[২২২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ

---

[২২০] ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল আশরিবা, যিকরুল আসামিল মুতাওয়াল্লিদাতি আন শুরবিল খামরি মিন তারকিস সলাতি, হাদীস নম্বর ৫৬৮৪, পৃ. ৭৩২।

[২২১] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবুল কাবায়ির ওয়া আলামাতুন নিফাক, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৫৩, পৃ. ২৩।

[২২২] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল বুয়ূ, বাবুল কাসবি ওয়া তালাবিল হালালি, ফাসলুস সালিস, হাদীস নম্বর ২৭৮৭, পৃ. ৮৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ .

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি শুধুমাত্র পবিত্রকেই গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে ঐ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যে বিষয়ে রাসূলদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ বলেন: "হে রাসূলগণ! তোমরা (পাক-পবিত্র) হালাল খাদ্য খাও এবং সৎকার্য কর।" আল্লাহ্ আরো বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের যে হালাল রিয্ক দান করেছি তা থেকে খাও। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করেছে (ভ্রমণকারী তথা মুসাফিরের দু'আ সাধারণত বেশি কবূল হয়) তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধূলাবালু। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উভয় হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে কাতর স্বরে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে প্রার্থনা করছে অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারাম দ্বারাই সে উদরপূর্তি করেছে তাহলে কিভাবে এ ব্যক্তির দু'আ কবূল হতে পারে?[২২৩]

মিথ্যা বলা ও খিয়ানত করার পরিণতি

একজন মানুষের অপর মানুষের প্রতি এ অধিকার রয়েছে যে, সে তাকে মিথ্যা বলবে না এবং তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে সেটি সে খিয়ানত করবে না। আমানত খিয়ানতের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ ও ইজ্জাত রক্ষার অধিকার ক্ষুন্ন হয়, পারস্পরিক বিশ্বাস বিনষ্ট হয়। আর মিথ্যা মানবাধিকার লঙ্ঘনে যথা- কোন নিরপরাধ মানুষকে বিপদে ফেলা, অপমান অপদস্ত করা, মারামারি, হানাহানি প্রভৃতি অপরাধ সংঘটনে সরাসরি ভূমিকা রাখে। মিথ্যা ও আমানতের খিয়ানত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম দু'টি নিয়ামক বিধায় এরূপ কর্তার পরিণতি সম্পর্কে ইসলাম সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ।[২২৪]

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[২২৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের খিয়ানত করো না আর তোমরা জেনে-শুনে নিজেদের আমানতে খিয়ানত করো না।[২২৬]

---

[২২৩] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, বাবু কবুলিস সদাকাতি মিনাল কাসবিত তায়্যিবি ওয়া তারবিয়াতিহা, হাদীস নম্বর ১০১৫, পৃ. ২৭০।

[২২৪] আল-কুরআন: সূরাহ আলে ইমরান, ৩/৬১।

[২২৫] আল-কুরআন: সূরাহ মু'মিন, ৪০/২৮।

[২২৬] আল-কুরআন: সূরাহ আল-আনফাল, ৮/২৭।

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আম্র (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: চারটি স্বভাব যার মধ্যে রয়েছে সে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিহার না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, তখন সে খিয়ানত করে; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে; এবং ৪. ঝগড়ার সময় গালাগালি করে।[২২৭]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا .

আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: তোমরা মিথ্যা বলা থেকে সাবধান থাক। মিথ্যা পাপাচারের দিকে পথ দেখায় আর পাপাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাকে আল্লাহ্র খাতায় মিথ্যুক বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।[২২৮]

কাউকে খোটা দেয়ার পরিণতি

কারোর উপকার করে খোঁটা দেয়া ইসলামে নিষেধ। কেননা, এ কাজটি মানুষকে কষ্ট দেয়, মানহানি করে। তাছাড়া যিনি খোঁটা দিচ্ছেন এর দ্বারা তার সাওয়াব ও সম্মান বিনষ্ট হয়। ইসলাম মানুষকে যেকোন ভাবে কষ্ট দেয়ার বিপক্ষে। আর কেউ নিজের সম্মান ও সাওয়াব বিনষ্ট করুন সেটাও ইসলাম চায় না। তাই এরূপ আচরণকারীর পরিণতির কথা উল্লেখ করে ইসলাম এর থেকে মানুষকে সাবধান করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাতকে বরবাদ করো না ঐ ব্যক্তির মত যে নিজের সম্পদ লোকদের দেখানোর জন্য দান করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না।[২২৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ

আবদুল্লাহ্ বিন 'আমর (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: উপকার করে খোঁটাদানকারী, পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচরণকারী এবং মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[২৩০]

---

[২২৭] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: মুনাফিকের চিহ্ন, হাদীস নম্বর ৩৪, পৃ. ১৩।

[২২৮] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু হিফযুল লিসান, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৪৮২৪, পৃ. ১৩৫৭-১৩৫৮।

[২২৯] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/২৬৪।

[২৩০] ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান* প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল আশরিবা, যিকরুর রিওয়াইয়াতি ফিল মুদমিনীরাল খামরি, হাদীস নম্বর ৫৬৮৮, পৃ. ৭৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

কারো গোপন দোষ তালাশ করা ও গোপন কথা শোনার পরিণতি

মানুষের একান্ত কিছু বিষয় থাকে। যা সে অন্যকে জানাতে বা শোনাতে চায় না। এরূপ না চাওয়াটাও মানুষের একটি অধিকার। নিজের একান্ত বিষয় সংরক্ষণ করার অধিকার প্রতিটি মানুষেরই আছে। কারো গোপন দোষ তালাশ করা বা গোপন কথা শোনা তার এ অধিকারকে ক্ষুন্ন করার শামিল। তাই ইসলামে গোপন দোষ তালাশ করা বা গোপন কথা শোনা নিষেধ। যদিও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে কোন অপরাধীকে ধরার জন্য এর অনুমতি আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তা অনুমোদিত নয়। হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ

ইবনু আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ে গোপন কথা শ্রবণ করে, অথচ তারা তা অপছন্দ করে। কিয়ামতের দিন তার কানে গরম সিসা ঢেলে দেয়া হবে।[২৩১]

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

আবূ সিরমাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি (কোন মুসলিমের বা কারো) ক্ষতি করে আল্লাহ্ তার ক্ষতি করেন আর যে ব্যক্তি কারোর উপর কঠোরতা করে আল্লাহ্ তার উপর কঠোরতা করেন।[২৩২]

পরনিন্দাকারী ও চুগলখোরের পরিণতি

পরনিন্দা ও চুগলখোরী খুবই ঘৃণিত আচরণ। সাধারণত কারো মানহানি বা ইজ্জত-সম্মান বিনষ্ট করতে পরনিন্দার আশ্রয় নেয়া হয়। আর চুগলখোরীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সম্পর্কের দূরত্ব ও বিদ্বেষ। এ দুটো স্বভাবই সমাজকে কলুষিত করে এবং এক পর্যায়ে ঝগড়া-বিবাদ ও হানাহানির জন্ম দেয়। কাজেই পরনিন্দা ও চুগলখোরী দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথ সুগম হয়। তাই ইসলাম এরূপ কর্তার প্রতি হুশিয়ার উচ্চারণ করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

সামনে-পিছনে নিন্দাকারীর ধ্বংস নিশ্চিত।[২৩৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, কতক ধারণা পাপ। আর কারো গোপন দোষ অনুসন্ধান করো না এবং কারো পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা তো একে ঘৃণাই করো।[২৩৪]

---

[২৩১] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তা'বীর, বাবু মান কাযাবা ফী হুলুমিহি, হাদীস নম্বর ৭০৪২, পৃ. ৮৪১।

[২৩২] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আকযিয়া, বাবু মিনাল কাযায়ি, হাদীস নম্বর ৩৬৩৫, পৃ. ১৫৭৩।

[২৩৩] আল-কুরআন: সূরাহ হুমাযাহ, ১০৪/১।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بوجهٍ وَهَؤُلَاءِ بوجهٍ .

তুমি কিয়ামতের দিন দু'মুখী লোকদেরকে সবচেয়ে খারাপ হিসেবে পাবে। যারা এক জায়গায় যা বলে অন্যস্থানে তার উল্টা বলে।[২৩৫]

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

হুযাইফাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: পরনিন্দাকারী জান্নাতে যাবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: চুগলকোর জান্নাতে যাবে না।[২৩৬]

হিংসুকের পরিণতি

বহু অপরাধ সংঘটনের পেছনে হিংসা অত্যন্ত জোড়ালো ভূমিকা রাখে। হিংসা অপরের ক্ষতিসাধনে উদ্বুদ্ধ করে ব্যক্তি জীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। যে সমাজ হিংসা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, সেখানে মানবাধিকার সুরক্ষা অনিশ্চিত। তাই এ হিংসা ইসলামে নিষিদ্ধ। এরূপ হিংসুকের পরিণতিও ভয়াবহ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

আপনি বলুন, হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই, যখন সে হিংসা করে।[২৩৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُفْتَحُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رجلا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هذَيْن حَتَّى يصطلحا ".

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের সমস্ত দরজা খুরে দেয়া হয় এবং মুশরিক ছাড়া সকলকে ক্ষমা করা হয়। তবে এমন ব্যক্তি নয় যে তার ভাইয়ের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ রাখে। ফিরিশতাদের (তিনবার) বলা হয়, সংশোধন হওয়া পর্যন্ত তাদের অবকাশ দাও।[২৩৮]

অভিশাপকারীর পরিণতি

মানুষ হিসেবে একে অপরের উপর এ অধিকার রাখে যে, তারা পরস্পরের হিতাকাঙ্খী হবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না, ক্ষতি চাই না। অভিশম্পাৎ এ অধিকার সুরক্ষায় একটি অন্তরায়। কেননা, সাধারণত অভিশাপ দেয়া হয় কারো ধ্বংস কামনার্থেই। মানুষ কখনো প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়েও অপরের অকল্যাণ ও ধ্বংস কামনা করে অভিশাপ দিয়ে থাকে। তাই ইসলাম (বিনা অপরাধে) কাউকে অভিশম্পাৎ করতে

---

[২৩৪] আল-কুরআন: সূরাহ আল-হুজরাত, ৪৯/১২।

[২৩৫] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু হিফযুল লিসান, ফাসলুল আওয়াল হাদীস নম্বর ৪৮২২, পৃ. ১৩৫৭।

[২৩৬] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু হিফযুল লিসান, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৪৮২৩, পৃ. ১৩৫৭।

[২৩৭] আল-কুরআন: সূরাহ ফালাক, ১১৩/৫।

[২৩৮] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু মা ইউনহা, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৫০২৯, পৃ. ১৩৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

নিষেধ করেছে এবং যারা কাউকে অহেতুক অভিশাপ দেয় তাদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يكونَ لعَّاناً .

আবূ হুরাইরা ((রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: সত্যবাদী অভিশাপকারী হতে পারে না।[২৩৯]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاء يَوْم الْقِيَامَة .

আবূ দারদা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই অভিশাপকারী কখনো কিয়ামতের ময়দানে সাক্ষীদাতা এবং সুপারিশকারী হতে পারবে না।[২৪০]

সাবিত ইবনু যাহহাক্ব (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

মু'মিনের প্রতি অভিশাপ করা তাকে হত্যা করার মত অপরাধ এবং কোন মু'মিনকে কাফির বলাও তাকে হত্যা করার মত পাপ।[২৪১]

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পরিণতি

একজন মানুষ অপর মানুষের উপর এ অধিকার রাখে যে, তারা পরস্পরে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করে চলবে। কেননা, কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করাটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে, তা ভঙ্গ করলে ব্যক্তি জীবনে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বত্রই সৃষ্টি হয় অবিশ্বাস, বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি। সেখানে মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলাম কৃত অঙ্গীকার পূরণে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং যারা অঙ্গীকার পূর্ণ করে না তাদের পরিণতি অবহিত করেছে। হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

ইবনু 'উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা দাঁড় করে দেয়া হবে এবং বলা হবে এই হচ্ছে অমুকের ছেলে অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার পরিচয়।[২৪২]

প্রতিবেশী বা অন্য কাউকে গালি দেয়া ও কষ্ট দেয়ার পরিণতি

কাউকে গালি দিলে এর মাধ্যমে যাকে গালি দেয়া হচ্ছে তার মান-ইজ্জত নষ্ট হয়, হেয় প্রতিপন্ন হয়, আত্মসম্মান হারায়। অথচ মানুষের পরস্পরের প্রতি এটাও একটি অধিকার যে, সে তাকে গালি দিবে না, কষ্ট দিবে না। আর সে যদি তার প্রতিবেশী হয়, তাহলে তার অধিকার আরো অনেক বেশি। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া দূরের কথা; বরং তাকে দুঃখ-কষ্টে পড়ে থাকতেও দিবে না। তাই ইসলাম মানুষের ইজ্জত-

---

[২৩৯] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু হিফযুল লিসান, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৪৮১৯, পৃ. ১৩৫৭।

[২৪০] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু হিফযুল লিসান, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৪৮২০, পৃ. ১৩৫৭।

[২৪১] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাবু মা ইউনহা মিনাস সিবাবি ওয়াল লা'নি, হাদীস নম্বর ৬০৪৭, পৃ. ৭৩২।

[২৪২] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ইমারাত, বাবু মা আলা ওয়ালাতি মিনাত তাইসীর, ফসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৩৭২৫, পৃ. ১০৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মানের অধিকারকে লঙ্ঘনের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত রাখতে এরূপ কর্তার প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً

যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও পাপের বোঝা বহণ করে।[২৪৩]

আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছেন:

أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ - أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ - اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

হে 'আয়িশাহ! আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যার অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিহার করে।[২৪৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ ... بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সুতরাং সে তার উপর যুলুম করতে পারে না, তার অসহযোগিতা করতে পারে না এবং তাকে নীচও ভাবতে পারে না। একজন ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাইকে নীচ বলে মনে করবে। একজন মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের রক্ত, সম্পদ, ইজ্জত হারাম।[২৪৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ . قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ্র কসম! সে মু'মিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মু'মিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অন্যায় থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।[২৪৬]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .

আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: সেই ব্যক্তি কখনো জান্নাতে যাবে না, যার অন্যায়ের কারণে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।[২৪৭]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِع إِلَى جنبه .

---

[২৪৩] আল-কুরআন: সূরাহ আল-আহযাব, ৩৩/৫৮।

[২৪৪] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাবুল মিদারাতি মাআন নাসি, হাদীস নম্বর ৬১৩১, পৃ. ৭৪০।

[২৪৫] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, বাবু তাহরীমি যুলমিল মুসলিমি, হাদীস নম্বর ২৫৬৪, পৃ. ৭৩৬।

[২৪৬] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু শাফাকাতি ওয়ার রহমাতি, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৪৯৬২, পৃ. ১৩৮৬।

[২৪৭] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু শাফাকাতি ওয়ার রহমাতি, ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নম্বর ৪৯৬৩, পৃ. ১৩৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনু আব্বাস (রাযি.)ম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: সে ব্যক্তি মু'মিন নয় যে তৃপ্তি সহকারে খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।[২৪৮]

কাউকে ধোঁকা দেয়া ও ষড়যন্ত্র করার পরিণতি

মানুষ হিসেবে একে অন্যের প্রতি এটাও একটি অধিকার যে, সে তাকে ধোঁকা দিবে না, প্রতারিত করবে না এবং তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য কোন ষড়যন্ত্র করবে না। তাই পরস্পরের প্রতি এ অধিকার হরণকারীর ব্যাপারে ইসলাম কঠোরবাণী উচ্চারণ করেছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

যারা অন্যায় কাজে চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব।[২৪৯]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ

আনাস বিন মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র জাহান্নামে যাওয়ার বিশেষ কারণ।[২৫০]

মুসলিমের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারীর পরিণতি

নিরাপদ জীবন-যাপন মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। যে সমাজে নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও অনিশ্চিত, সেখানে মানবাধিকার সুরক্ষিত নয়। তাই মানুষের জান-মাল প্রভৃতির নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ইসলাম নিরাপত্তা বিঘ্ন সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ করেছে। কেউ নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করলে তার পরিণতি কী হবে সেটাও জানিয়ে দিয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ.

আলী (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিমদের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব এক পর্যায়ের। তবে যে কেউ কোন লোককে নিরাপত্তা দিতে পারবে (এবং তা সকলের দেয়া নিরাপত্তায় গণ্য হবে)। সুতরাং কেউ কোন সাধারণ মুসলিমের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটালে তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ এবং ফিরিশতাকূল ও মানবকূলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবূল করা হবে না।[২৫১]

কোন বিষয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করার পরিণতি

ঝগড়ার সময় মানুষ কমপক্ষে অন্যের ইজ্জত-সম্মান নষ্টের চেষ্টা করে থাকে। ঝগড়া-বিবাদের দ্বারা মানুষ এক পর্যায়ে মারামারি ও হানাহানির দিকেও ধাবিত হয়। কাজেই ঝগড়া-বিবাদ অপরাধ ও মানহানি

---

[২৪৮] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু শাফাকাতি ওয়ার রহমাতি, ফাসলুস সালিস, হাদীস নম্বর ৪৯৯১, পৃ. ১৩৯১।

[২৪৯] আল-কুরআন: সূরাহ ফাত্বির, ৩৫/১০।

[২৫০] ইমাম হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলা সহীহাইন*, (দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ ২০০১), ৫ম খণ্ড, কিতাবুল আহওয়াল, হাদীস নম্বর ৮৯৭৫, পৃ. ৪৯৫।

[২৫১] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাযায়িলে মাদীনাহ, বাবু হারামিল মাদীনাতি, হাদীস নম্বর ১৮৭০, পৃ. ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

সংঘটনের উপকরণ। সেজন্য ইসলাম অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ নিষেধ করেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনে ধাবিতকারী এ কর্ম পরিহার না করার পরিণতি বলে দিয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ

আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদকারীরা।[২৫২]

'আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ

যে ব্যক্তি জেনে শুনে কারোর সাথে বাতিল কোন জিনিস নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদ করলো আল্লাহ্ সত্যিই তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।[২৫৩]

কারো যমীনের সীমানা পরিবর্তন করার পরিণতি

যমীনের সীমানা পরিবর্তন এমন একটি অপরাধ যদ্বারা মানুষের সম্পদ সংরক্ষণের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়। তাই মানুষের সম্পদ রক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে ইসলাম উক্ত কর্ম সম্পাদনকারীর ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। হাদীসে এসেছে-

আলী (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির উপর অভিশাপ করেন যে অন্যের যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে।[২৫৪]

'আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ

যে ব্যক্তি কারো যমীনের কিয়দংশ অবৈধভাবে হরণ করলো তাকে কিয়ামতের দিন সাত যমীন পর্যন্ত ধ্বসীয়ে দেয়া হবে।[২৫৫]

কারো প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা করার পরিণতি

কারো দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করাটা এমন একটি অপরাধ যা মানুষের জীবন সুরক্ষার অধিকার হরণ করে, জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। অন্যের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা করলে এতে ইশারাকৃত ব্যক্তির আহত বা নিহত হওয়ার আশংকা থাকে। যেমন, কেউ কারো প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র বা পিস্তল দ্বারা ইশারা করল, এতে অসতর্কভাবে পিস্তলের ট্রিগারে আংগুলের চাপ লেগে ইশারাকৃত ব্যক্তিটি গুলিবিদ্ধ হতে পারে। কাজেই কোনভাবেই যেন মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয়, মানুষের জীবন হুমকির মুখে পতিত না হয়, সেদিকে ইসলাম অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রেখে। ইসলাম কারো প্রতি অস্ত্র দিয়ে ইশারা করা নিষিদ্ধ করেছে এবং এরূপ কর্তার ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে। হাদীসে এসেছে-

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

---

[২৫২] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আহকাম, বাবুল আলাদ্দিল খাসামি ওয়া হুয়া দায়িমু ফিল খুসুমাতি, হাদীস নম্বর ৭১৮৮, পৃ. ৮৫৬-৮৫৭।

[২৫৩] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আকযিয়া, বাবু ফীমান য়ূইনু আলা খুসুমাতিন মিন গাইরি আই ইয়া'লামা আমরাহা, হাদীস নম্বর ৩৫৯৭, পৃ. ১৫৫৭।

[২৫৪] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আযাহি, বাবু তাহরীমি যাবহি লিগাইরিল্লাহি, হাদীস নম্বর ১৯৭৮, পৃ. ৫৮১-৫৮২।

[২৫৫] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবু মাযালিম, বাবু ইসমি মান যলামা শাইয়ান মিনাল আরদি, হাদীস নম্বর ২৪৫৪, পৃ. ২৯১।

Dhaka University Institutional Repository

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

কেউ তার ভাইয়ের দিকে লোহা জাতীয় কোন অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করলে ফিরিশতাগণ তাকে অভিশাপ করতে থাকেন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। যদিও উক্ত ব্যক্তি তার সহোদর বাই হোক না কেন।[২৫৬]

عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন তার অপর ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত না করে। কারণ, তোমাদের কারোরই জানা নেই যে, হয়ত বা শয়তান তার হাত টেনে অন্যের গায়ে লাগিয়ে দিবে। তখন সে জাহান্নামের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে।[২৫৭]

মানুষকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেয়ার পরিণতি

বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দেয়াটা মানুষের ন্যায় বিচার লাভের অধিকারকে ক্ষুন্ন করে এবং বাধাগ্রস্ত করে আইনের যথাযথ প্রয়োগকে। যেখানে মানুষ বিনা অপরাধে শাস্তি পায়, সেখানে মানবাধিকার ও আইনের শাসন ভুলণ্ঠিত। তাই ইসলাম কাউকে অহেতুক শাস্তি দিতে নিষেধ করে এবং যারা কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দিয়ে তার সুবিচার লাভের অধিকার হরণ করে তাদের ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: দুই ধরনের মানুষ এমন রয়েছে যারা জাহান্নামী। তবে আমি তাদেরকে এখনো দেখিনি। তাদের মধ্যে এক জাতীয় মানুষ এমন যে, তাদের হাতে থাকবে লাঠি যা দেখতে গাভীর লেজের ন্যায়। এগুলো দিয়ে তারা অযথা মানুষকে প্রহার করবে।[২৫৮]

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ يُوشِكُ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ

তোমাদের কেউ দীর্ঘ হায়াত পেলে অচিরেই এমন সম্প্রদায় দেখতে পাবে যাদের সাথে থাকবে লাঠি যা দেখতে গাভীর লেজের ন্যায়। তারা সকালে বের হবে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি নিয়ে এবং বিকেলে ফিরবে আল্লাহ্র ক্রোধ নিয়ে।[২৫৯]

কোন মজুরকে কাজে খাটিয়ে তার মজুরি না দেয়ার পরিণতি

---

[২৫৬] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুর বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, অনুচ্ছেদ- মুসলিমের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা নিষেধ, হাদীস নম্বর ২৬১৬, পৃ. ৭৪৮।

[২৫৭] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান, বাবু কওলিন নবী ﷺ মান হামালা আলাইনাস সিলাহা ফালাইসা মিন্না, হাদীস নম্বর ৭০৭২, পৃ. ৮৪৪।

[২৫৮] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জান্নাতি ওয়া সিফাতি নাঈমিহা ও আহলিহা, বাবুন নারু ইয়াদখুলুহাল জাব্বারুনা, হাদীস নম্বর ২১২৮, পৃ. ৬২৫।

[২৫৯] *মুস্তাদরাক আলা সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম, হাদীস নম্বর ৮৫১৫, পৃ. ৩৫০।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিককে তার প্রাপ্য মজুরি না দিলে শ্রমিক তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে শ্রমিক তার অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা হারায়, লঙ্ঘিত হয় তার সম্পদ রক্ষার মৌলিক অধিকার। এটা মূলত শ্রমিকের প্রতি যুলুম ও লুণ্ঠন। তাই ইসলাম শ্রমিকের অর্থনৈতিক অধিকার হরণ না করার নির্দেশ দেয় এবং তার প্রতি কোন ধরনের অন্যায় না করার বিধান জানায়। যারা শ্রমিকের এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও ইসলাম সতর্কবার্তা জানায়। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " قَالَ اللهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ "

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেবো। তাদের একজন হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার নামে কসম করে কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করেছে। দ্বিতীয়জন হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন পুরুষকে বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ অর্থ খেয়েছে। আর তৃতীয়জন হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন পুরুষকে মজুর হিসেবে খাটিয়ে তার মজুরি দেয়নি।[২৬০]

কোন মুসলিমকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ও কাউকে খারাপ নামে ডাকার পরিণিত

কাউকে মন্দ নামে ডাকলে বা কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, হেয় প্রতিপন্ন বা অপমান করার উদ্দেশ্যে উপহাস করলে এর দ্বারা সেই ব্যক্তির মানহানি হয়, ইজ্জত-সম্মান সুরক্ষার অধিকার ক্ষুন্ন হয়। এরূপ আচরণ মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বে আঘাত হানে এবং কখনো তা ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি ইত্যাদি অপরাধের দিকেও ধাবিত করে। তাই ইসলাম এহেন আচরণ নিষেধ করার পাশাপাশি এরূপ কর্তার পরিণতির ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

হে মু'মিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ ঈমান আনলে তাদের মন্দ নামে ডাকা পাপ। যারা এহেন কাজ থেকে তাওবা করে না তারাই যালিম।[২৬১]

তৃতীয়জনকে দূরে রেখে দু'জন পরস্পরে চুপিসারে কথা বলা অপছন্দনীয়

তিনজন ব্যক্তি একত্রে থাকলে প্রত্যেকেই যা কিছু বলার সবার সামনেই বলবে- এটা একে অন্যের প্রতি পারস্পরির অধিকার। যদি কোন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে মিলে চুপিসারে কথা বলা হয়, তাহলে তৃতীয়জনের এ অধিকার ক্ষুন্ন হয়। তাছাড়া এরূপ আচরণ তৃতীয়জনকে আঘাত করে, সে অপমান

[২৬০] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ', বাবু ইসমি মান বা'আ হুররান, হাদীস নম্বর ২২২৭, পৃ. ২৬২।

[২৬১] আল-কুরআন: সূরাহ আল-হুজরাত, ৪৯/১১।

Dhaka University Institutional Repository

বোধ করে, সন্দেহ জাগায়, তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে মনের ভেতর এরূপ চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়। যা পরবর্তীতে সম্পর্ক বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এমনকি কখনো তা ঝগড়া-বিবাদসহ নানা অপরাধ সংঘটনের কারণ হয়। তাই ইসলাম এরূপ আচরণ থেকে নিষেধ ও সাবধান করেছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ

আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যখন তোমরা শুধুমাত্র তিনজন থাকবে তখন তৃতীয়জনকে দূরে রেখে বাকী দু'জন পরস্পর চুপিসারে কথা বলবে না। কারণ, এ রকম আচরণ তৃতীয়জনকে সত্যিই চিন্তাগ্রস্ত করে।[২৬২]

মানুষের চলাচলের পথে, গাছের ছায়ায় বা নদীর ঘাটে মলমুত্র ত্যাগ করার পরিণতি

রাস্তা সকল মানুষের। তা পরিচ্ছন্ন রাখাও সকলের দায়িত্ব। এতে যদি মলমূত্র ত্যাগ করা হয় তাতে মানুষের সমস্যার সৃষ্টি হয় যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। তাই এ বিষয়ে হাদীসে বলা হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: তোমরা অভিশাপের দু'টি কারণ থেকে দূরে থাক। সাহাবীগণ বললেন, অভিশাপের কারণ দু'টি কি? তিনি বললেন: পথে-ঘাটে কিংবা ছায়াবিষ্ট গাছের নীচে মল-মূত্র ত্যাগ করা।[২৬৩]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ "

মুয়ায বিন জাবাল (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: তোমরা লা'নতের তিনটি কারণ থেকে দূরে থাক। তা হলো, পুকুর ও নদী ঘাট, রাস্তার মধ্যভাগ এবং গাছের ছায়ায় মল-মূত্র ত্যাগ করা।[২৬৪]

কোন অন্ধকে পথভ্রষ্ট করার পরিণতি

কোন অন্ধকে ভুল পথে পরিচালিত করা চরম অন্যায়। যেহেতু সে অন্ধ, তাই দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের কাছে সঠিক পথের দিশা লাভের অধিকার তার রয়েছে। এটা শুধু মানবাধিকার নয়; বরং মানবিকতাও বটে। সুতরাং অসহায় অক্ষম অন্ধকে ভুল পথ দেখানো নিঃসন্দেহে অন্যায় ও অমানবিক আচরণ। তাই ইসলাম অসহায় অন্ধ মানুষের এ অধিকার সুরক্ষায় তাকে ভুল পথে পরিচালিত করতে নিষেধ করেছে এবং কেউ এ ধরনের অপরাধ করলে তার ভয়াবহ পরিণতির কথাও জানিয়ে দিয়েছে। হাদীসে এসেছে-

---

[২৬২] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাম, অনুচ্ছেদ- তৃতীয়জনের অনুমতি ছাড়া দু'জনে চুপিচুপি কথা বলা হারাম, হাদীস নম্বর ২১৮৪, পৃ. ৬৩৮।

[২৬৩] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল মাওয়াযিয়ি আল্লাতি নাহান নাবিয়্যু আনিল বাওলি ফীহা, হাদীস নম্বর ২৫, পৃ. ১৯।

[২৬৪] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল মাওয়াযিয়ি আল্লাতি নাহান নাবিয়্যু আনিল বাওলি ফীহা, হাদীস নম্বর ২৬, পৃ. ১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَهَ الأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ "

ইবনু আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: আল্লাহ্‌র লা'নত ঐ ব্যক্তির উপর যে কোন অন্ধকে পথভ্রষ্ট করে।[২৬৫]

যাকাত অনাদায়কারীর ভয়াবহ পরিণতি

যাকাত ধনীর সম্পদে গরীবের অর্থনৈতিক অধিকার। তাই যাকাত না দেয়ার অর্থ হলো, দরিদ্রকে অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অভাবের তাড়নায় মানুষ যেসব অপরাধে ধাবিত হয় যেমন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি পথকে সুগম করা। তাই ইসলাম দরিদ্রের অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার্থে (পাশাপাশি চুরি, ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধের পথ রুদ্ধ করতে) ধনীদের উপর যাকাত আদায় ফরয করেছে এবং যেসব ধনী যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকবে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা জানিয়েছে।

[২৬৫] ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান, *সহীহ ইবনে হিব্বান*, (দারুল মা'রিফা, বৈরুত-লেবানন, প্রথম প্রকাশ ২০০৪), কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: লুতের কওমের অনুরূপ কর্ম সম্পাদনকারীর প্রতি নবী ﷺ-এর অভিশাপের বর্ণনা, হাদীস নম্বর ৪৪১৭, পৃ. ১১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

আর যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, তাদের পাঁজর এবং তাদের পিঠে দাগ দেয়া হবে, (আর বলা হবে)- এগুলো সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করে রেখেছিলে (এখন) তার স্বাদ গ্রহণ কর।[২৬৬]

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে যে সম্পদ দান করেছেন সে ব্যাপারে যারা কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে, এই কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং তা তাদের জন্য ক্ষতিকর। তারা যে সম্পদে কৃপণতা করেছিল, ক্বিয়ামাতের দিন তা দিয়ে বেড়ি বানিয়ে তাদের গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। আসমান ও যমীনের উত্তরাধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত।[২৬৭]

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন:

تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَقَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلاَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلاَ يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ.

যে ব্যক্তি নিজের উটের হক (যাকাত) আদায় করবে না, (কিয়ামতের দিন) সেই উট দুনিয়ার চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে এসে আপন মলিককে খুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি নিজের বকরীর হক (যাকাত) আদায় করবে না, (কিয়ামতের দিন) ঐ বকরী দুনিয়ার চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে এসে আপন মালিককে খুর দিয়ে মাড়াবে ও শিং দিয়ে আঘাত করবে। নবী ﷺ বলেন: উট ও বকরীর হকসমূহের একটি হল, পানি পান করানোর স্থানে ওদের দোহন করা (এবং দরিদ্রদের মাঝে দুধ বণ্টন করে দেয়া)। নবী ﷺ আরো বলেন: ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদের কাউকে যেন (হক না আদায় করার কারণে) কাঁধের উপর চিৎকাররত বকরী বহন করে উপস্থিত হতে না হয় এবং বলতে না হয় যে, হে মুহাম্মাদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলব: তোমাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো (আল্লাহ্র বিধান আগেই) পৌঁছে দিয়েছি। আর (কিয়ামতের দিন) তোমাদের কেউ যেন চিৎকাররত উট কাঁধের উপর বহন করে এসে না বলে, হে মুহাম্মাদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলব:

[২৬৬] আল-কুরআন: সূরাহ আত-তাওবাহ: ৯/৩৪-৩৫।

[২৬৭] আল-কুরআন: সূরাহ আলে 'ইমরান: ৩/১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো (এগুলোর হক আদায় না করার শাস্তির কথা আগেই) পৌঁছে দিয়েছি।[২৬৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الآيَةَ.

আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ্ যাকে সম্পদের মালিক করেছেন, সে যদি তার যাকাত আদায় না করে তবে ঐ সম্পদকে এক শক্তিশালী টাক মাথা, দুই শিংওয়ালা সাপ রূপে উঠানো হবে যা ক্বিয়ামাতের দিন তাকে আঘাত করতে থাকবে। তারপর তাকে দাঁত দিয়ে কামড়াবে আর বলবে: আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার গুপ্ত সম্পদ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করেন: (অর্থ) "আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে যে সম্পদ দান করেছেন সে ব্যাপারে যারা কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে, এই কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং তা তাদের জন্য ক্ষতিকর। তারা যে সম্পদে কৃপণতা করেছিল, ক্বিয়ামাতের দিন তা দিয়ে বেড়ি বানিয়ে তাদের গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। আসমান ও যমীনের উত্তরাধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত।"– (সূরাহ আলে 'ইমরান: ১৮০)।[২৬৯]

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا

তারা তাদের সম্পদের যাকাত দিতে অস্বীকার করায় আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ করেছে মাত্র। যদি জীব-জন্তু না থাকতো তাহলে বৃষ্টিপাত হতো না (অর্থাৎ কেবল জীব-জন্তুদের কারণেই বৃষ্টিপাত হয়)।[২৭০]

---

[২৬৮] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ: যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর পাপ, হাদীস নম্বর ১৪০২, পৃ. ১৬৯-১৭০।

[২৬৯] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ: যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর পাপ, হাদীস নম্বর ১৪০৩, পৃ. ১৭০।

[২৭০] *সুনান ইবনু মাজাহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান, বাবু আল-উকূবাত হাদীস নম্বর ৪০১৯, পৃ. ৪১৪।

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামে শাস্তির বিধান

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে। যা যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি অপরাধমুক্ত সুন্দর সমাজ গঠন সম্ভব। যেসব শাস্তির বর্ণনা পর্যায়ক্রমে সামনে আসছে। তার পূর্বে শাস্তির সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, ইসলামে শাস্তির বৈশিষ্ট্য, শাস্তি বিধানের নীতি ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো।

(ক) শাস্তির সংজ্ঞা

শাস্তিকে আরবী ভাষায় العقوبة বা عقاب বলা হয়। এর অর্থ হলো- মানুষকে তার অপকর্মের প্রতিদান দেয়া।[২৭১] যেমন আল্লাহ্‌র বাণী: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ "আর যদি তোমরা অপকর্মের প্রতিদান দাও, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিদান দেবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়।"[২৭২]

আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধানে عقاب ও عقوبة শব্দের অর্থ করা হয়েছে: শাস্তি, সাজা, আযাব, দণ্ড, বিধিনিষেধ, নিষেধাজ্ঞা।[২৭৩] অপরাধের কারণে মানুষ যে যাতনা ভোগ করে তাকে শাস্তি বলা হয়।

ইসলামী আইনবিদগণ শাস্তির সংজ্ঞায় বলেন: শাস্তি হলো শরীয়ত প্রবর্তক (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল)-এর হুকুম অমান্য করার কারণে জনগণের কল্যাণে বিধিবদ্ধ প্রতিফল।[২৭৪] মূলত ইসলামী পরিভাষায় শাস্তি বলতে কাউকে তার অপকর্মের কারণে দৈহিক বা মানসিক কষ্ট অথবা উভয়বিধ কষ্ট দেয়াকে বুঝায়। পরকালে কষ্টভোগও শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। তবে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে আমরা কেবল পার্থিব (ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয়) শাস্তি নিয়ে আলোচনা করব।

(খ) ইসলামে শাস্তির প্রকারভেদ

শাস্তি নির্ধারণের ভিত্তিতে অপরাধসমূহের শাস্তিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

এক. হুদূদ (সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ)

হুদূদ শব্দটি আরবী। যা হদ্দ শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ- বাধা দান করা বা বিরত রাখা।[২৭৫] অতএব, প্রত্যেক জিনিস যা মানুষকে কোন কিছু থেকে বিরত রাখে তাকে হদ্দ বলা হয়। এজন্য আরবীতে দারোয়ান ও কারারক্ষীকে হাদ্দাদ বলা হয়ে থাকে। কেননা দারোয়ান মানুষকে অবাধে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখে আর কারারক্ষী কয়েদীকে ভেতর থেকে বাইরে যেতে বাধা দিয়ে থাকে। আর হুদূদুল্লাহ্ বলতে আল্লাহ্‌র হারামকৃত (নিষিদ্ধ) জিনিসগুলোকে বুঝানো হয়। কোন কোন শাস্তিকে হদ্দ

---

[২৭১] ইবনু মানযূর বলেন: মানুষ যে মন্দ কাজ করে তার প্রতিদানই শাস্তি। [ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরব*, (দারু সাদির, বৈরুত-লেবানন, ৩য় প্রকাশ ২০০৪), খণ্ড ১০, পৃ. ২১৮]

[২৭২] আল কুরআন: সূরাহ আন-নাহ্‌ল, ১৬/১২৬।

[২৭৩] ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, (রিয়াদ প্রকাশনী, মে ২০১১), পৃ. ৭০২, ৭০৪।

[২৭৪] আবদুল কাদির আওদাহ, *আত-তাশরী আল-জিনাঈ*, (মুয়াস্‌সাতুর রিসালাহ, লেবানন, প্রকাশকাল ১৪১৯ হিজরী), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯।

[২৭৫] আবদুর রহমান আল-জুযীরী, *কিতাবুল ফিক্‌হি 'আলা মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, (আল-মাকতাবা আত-তাওফিকিয়্যাহ, কাহিরা- মিসর, প্রকাশকাল ২০০৮), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

বলার কারণ হলো, শাস্তি মানুষকে বিভিন্ন প্রকার অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে বা শরীয়তের হদ্দ এসব অপরাধকে রোধ করে।[২৭৬]

পরিভাষায় হুদূদ এমন কতিপয় অপরাধের শাস্তিকে বলা হয় যা শরীয়ত প্রণেতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[২৭৭] ফকীহ্গণ হদ্দের সংজ্ঞা বলেছেন: হদ্দ একটি নির্দিষ্ট দণ্ড যা আল্লাহ্র হক হিসেবে পালন করা ওয়াজিব। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হদ্দযোগ্য অপরাধগুলোর দণ্ড আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই নির্ধারিত এবং আল্লাহ্র হক হিসেবে তা বাস্তবায়ন ও পালন করা ওয়াজিব। কেননা, যেসব অপরাধের শাস্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সেসব অপরাধ ও দণ্ডবিধি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।[২৭৮]

হদ্দ জাতীয় শাস্তিতে বান্দার অধিকারের চেয়ে আল্লাহ্র অধিকার বাস্তাবায়নের দিকটি প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে।[২৭৯] হদ্দের অর্ন্তভুক্ত অপরাধগুলোর দ্বারা সামগ্রিকভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। তাই হদ্দের শাস্তি কার্যকর হলে সমাজ উপকৃত হয় ও মানবাধিকার সংরক্ষিত হয়।

কয়েকটি বড় অপরাধের জন্য ইসলামে হদ্দ প্রয়োগের বিধান দেয়া হয়েছে। যথা: (১) চুরি; (২) ডাকাতি; (৩) ব্যভিচার (৪) ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ– এ চারটি অপরাধের শাস্তির পরিমাণ আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। (৫) মদপান– এর শাস্তি নবী ﷺ-এর হাদীস ও সাহাবীগণের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।[২৮০]

জ্ঞাতব্য, কোন কোন হদ্দ কার্যকরের নিয়ম খুবই কঠোর। যা কোন অবস্থাতেই পরিবর্তনযোগ্য নয় এবং কেউ তা লঘু কিংবা ক্ষমা করার অধিকারও রাখে না। অবশ্য সুষ্ঠু বিচারের জন্য অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলিও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তগুলোর মধ্য থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তাহলে হদ্দ অকার্যকর হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি অপরাধ প্রমাণে বা অপরাধের শর্তগুলোর কোন একটিতেও সন্দেহ দেখা দেয় তাহলেও হদ্দ কার্যকর হবে না।

উল্লেখ্য যে, কোন শর্তের অনুপস্থিতি বা কোন সন্দেহের কারণে হদ্দ অকার্যকর হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে সাধারণ শাস্তি দিবেন।[২৮১]

---

[২৭৬] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, (ওয়াযারাতুল আওকাফি ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত, প্রকাশকাল ২০১২), ১৭ খণ্ড, পৃ. ১২৯।

[২৭৭] ইমাম আলাউদ্দীন আবূ বকর ইবন্ মাসঊদ আল-কাসানী, *আল-বাদাইউস সানাঈ ফী তারতীবিশ শারাঈ*, (২য় সংস্করণ, বৈরুত ১৪০২/১৯৮২), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, ১৭ খণ্ড, পৃ. ১২৯; *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, (গবেষণা বিভাগ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১১), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৮-১৮৯।

[২৭৮] ড. আবদুল আযীয আমের, *ইসলামী দণ্ডবিধি*, অনুবাদ: শহীদুল ইসলাম, (বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড এইড সেন্টার, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১২), প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮।

[২৭৯] এজন্যই কিসাসকে হদ্দ বলা হয় না। কারণ, এতে বান্দার অধিকার বাস্তবায়নের দিকটি প্রবল। অনুরূপ তাযীরকেও হদ্দ বলা হয় না। যেহেতু তা সুনির্দিষ্ট নয়। অবশ্য কতিপয় আলিম কিসাসকে হদ্দের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, বিভিন্ন অপরাধের জন্য শরীয়তের র্নিধারিত শাস্তিগুলো হচ্ছে মাদূদ। চাই তা আল্লাহ্র অধিকার বাস্তবায়নের উদ্দেশে ফরয করা হোক বা বান্দার হক বাস্তবায়নের জন্য। (আবূ বকর মুহাম্মদ সারাখ্সী, *আল মাবসূত*, দারুল মা'আরিফা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৬)

[২৮০] কোন কোন ফিকাহবিদ মুরতাদ হয়ে যাওয়া (ধর্মান্তর) এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তিকেও হদ্দ বলে উল্লেখ করেছেন।

[২৮১] ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দ্বিতীয় প্রকাশ- মার্চ ২০১৫), পৃ. ২৭; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, ১৭ খণ্ড, পৃ. ১২৯-১৫২; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী কর্তৃক ব্যাখ্যাসহ, (দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০১-২৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. কিসাস (সদৃশ শাস্তি)

কিসাস আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে- একই রূপ কাজ করা, পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, অপরাধীর সাথে তার বাড়াবাড়ির অনুরূপ আচরণ করাকে কিসাস বলা হয়।[২৮২] 'লিসানুল আরব' গ্রন্থে রয়েছে: কিসাস হলো- হত্যার বদলে হত্যা এবং যখমের বদলে যখম করা।[২৮৩] 'আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ' গ্রন্থে রয়েছে: পরিভাষায় কিসাস হলো- অপরাধীর সাথে তার অপরাধের অনুরূপ আচরণ করা। যেমন, হত্যার বদলে হত্যা এবং যখমের বদলে যখম করা।[২৮৪]

আল্লামা জুযীরী (রহ.) বলেন: মানুষের প্রাণ অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর অপরাধী যেরূপ অপরাধ করেছে, তাকে ঠিক সেরূপ শাস্তি দেয়াকে কিসাস বলা হয়। সে যখন কাউকে হত্যা করবে তখন কিসাস অবধারিত হবে। তা হলো, তাকেও হত্যা করা হবে যেমন সে অন্যকে হত্যা করেছে।[২৮৫]

ড. আহমদ মুহাম্মদ ইবরাহীম লিখেছেন: কিসাস শব্দের উৎপত্তি 'কাস্‌সা' শব্দ থেকে। 'কাস্‌সা' এর আভিধানিক অর্থ হলো- কর্তন করা। ইসলামী আইনে এর অর্থ হচ্ছে- কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষত, অঙ্গহানি অথবা মৃত্যুর কারণে অপরাধীকেও শাস্তি হিসেবে যখম, অঙ্গহানি অথবা হত্যা করা।[২৮৬] ড. আবদুল আযীয আমের লিখেছেন: ফিকহ্‌বিদগণের মতে, কিসাস হলো- কোন ব্যক্তির হক বিনষ্টের পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান যা ওয়াজিব।[২৮৭]

উপরোক্ত সংজ্ঞার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হলো যে, কিসাস হলো অপরাধী কোন ব্যক্তির যতটুকু পরিমাণ দৈহিক ক্ষতি করবে প্রতিশোধ স্বরূপ তারও অনুরূপ পরিমাণ দৈহিক ক্ষতি করা। অপরাধী কাউকে হত্যা করলে অপরাধীও মৃত্যুদণ্ড পাবে এবং অপরাধী কাউকে যখম করলে কিসাস স্বরূপ অপরাধীকেও যখম করা হবে।[২৮৮]

উল্লেখ্য, হুদূদের ন্যায় কিসাসের শাস্তিও সুনির্ধারিত। পার্থক্য এটুকু যে, হুদূদকে আল্লাহ্‌র হক বা জনস্বার্থ হিসেবে বাস্তবায়ন করা হয়। হুদূদের ক্ষেত্রে বাদী ক্ষমা করলেও অপরাধী ক্ষমা পাবে না এবং হদ্দ অকার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে কিসাসে বান্দার অধিকার প্রবলভাবে বিদ্যমান। তাই হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর খুনিকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের ইখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছে করলে কিসাস হিসেবে খুনির মৃত্যুদণ্ড দাবি করবে অথবা খুনিকে ক্ষমাও করে দিতে পারে।[২৮৯]

---

[২৮২] আবদুল্লাহ আল-রুকবান, *আল-কিসাস ফিন নাফস*, (মু'আসসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ছাপা, প্রকাশকাল ১৪০০ হিজরী), পৃ. ১৩।

[২৮৩] ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১২, পৃ. ১২১।

[২৮৪] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, ১৭ খণ্ড, পৃ. ২৩০, এবং খণ্ড ২১, পৃ. ৪৪-৪৫।

[২৮৫] আবদুর রহমান আল-জুযীরী, *কিতাবুল ফিক্‌হ 'আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, (মাকতাবা তাওফিকিয়্যাহ, কাহিরা, মিসর, প্রকাশকাল ২০০৮), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৮।

[২৮৬] ড. আহমদ মুহাম্মদ ইবরাহীম, *রিসালা আল-কিসাস ফিশ শারীয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, (মাতবায়ে আমিরিয়া, মিসর, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪), পৃ. ৩৬।

[২৮৭] ড. আবদুল আযীয আমের, *ইসলামী দণ্ডবিধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

[২৮৮] ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।

[২৮৯] কিসাস ও হুদূদের মধ্যে আরো কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। যেমন– ১. হদ্দের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সুপারিশ করা জায়িয নয়। কিন্তু কিসাসের বেলায় সুপারিশ করা বৈধ। ২. (যেনার অপবাদের হদ্দ ছাড়া) অন্যান্য হদ্দ দাবির উপর নির্ভরশীল নয়। তাই দাবিদার থাকুক বা না থাকুক হদ্দ অবশ্যই কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে কিসাসের বিষয়টি দাবির উপর নির্ভরশীল। তাই দাবিদার না থাকলে কিসাস কার্যকর হয় না। ৩. হুদূদের বেলায় স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নেয়া বৈধ। পক্ষান্তরে কিসাসে তা বৈধ নয়, ইত্যাদি। (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১৭, পৃ. ১৩২, *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮)

Dhaka University Institutional Repository

খুনিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অধিকার। তথাপি তারা মৃত্যুদণ্ড ক্ষমা করে দিতে পারে। খুনিকে ক্ষমা করে দিলে সে আরো বেপরোয়া হয়ে যাবে এরূপ ধারণা ঠিক নয়। তবে এরূপ আশংকা একেবারে উড়িয়ে দেয়াও যায় না। তাই সরকারের দায়িত্ব হলো- অন্যান্য জনসাধারণের প্রাণরক্ষা করা। ইসলামী আইন অনুসারে, সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য খুনিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিংবা কোন শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে। যখমের বিষয়টিও একই রকম।[২৯০]

তিন. তা'যীর (সাধারণ দণ্ড)

তা'যীর আরবী عزر শব্দ থেকে উদগত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বাধা দেয়া, নিষেধ করা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা রুখে দেয়া।[২৯১] আল-মু'জামুল ওয়াফী গ্রন্থে রয়েছে: এর অর্থ হলো- ভর্ৎসনা করা, নিন্দা করা, তিরস্কার করা, সাহায্য করা, শক্তি যোগানো, সম্মান করা, প্রচণ্ডভাবে প্রহার করা, শিক্ষা দেয়া।[২৯২] তবে শব্দটি সম্মান ও সাহায্য করা অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। তা'যীর শব্দটি হদ্দ ব্যতীত আদব শিখানো ও তিরস্কার অথের্ও ব্যবহার হয়। কেননা, তা'যীর অপরাধীকে পুনরায় পাপ বা অপরাধ করতে বাধা দেয়।[২৯৩]

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তা'যীর হলো- এমন এক অনির্দিষ্ট শাস্তি যা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অপরাধী মানুষের উপর আবশ্যিকভাবে আপতিত হয় কিন্তু হদ্দ ও কিসাসের মতো সুনির্দিষ্ট নয়। শিষ্টাচারের প্রতি আগ্রহী করে তোলা, মানুষকে সংশোধন করা এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে হদ্দ ও কিসাসের সাথে তা'যীর সামঞ্জস্য রাখে।[২৯৪]

হুদূদ ও কিসাস পর্যায়ের কয়েকটি অপরাধ ছাড়া বাকী সব অপরাধই তা'যীরী অপরাধ। যেমন– সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, প্রতারণা করা, খাদ্যে ভেজাল দেয়া, মাপে কম দেয়া, মানুষের চলাচলের পথে আবর্জনা ও কষ্টদায়ক বস্তু ফেলা, অসংরক্ষিত মাল চুরি করা, খিয়ানত করা, যেনা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মিথ্যা অপবাদ দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, কাউকে গালি দেয়া বা কাফির, ফাসিক ইত্যাদি বলা।

(গ) ইসলামী শাস্তি বিধানের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শাস্তি বিধানের বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. অপরাধীদের অবস্থার ভিন্নতার কারণে একই অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অবস্থাগত পার্থক্য মূল্যায়ন। যেমন- ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণে বিবাহিত ও অবিবাহিতদের মধ্যে পার্থক্যকরণ এবং উভয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি র্নিধারণ।

২. ইসলাম অপরাধের প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন করে। অপরাধী কেন অপরাধ করল, কিসে তাকে অপরাধে বাধ্য করল, ইসলামী আইনে শাস্তির ফায়সালা প্রদানের সময় তা অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। এগুলো

---

[২৯০] ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

[২৯১] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১৭, পৃ. ২৩০; ড. আবদুল আযীয আমের, *ইসলামী দণ্ডবিধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

[২৯২] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, (রিয়াদ প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণ মে ২০১১), পৃ. ৬৯২।

[২৯৩] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১৭, পৃ. ২৩০; *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩; *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬ থেকে উদ্ধৃত।

[২৯৪] ড. আবদুল আযীয আমের, *ইসলামী দণ্ডবিধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০ থেকে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনায় না আনলে তার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে। অপরাধীর অপরাধকরণে কোন বৈষয়িক বিষয় থেকে থাকলে এ ক্ষেত্রে তাকে 'সন্দেহ-সুবিধা' দিয়ে থাকে।

৩. শাস্তির কঠোরতা ও সহজতার সাথে সমাজে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, শাস্তি কঠোর হলে সমাজে অপরাধের সংখ্যা দ্রুত কমে আসে। পক্ষান্তরে শাস্তির মাত্রা কম হলে অপরাধের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই ইসলামী শাস্তির আইনে কঠোরতা ও দয়ার সমন্বয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইসলাম হদ্দ জাতীয় শাস্তি প্রমাণে অত্যন্ত কঠোর নীতি অবলম্বন করেছে। অপরাধ প্রমাণে কোন সন্দেহ পরিলক্ষিত হলে হদ্দ কার্যকর হয় না।

৪. শুধু সমাজের কল্যাণ সাধন নয়; বরং অপরাধীর স্বার্থ রক্ষা করে মানবাধিকার সংরক্ষণ করাও ইসলামী শাস্তি আইনের একটি বৈশিষ্ট্য। অপরাধীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে শাস্তি কিছুটা বিলম্বিত করার সুযোগও ইসলামে রয়েছে।

৫. ইসলামে অপরাধের শাস্তিগুলো শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্ত মূলক। শাস্তি যখন শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক হয় তখন সমাজে অপরাধের প্রবণতা হ্রাস পায়। সেজন্য ইসলামে বড় বড় অপরাধের শাস্তিগুলো প্রকাশ্যে কার্যকর করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।[২৯৫]

শাস্তি শিক্ষামূলক হওয়া প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম লিখেছেন: "শাস্তি সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে– বিদ্রোহী মন-মানসিকতায় যে বিদ্রোহ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তা সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তিটা দেখে যেন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। ইতিহাস সাক্ষী, এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দৃষ্টান্তমূলক বা শিক্ষা কিংবা উপদেশমূলক শাস্তিসমূহ চিরদিন অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যখনই কঠোর কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, সমাজে অপরাধের সংখ্যা দ্রুততার সাথে শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। আবার যখনই শাস্তির কঠোরতার মাত্রা কম করা হয়েছে, অপরাধের সংখ্যা তখনই হু হু করে বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। এ থেকে এই মূলনীতি পাওয়া যায় যে, শাস্তির কঠোরতা-নমনীয়তার সাথে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এই মৌলনীতিটি সর্বাবস্থায় এবং সকল দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই অনুধাবনীয়। যদি শাস্তির কঠোরতায় শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণের মাত্রা অত্যন্ত দুর্বল থাকে তখন ব্যক্তি অপরাধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কার্যত অপরাধ করে বসবে। কিন্তু অপরাধের পরবর্তী পরিণতি বা তৎসংক্রান্ত শাস্তিকে উপদেশ বা শিক্ষার মাত্রা প্রবল থাকলে ব্যক্তি অপরাধ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবে। অন্য কথায়, শাস্তিকে অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনের যোগ্য বানাবার লক্ষ্যে শাস্তিকে শিক্ষামূলক বানানোর মতাদর্শটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। তখন এই শিক্ষামূলক বা অপরাধ প্রতিরোধক শাস্তি সময়ের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এমনভাবে কার্যকর করতে হবে, যার ফলে শাস্তিটা অপরাধের প্রতি মনস্তাত্ত্বিক উদ্বোধনের চূড়ান্ত মাত্রার প্রতিরোধক হয়ে থাকবে চিরকালের জন্য।"[২৯৬] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম আরো লিখেছেন: "অপরাধ অনুকূল পরিবেশে অধিক শক্তিশালী হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং প্রতিকূল পরিবেশে তা দমে যায়। আধুনিক জগতে সাধারণত যে ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়, ফাঁসি, জেলে আটক বা জরিমানা প্রভৃতিই তার রূপ। কিন্তু এই তিন প্রকারের শাস্তি প্রয়োগ-পদ্ধতিতে কেন শিক্ষামূলকতা বা দৃষ্টান্তমূলকতা নেই। ফাঁসির কথাই ধরা যাক। তা একটি শিক্ষামূলক শাস্তি হলেও যেহেতু তা কারাগারের গোপন কুঠরিতে এত গোপনীয়তা সহকারে কার্যকর করা হয় যে, সেই কারাগারের অন্যান্য কয়েদীরাও তা দেখা তো দূরের কথা, টেরও পায় না। এক-একদিন বা এক-এক সময় হয়ত অনেককে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে মারা হয়; কিন্তু সাধারণ কয়েদী বা জনজীবনে তার একবিন্দু প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য করা যায় না। তার অর্থ, আধুনিক কালের কঠিন-

---

[২৯৫] ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩২।

[২৯৬] *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

কঠোর শাস্তিসমূহ মানব-মনে সামান্য প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গও জাগাতে পারে না। তা কখনোই শিক্ষামূলক বা দৃষ্টান্তমূলক হচ্ছে না– যা দেখে অন্যরা অনুরূপ শাস্তির অপরাধ এড়িয়ে চলার সংকল্প গ্রহণ করবে। কারাগারের পাশ দিয়ে যাতায়াত কালে হয়ত মনে জাগবে যে, এর মধ্যে শত শত লোক তিল তিল করে বন্দী জীবন-যাপন করছে। কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তে তার সমস্ত প্রভাব মনের কল্পনালোক থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। ফলে এই মৃত্যুদণ্ড বা বন্দীদশা জনগণের মধ্যে অনুরূপ পরিণতি অপরাধ থেকে বিরত থাকার প্রবণতা জাগাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাই শাস্তি যাতে শিক্ষমূলক হয় সে ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। ফাঁসির দণ্ড যদি কারগাারের অভ্যন্তরে নয়– প্রকাশ্যভাবে ও বিপুল জনতার উপস্থিতিতে কার্যকর করা হয়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক হতে পারে।

অনুরূপভাবে কোনো অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কাউকে দ্বীপান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত করা হলেও তা জনগণের জন্য তেমন শিক্ষামূলক হয় না। কোনো অপরাধী সেখান থেকে দীর্ঘদিনের শাস্তিভোগ করে প্রত্যাবর্তন করলেও কেউ জানতেই পারবে না যে, সে একজন অপরাধী এবং দীর্ঘমেয়াদী দ্বীপান্তরের শাস্তিভোগ করে ফিরে এসেছে। তার জীবন কোনো অপরাধের কালিমায় কলুষিত হয়ে আছে, তা কারোর পক্ষে আঁচ করাও সম্ভব হবে না। কিন্তু এর বদলে যদি তার জন্য এমন কোনো শাস্তি নির্ধারণ করা হতো, যা তাকে অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করে দিত, তাহলে তা অবশ্যই সকলের জন্য শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক হত এবং তার ফলে জনমনে অনুরূপ অপরাধ থেকে দূরে সরে থাকার একটা প্রবল ইচ্ছা ও চেষ্টা সক্রিয় হয়ে উঠত। এ থেকে স্পষ্ট মনে হয়, পাশ্চাত্য আইনের শাস্তিসমূহ জনগণকে অপরাধবিমুখ বানাক, আইন প্রণেতারা তা আদৌ চায়নি। ফলে তা এই দিক দিয়ে জনজীবনে কোনো রেখাপাত করেনি, সমাজকে পারেনি অপরাধমুক্ত করতে। তাই একথা স্বীকার না করে কোনো উপায় নেই যে, অপরাধের জন্য সে শাস্তিই যথার্থ ও উপযোগী, যা জনগণকে অনুরূপ অপরাধ থেকে সযত্নে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে।"[২৯৭] আর আপরাধ যেহেতু নিরীহ মানুষের অধিকারকেও ক্ষুন্ন করে সেহেতু শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হলে অপরাধী অপরাধ থেকে বিরত হবে এবং এতে নিরীহদেরও মানবাধিকার সংরক্ষিত হবে।

(ঘ) ইসলামে শাস্তি বিধানের নীতি ও উদ্দেশ্য

অপরাধের ফলে সমাজে নেমে আসে অশান্তি ও বিপর্যয়। এতে সৃষ্টি হয় অনেক সমস্যা এবং বাড়ে জনগণের চরম ভোগান্তি। তাই সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ঐসব অপরাধীর লাগাম টেনে ধরতে এবং মানুষের মাঝে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে মহান আল্লাহ্ ইসলামী আইনে শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেছেন। তিনি ব্যক্তির সংশোধন ও মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। সুতরাং ইসলামে অপরাধের শাস্তির বিধানের মূল লক্ষ্য কাউকে কষ্ট দেয়া নয়; বরং মানব জীবনে সার্বিক কল্যাণ ও নিরপত্তা বিধান সাধন। ইসলামী শাস্তি আইনের উদ্দেশ্যসমূহ থেকে কয়েকটি উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো:

১. মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের দিকগুলো সংরক্ষণ

দ্বীন রক্ষা, বংশ রক্ষা, বিবেক-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সংরক্ষণ– এ পাঁচটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে চিহ্নিত এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তা মানবাধিকার হিসেবে বিবেচিত। ইসলাম এ মৌলিক বিষয়গুলো পুরোপুরি সংরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে এর লঙ্ঘনকারীর জন্য ইসলাম কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে যেন ভবিষ্যতে কেউ এমন কাজ করার সাহস না পায়। যেনা-ব্যভিচারের হদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে মানুষের বংশ ধারাকে বিনষ্ট ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার জন্য, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সুরক্ষায় মদ্যপানের শাস্তি বিধান করা হয়েছে, চুরি ও ডাকাতির শাস্তি বিধান করা হয়েছে মানুষের জীবন ও

[২৯৭] *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদের নিরাপত্তাকল্পে, মানুষের ইজ্জত-সম্মান সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান।[২৯৮]

২. অপরাধীকে সংশোধন ও পবিত্রকরণ

ইসলাম অপরাধীর প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষ পোষণ করে না; বরং শাস্তি কার্যকরের পরও তাকে অত্যন্ত দয়া ও প্রীতির চোখে দেখে। ইসলাম প্রথমে অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে তাকে অপরাধের দোষ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে, তারপর সে যে মন্দ পরিবেশে পড়ে অপরাধ করেছিল সেখান থেকে তাকে বের করে এমন পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে সে নিজের মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হবে এবং এটা ভাববে যে, তার মনুষত্ব একবারে নিচে নেমে যায়নি; বরং নিতান্তই মানবিক কারণে সে সাময়িকভাবে ভুল করেছিল মাত্র।

ইসলাম শাস্তি কার্যকরের মাধ্যমে অপরাধীকে পবিত্র ও পাপমুক্ত করে, সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা করে। তাই শাস্তি ভোগের পরও অপরাধী মনে প্রশান্তি অনুভব করে; সমাজের প্রতি তার মনে প্রতিহিংসা জাগে না; আর তার মনে এই ভেবে আত্মোপলব্ধির সঞ্চার হয় যে, এ শাস্তি কারো মনগড়া নয়; বরং মহান আল্লাহ্‌রই শরীয়ত।[২৯৯]

৩. অপরাধকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিতকরণ

ইসলামে শাস্তির বিধান প্রবর্তনের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, অন্যায়-অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন-বাড়াবাড়ি প্রভৃতিকে অপরাধ হিসেবেই জানানো। মানুষ অপরাধ করে অপরাধের জন্য শাস্তি না পেলে সে অপরাধকে অপরাধই মনে করবে না, জুল্‌ম-অত্যাচারকে ঘৃণা করবে না, অপরের ক্ষতি করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করাকে পাপ গণ্য করবে না, প্রতারণা, জালিয়াতি এগুলোকে হালকা ভাবতে শুরু করবে। সেজন্য ইসলাম বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। যাতে সেগুলো যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়। ফলে অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি এবং সেই দণ্ড কার্যকরের প্রত্যক্ষদর্শীরা অপরাধকে অপরাধ ও শাস্তিযোগ্য কর্ম হিসেবে জেনে ভীত হয় এবং অনুরূপ কর্ম করা থেকে বিরত থাকে।

৪. প্রতিশোধ স্পৃহা প্রশমিত করা

ইসলাম অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে মজলুমের মনে জেগে উঠা প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রশমিত করে। কেননা অপরাধীর দ্বারা কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, কারো ব্যক্তি স্বার্থ ও অধিকার তথা মানবাধিকার ক্ষুন্ন হলে সাধারণভাবেই তার মনে প্রতিশোধের আগুন জেগে ওঠে। প্রাচীন কালে প্রতিটি ব্যক্তিরই নিজস্ব প্রতিশোধ গ্রহণের স্বাধীনতা ছিল। বর্তমান কালেও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের ঘটনাবলী যত্রতত্র দেখা যাচ্ছে। এর কারণ হলো, প্রতিশোধ স্পৃহা প্রশমিত করার ব্যাপারে আধুনিক শাস্তি ও শাস্তিদান পদ্ধতি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। কোন চোর বা ডাকাতকে কিছুদিনের জন্য কারাগারে আটকে রাখলে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির লাভ কি। অনেক ক্ষেত্রে এ শাস্তি এতই হাস্যকর হয় যে, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মনে প্রতিশোধ স্পৃহা প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে আরও তীব্র হয়ে উঠে। ফলে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নিজেরাই পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হয়। যার দরুন প্রতিশোধ স্পৃহা চরম প্রতিহিংসার রূপ পরিগ্রহ করে এবং অপরাধের মাত্রা, সংখ্যা ও মানবাধিকার হরণের মাত্রা অকল্পনীয়ভাবে বেড়ে যায়। কোন সুশৃঙ্খল সমাজ ও প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা এরূপ অবস্থাকে মুহূর্তের জন্যও চলতে দিতে পারে না। তাই ইসলাম চায় রাষ্ট্র সরকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিভাবক হিসেবে প্রতিশোধ গ্রহণের আইনসম্মমত পন্থা বাস্তবায়নের

---

[২৯৮] *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

[২৯৯] *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব পালন করুক; অপরাধীকে যথাযথ শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মন থেকে প্রতিশোধ স্পৃহা প্রশমিত করুক এবং সমাজে শান্তি বিরাজ করুক।[৩০০]

৫. সমাজের কল্যাণ সাধন

ইসলাম শাস্তির বিধান প্রয়োগের দ্বারা ইসলামী সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে চায়। এ কল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে অন্যায়-অত্যাচারের বিস্তার ঠেকানো এবং আইন অমান্য করার প্রবণতা বন্ধ করা। কারো প্রতি নির্মমতা দেখানো অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ এর উদ্দেশ্য নয়।[৩০১]

৬. সুবিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব হলো প্রতিটি জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া। মানুষের এ অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষণের অনন্য উপায় হলো এই অধিকার ক্ষুণ্ন করাকে অপরাধ গণ্য করা এবং অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার মাত্রানুযায়ী অপরাধীকে ক্ষমাহীন পন্থায় শাস্তি দেয়া। শাস্তি কার্যকর করা ছাড়া সুবিচার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না এবং এই শাস্তি প্রয়োগ ছাড়া মানবাধিকার রক্ষা অসম্ভব। তাই ইসলামী আইন অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সুবিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়; মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে চায়।

---

[৩০০] *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪, ১৭৮।

[৩০১] *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

[২]. মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে শাস্তিই একমাত্র ব্যবস্থা নয়

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলাম শুধু ইহকাল ও পরকালীন শাস্তিরই ব্যবস্থা করেনি; বরং ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা অংকুরে বিনষ্ট করতে আগ্রহী। এজন্য ইসলাম মুসলিম ব্যক্তির চতুর্দিকে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি করেছে, যা তাকে পাপের দিকে আকর্ষণ ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত দিকগুলো লক্ষ্যনীয়:

এক. ইসলাম ব্যক্তিকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করে নির্মল দিক-নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে উন্নত চরিত্রে বিভূষিত করতে সচেষ্ট। মানুষের মনে ঈমানের বীজ বপন করে তাকে কল্যাণমুখী বানিয়ে তার মধ্যে অপরাধ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক। প্রকৃত ঈমান নির্লজ্জতা ও হারাম কাজ অবলম্বনের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিরোধক হয়। কেননা ঈমানদার ব্যক্তি বিশ্বাস করে, তার সকল কর্ম আল্লাহ্ দেখছেন। তাই সে যদি কোনভাবে ইহকালীন শাস্তি থেকে রেহাই পেয়েও যায়, কিন্তু সে আখিরাতে এর থেকে বিন্দুমাত্র রক্ষা পাবে না। তাই ঈমান অন্যায়ের প্রতিরোধক। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ع لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদান থাকে না, মদ পানের সময়ও পানকারী ঈমানদার থাকে না এবং কোন চোর মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না, কোন লুটতরাজকারী যখন এমন লুটতরাজ করে যে, লুটতরাজের সময় লোকজন তার দিকে নীরবে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে, তখন সে মু'মিন থাকে না।[৩০২]

অতএব বুঝা গেল, ঈমানদার ব্যক্তি ব্যভিচার করতে পারে না, মাদক সেবন করতে পারে না এবং লুটতরাজও করতে পারে না। যদি করে, তখন সে আর মু'মিন থাকে না। সুতরাং যার কাছে ঈমান অধিক গুরুত্বপূর্ণ সে অপরাধ থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে।

দুই. মানুষকে অন্যায়-অপরাধ তথা যাবতীয় হারাম কাজ করা থেকে দূরে রাখার জন্য ইসলাম গর্হিত কাজের ভয়াবহ পরিণতির চিত্র মানুষের সামনে পেশ করেছে। যাতে মানুষের মনে এ সম্পর্কে চরম ভীতি জাগে, সে এসব গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ- অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা, ব্যভিচার ও মদপান করা- এসব পাপ কর্ম সম্পর্কে কুরআনে ঘোষিত হয়েছে:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, তার পরিণাম জাহান্নাম। সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ এরূপ ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হয়েছেন, অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তার জন্য অত্যন্ত মর্মান্তিক আযাব নির্ধারণ করে রেখেছেন।[৩০৩]

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً

তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যাবে না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও অত্যন্ত মন্দ পথ।[৩০৪]

---

[৩০২] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাযালিম, অনুচ্ছেদ: মালিকের অনুমতি ব্যতীত লুটপাট করা, হাদীস নম্বর ২৪৭৫, পৃ. ২৯৪।

[৩০৩] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নিসা, ৪/৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً

(রহমানের বান্দা তারাই) যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না, ন্যায়ভাবে ছাড়া মানুষকে হত্যা করে না, ব্যভিচার করে না। আর যে ব্যক্তি তা করবে, সে বড় পাপী হবে, কিয়ামতের দিন তার আযাব দ্বিগুণ করা হবে, তাতে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরদিন থাকবে।[৩০৫]

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ..

যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার বিস্তৃতি ঘটুক, তাদের জন্য আছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক আযাব (শাস্তি) দুনিয়া ও আখেরাতে।[৩০৬]

এভাবে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকে কুরআনে হারাম ঘোষণার পাপাশাশি তার ভয়বাহ পরিণতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যা ঈমানদার ব্যক্তিকে অন্যায়-অপরাধ করা থেকে দূরে রাখতে সহায়ক।

তিন. ইসলাম তাকওয়া ও যাবতীয় ভাল কাজের ব্যাপারে মুসলিমদের পরস্পরকে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে। এর মধ্যে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা, ধৈর্য ও সত্যের উপদেশ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ইসলাম পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে একে-অপরকে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। মুসলিমদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অন্যায়, অত্যাচার, বিপর্যয়, সীমালঙ্ঘন তথা যাবতীয় পাপের কাজ প্রতিরোধ করে। উদাহরণ স্বরূপ- মহান আল্লাহ্‌র বাণী:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

তোমরা কল্যাণকর ও তাকওয়াপূর্ণ কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।[৩০৭]

وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

যুগের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, পরস্পকে সত্য ও ন্যায় কাজের উপদেশ দিয়েছে এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্য ধারণের।[৩০৮]

হাদীসে আছে-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো সে জালিম হোক কিংবা মজলুম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মজলুমকে সাহায্য করার তাৎপর্য বুঝলাম কিন্তু জালিমকে সাহায্য করব কীভাবে, তা বুঝতে পারলাম না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন: তুমি তাকে জুল্‌ম করা থেকে বিরত রাখবে, এতেই তাকে সাহায্য করা হবে।[৩০৯]

---

[৩০৪] আল-কুরআন: সূরাহ বনী-ইসরাইল, ১৭/৩২।

[৩০৫] আল-কুরআন: সূরাহ ফুরকান, ২৫/৬৮-৬৯।

[৩০৬] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নূর, ২৪/১৯।

[৩০৭] আল-কুরআন: সূরাহ আল-মায়িদা, ৫/২।

[৩০৮] আল-কুরআন: সূরাহ আল-আস্‌র, ১০৩/১-৩।

[৩০৯] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাযালিম, অনুচ্ছেদ: তোমার ভাইকে সাহায্য কর চাই সে জালিম হোক বা মজলুম, হাদীস নম্বর ২৪৪৪, পৃ. ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ε قَالَ ... فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ

আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করবে অথবা কোন বিদ'আতীকে (অন্যায়কারীকে) আশ্রয় দিবে, তার উপর আল্লাহ্ ও ফিরিশতা এবং সমগ্র মানবকূলের অভিশাপ বর্ষিত হোক। তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত গৃহিত হবে না। আর সকল মুসলমানের পক্ষ হতে নিরাপত্তা একই স্তরের। সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দেয়া নিরাপত্তা বাধাগ্রস্ত করবে তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ এবং ফিরিশতাদের ও সকল মানুষের অভিশাপ। তার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত গৃহিত হবে না।[৩১০]

সুতরাং যে ব্যক্তি কোন চোর, ডাকাত, খুনি, ধর্ষণকারী প্রভৃতি অপরাধীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিবে– যার উপর হদ্দ, কিসাস প্রভৃতি ধার্য হয়েছে,– বুঝতে হবে সেও অপরাধী।

তামীম আদ-দারী (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: দ্বীন হচ্ছে নসীহত করা ও হিতাকাংখী হওয়া। আমরা (সাহাবীরা) জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য হিতাকাংখী হবো? নবী ﷺ বললেন: আল্লাহ্ ও তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখার ব্যাপারে, আর মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের জন্যে নসীহত (কল্যাণ কামনার পথ) অবলম্বন করাই হচ্ছে দ্বীন।[৩১১]

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সলাত কায়িম, যাকাত আদায় এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার জন্য বাইআত করেছি।[৩১২]

কুরআন-সুন্নাহ্র এরূপ আদেশ ও বিধানের কারণে ইসলামী সমাজে অপরাধ প্রতিরোধে পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যাপকতা লাভ করে। ফলে ইসলামী সমাজে জুল্ম ও সকল ধরনের গর্হিত কাজ আশ্রয়-প্রশ্রয় পায় না, প্রসার লাভ করতে পারে না; বরং তা দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে থাকে, নির্মূল হয়ে যায়। আর সততা, পারস্পরিক কল্যাণ কামনা ও যাবতীয় ভাল কাজের বিস্তৃতি ঘটে।

চার.: ইসলাম কোন কাজ হারাম করলে সেই কাজের সুযোগ সৃষ্টির উপায়, উপকরণ ও যাবতীয় পন্থাকেও নিষিদ্ধ করে। উদাহরণ স্বরূপ- ইসলামে ব্যভিচার নিষিদ্ধ। তাই যে কাজ মানুষকে ব্যভিচারে উৎসাহিত করে সে কাজ অবলম্বনও ইসলামে হারাম ঘোষিত হয়েছে। নির্জনে যুবক-যুবতীর মিলিত হওয়া, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, পর্দাহীনতা, কোন নারীর সাথে মাহরাম না নিয়ে একাকী দূরে সফর করা, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে (পর্নোগ্রাফী, উলঙ্গপনা, যৌন উত্তেজনাপূর্ণ নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি) বা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয় এমন কাজ বা অনুষ্ঠান হারাম করা হয়েছে। কেননা এসব কাজ পরিণামে ব্যভিচার সংঘটিত হওয়াকে অনিবার্য করে তোলে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

---

[৩১০] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: জিযিয়াহ, অনুচ্ছেদ: যারা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে তাদের গুনাহ, হাদীস নম্বর ৩১৭৯, পৃ. ৩৮৫।

[৩১১] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: নসীহতই হচ্ছে দ্বীন, হাদীস নম্বর ৫৫, পৃ. ৩১।

[৩১২] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: নসীহতই হচ্ছে দ্বীন, হাদীস নম্বর ৫৬, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে নবী! আপনি ঈমানদার পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন। আর ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের গলদেশে, বক্ষদেশে ও মাথায় ওড়না দিয়ে আবৃত করে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, মহিলা, অধিকারভুক্ত দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদেরকে ছাড়া কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৩১৩]

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ε وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ε وَقَالَ " يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا " . وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ .

'আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। একদা আসমা বিনতু আবূ বকর (রাযি.) পাতলা কাপড় পরিহিতা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্র ﷺ-এর কাছে এলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন: হে আসমা! মেয়েরা যখন সাবালিকা হয়, তখন এই দু'টি অঙ্গ ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ প্রকাশ করা তার জন্য সংগত নয়, এ বলে তিনি তাঁর চেহারা ও দুই হাতের কব্জির দিকে ইশারা করেন।[৩১৪]

আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: দুই ধরনের মানুষ এমন রয়েছে যারা জাহান্নামী। যাদেরকে আমি দেখিনি। তাদের এক প্রকার হল, এমন মহিলারা যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ। তারা পর পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে।[৩১৫]

চক্ষু অবনত করে চলা, লজ্জাস্থান হিফাযত করা ও শালীন পোশাক পরার আদেশের পাশাপাশি ইসলাম মহিলাদের নিষেধ করেছে যে, তারা যেন পর পুরুষের সাথে বিনম্র বা মিষ্টি ও লালিত্যময় সুর মিশ্রিত করে কথা না বলে। কেননা তা অসুস্থ মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মনে কামনা জাগায়।

ইসলাম মদপান (মাদক সেবন) নিষিদ্ধ করেছে। সেই সাথে নিষিদ্ধ করেছে মদের ব্যবসা, মদ তৈরি করা, কাউকে মদ উপহার দেয়া এবং মদকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করাকেও। কেননা এরূপ কাজ মদের সাথে নৈকট্যতা গড়ে তোলে এবং মদের প্রতি মনে ভালবাসা জাগায়। মদ পানের মতো নিষিদ্ধ কাজের সাথে যেন কোনভাবেই সহযোগিতা না করা হয় সে ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

নবী ﷺ মদের ব্যাপারে দশ ব্যক্তির উপর অভিশাপ করেছেন। তারা হলো- মদ উৎপাদনকারী, যে উৎপাদন করায়, মদ পানকারী, আমদানীকারক, যার জন্য আমদানী করা হয়, যে পান

---

[৩১৩] আল-কুর'আন: সূরাহ আন-নূর: ৩০-৩১।

[৩১৪] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল লিবাস, অনুচ্ছেদ: নারীদের শরীরের কোন অংশ খোলা রাখা যাবে, হাদীস নম্বর ৪১০৪, পৃ. ১৭৫৯-১৭৬০।।

[৩১৫] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যীনাত, অনুচ্ছেদ: এমন মহিলা সম্পর্কে যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ; বেগানা পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্টকারী এবং নিজেরাও তাদের দিকে আকৃষ্ট, হাদীস নম্বর ২১২৮, পৃ. ৬২৫।

Dhaka University Institutional Repository

করায়–পরিবেশনকারী, বিক্রয়কারী, মূল্য গ্রহণকারী, এর লভ্যাংশ ভোগকারী, ক্রেতা এবং যার জন্য তা ক্রয় করা হয়– এদের সকলের উপরই অভিশাপ।[৩১৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ε " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .

ইবনু ‘উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: নেশা উদ্রেককারী প্রতিটি বস্তু মদের অন্তর্ভুক্ত এবং নেশা উদ্রেককারী প্রতিটি জিনিস হারাম।[৩১৭]

عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ε يَقُولُ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ " .

‘আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ–কে বলতে শুনেছি: নেশা উদ্রেককারী যে কোন বস্তুই হারাম। যে বস্তুর কয়েক রতি পরিমাণ পান করলে নেশার উদ্রেক হয়, তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম।[৩১৮]

ইসলাম অকারণে মানব হত্যাকে হারাম করেছে। সেই সাথে নিষিদ্ধ করেছে মানব হত্যায় উদ্বুদ্ধ করে এমন সকল কাজকে। যেমন, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্ম-অহমিকা, লোভ-লালসা, ক্রোধ, দাঙ্গা-হাঙ্গমা-বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস, বিদ্রোহ, স্বৈরাচারিতা, মারামারি-হানাহানি, অকারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতিকে। কোন নিরীহ মানুষকে ভীত করা এমনকি কোন মুসলিমের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ এসব মানবাধিকার হরণ করে।

পাঁচ. ইসলাম কোন কিছুকে হারাম করলে তদস্থলে হালাল কাজের একটা পন্থাকে বৈধ করে দেয়। উদ্দেশ্য হল, মানুষ হারাম কাজটি বর্জন করে হালাল কাজটির দ্বারা তার প্রয়োজন মেটাবে। যেমন, ইসলামে ব্যভিচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু বিয়ে বৈধ করা হয়েছে। বিয়ের ব্যাপারে ইসলামে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই বিয়ের সামর্থ রাখে, সে যেন অবশ্যই বিয়ে করে। কেননা এই বিয়ে দৃষ্টিকে অবনত রাখবে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তির (বিয়ের) সামর্থ নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার প্রবৃত্তিকে দমন করে।[৩১৯]

ইসলামে চুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু দারিদ্রতা ও অভাব-অনটন চুরি কর্মে ধাবিত হবার প্রধান কারণ বিবেচিত হওয়ায়, তা স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে ইসলামী সমাজে যাকাত ফরয করা হয়েছে। যাকাত পাবার হকদার কারা তার সুনির্দিষ্ট তালিকা পেশ করে মানবাধিকার সংরক্ষণের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, কুরআন মাজীদে যাকাত বন্টনের খাত ঘোষিত হয়েছে। ধনীর সম্পদে গরীবের ন্যায্য হক রয়েছে সেটাও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে ইসলামে।

---

[৩১৬] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল বুয়ূ‘, ফাসলুস সানী, হাদীস নম্বর ২৭৭৬, পৃ. ৮৪৬।

[৩১৭] *সুনান আবূ দাঊদ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আশরিবা, অনুচ্ছেদ: নেশা উদ্রেককারী জিনিস নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ৩৬৭৯, পৃ. ১৫৯২।

[৩১৮] *সুনান আবূ দাঊদ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আশরিবা, অনুচ্ছেদ: নেশা উদ্রেককারী জিনিস নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ৩৬৮৭, পৃ. ১৫৯৬।

[৩১৯] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সওম, অনুচ্ছেদ: অবিবাহিত ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করলে রোযা রাখবে, হাদীস নম্বর ১৯০৫, পৃ. ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

আর সে সব লোক, যাদের সম্পদে একটা সুনির্দিষ্ট ও জ্ঞাত অধিকার আছে, অভাবগ্রস্ত (প্রার্থী) ও বঞ্চিতদের।[৩২০]

যাকাতের অর্থ গরীবের অভাব মোচনে যথেষ্ট না হলে এজন্য সমাজের প্রতিটি স্থানের ধনীদের কর্তব্য হবে স্থানীয়ভাবে দরিদ্র লোকদের অভাব মোচন করে তার মানবাধিকার সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকার ধনীদের এরূপ কাজ করতে বাধ্য করবে। এতেও যথেষ্ট না হলে ধনীদের দায়িত্ব হবে অসহায় গরীবদের জীবন বাঁচানোর পরিমাণ খাদ্য-পানীয়, প্রয়োজনীয় পোশাক, রোদ, বৃষ্টি ও পথচারীর দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার মত বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া। মহান আল্লাহ্র বাণী:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ..

এবং দাও নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের হক।[৩২১]

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً

তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর উত্তম ব্যবহার করো পিতা-মাতার সাথে, এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, নিঃস্ব পথিক ও তোমাদের ডান হাতের মালিকানাধীন (অধীনস্থ) দাস-দাসীর সাথেও।[৩২২]

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ

(কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের জিজ্ঞাসা করা হবে), কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেল? তারা (জাহান্নামীরা) বলবে, আমরা তো মুসল্লী ছিলাম না এবং আমরা মিসকীনদের খাদ্য খাওয়াতাম না।[৩২৩]

উমার (রাযি.) তাঁর শাসনামলে দুর্ভিক্ষের সময় চোরের হাতকাটা আইন মুলতবি ঘোষণা করেছিলেন। কেননা, দুর্ভিক্ষ ও প্রচণ্ড অভাব-অনটনকালে কে অভাবের কারণে, আর কে প্রয়োজন ছাড়াই চুরি করেছে তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। এরূপ সংশয়পূর্ণ অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে কে অপরাধী তা নির্ণয় করা কঠিন বিধায় সঠিক বিচার করা অসম্ভব হয়ে যায় এবং মানবাধিকার সংরক্ষণও অসম্ভব হয়।

এক বর্ণনায় রয়েছে, একদা হাতিব ইবনু আবূ বালতায়ার ক্রীতদাসরা মুযায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তির উট চুরি করে। অতঃপর তাদেরকে উমারের কাছে উপস্থিত করা হলে তারা অপরাধ স্বীকার করে। হাতিব পুত্র আবদুর রহমানকে ডেকে এনে বলা হলো, হাতিবের ক্রীতদাসরা মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তির উট চুরি করেছে এবং তারা তা স্বীকারও করছে। উমার (রাযি.) বললেন: 'হে কাসীর ইবনুস্ সালত! এদের হাত কাটো।' কিন্তু পরে তিনি তাদের এই চুরির আসল কারণ জানতে পেরে বললেন: আল্লাহ্র শপথ! আমি আগে কেন জানতে পারিনি, তোমরা এই দাসদের দিয়ে কাজ করাতে অথচ তাদেরকে খাবার না

[৩২০] আল-কুরআন: সূরাহ আল-মা'আরিজ, ৭০/২৪-২৫।
[৩২১] আল-কুরআন: সূরাহ বনী ইসরাইল, ১৭/২৬।
[৩২২] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নিসা, ৪/৩৬।
[৩২৩] আল-কুরআন: সূরাহ আল-মুদ্দাস্সির, ৭৪/৪২-৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে ক্ষুধায় কষ্ট দিতে। তারা যদি এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্‌র হারাম করা জিনিসও খায়, তথাপি তা তাদের জন্য হালাল হয়ে যায়। অতঃপর তিনি মুযায়নাদের উটের দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে তাদেরকে বিদায় জানান।[৩২৪]

ছয়. মহান আল্লাহ্‌ যেসব ইবাদত ফরয করেছেন, তা মানুষের মনকে পবিত্র ও আত্মশুদ্ধিকরণে এবং অপরাধ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে জড়িত হওয়া থেকে রক্ষায় বিরাট ভূমিকা রাখে। যেমন, সলাত ঈমানদারকে যাবতীয় পাপ ও নির্লজ্জ কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট, যদি তা গভীর মনোযোগ, আল্লাহ্‌ভীতি, আনুগত্য ও সজাগ মনে যথারীতি আদায় করা হয়। সিয়ামও রোযাদারকে লালসা ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত রাখে। একইভাবে হজ্জও হাজীদেরকে ঝগড়া-ফাসাদ ও গর্হিত কাজ পরিহারের শিক্ষা দেয়। সুতরাং ইসলামের ফরয ইবাদতসমূহ মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে অত্যন্ত সহায়ক ও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে তৎপর।

সাত. ইসলাম নির্দেশিত সংশোধন পদ্ধতির পরিপূর্ণ প্রয়োগ ও কার্যকারিতা সত্ত্বেও যদি মানুষ সংশোধিত না হয়, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাগুলো লঙ্ঘন করে, মানুষের অধিকার হরণ থেকে বিরত না থাকে, জুল্‌ম ও অন্যায় পরিহার না করে, মনে আল্লাহ্‌ভীতি না থাকে, কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই অপরাধ করে, এমতাবস্থায় তার অপরাধের শাস্তি পাওয়া একান্তই অপরিহার্য। তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামের বিভিন্ন দণ্ডবিধি কোন না কোনভাবে মানবাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ দণ্ডবিধি বা নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহ অপরাধ প্রতিরোধক। যদি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায়, তা মানবাধিকার সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইসলামী শরীয়তের বিধানের প্রতি যথাযথ ঈমান ও তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথকে রুদ্ধ করে দেয়, অপরাধের কারণ ও উৎসকে বিদূরিত ও নির্মূল করে দেয়। ফলে সমাজে সংহতি-শান্তি বিরাজমান থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের তুলনায় ইসলামী সমাজে অপরাধের পরিমাণ নিতান্তই কম হওয়ার মূলে নিহিত প্রকৃত তত্ত্ব আমাদের সামনে এভাবেই উদ্‌ঘাটিত হয়।[৩২৫]

---

[৩২৪] *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৪ থেকে উদ্ধৃত।

[৩২৫] *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৫-১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

[৩]. চুরির হদ্দ

সাধারণত অন্যের সম্পদ গোপনে নিয়ে যাওয়াকে চুরি বলা হয়। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- কোন সাবালক ও সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন লোক কর্তৃক অপরের মালিকানাভুক্ত নিসাব পরিমাণ বা তার সমমূল্যের মাল সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে নিয়ে নেয়াকে চুরি বলে।[৩২৬]

ধন-সম্পদ সুরক্ষার অধিকার হলো মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এ অধিকার যেসব পন্থায় লঙ্ঘিত হয় চুরি সেসবের একটি। যেখানে সম্পদ রক্ষার অধিকার ক্ষুন্ন সেখানে মানুষের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার অধিকারও বিপন্ন। একটি সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে চুরি অত্যন্ত মারাত্মক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কর্ম। তাই ধন-সম্পদ সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন রোধে ইসলামে চুরিকে নিষিদ্ধ করেছে এবং এজন্য কঠোর শাস্তির বিধানও দিয়েছে। যাতে অপরাধী শাস্তি ভোগ করে পুনরায় অনুরূপ অপরাধ করা থেকে এবং জনতা শাস্তির কাঠিন্যতা প্রত্যক্ষ করে চুরি কর্ম থেকে দূরে থাকে। এরূপ বিধান কার্যকরে নিঃসন্দেহে মানুষের ধন-সম্পদ সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘনের মাত্রা একবারে কিংবা বহুলাংশে কমে আসবে।

(ক) চুরির হদ্দ প্রয়োগের শর্তাবলী- চোরের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি, মালের মালিকের সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহ, চুরিকৃত মালের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ, চুরির স্থানের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী

চুরি করলেই হাত কেটে দেয়া হবে বিষয়টি এমন নয়; বরং এজন্য কিছু শর্ত পূরণ হতে হবে। শর্তগুলো পূরণ হলেই বিচারক চোরের হাত কাটার সিদ্ধান্ত দিবেন, অন্যথায় নয়। চুরির হদ্দ প্রয়োগের শতাবর্লী চুরি সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। তা হলো: চোর, সম্পদের মালিক, চুরিকৃত মাল এবং চুরির স্থান। এগুলোর প্রত্যেকটির সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু শর্ত রয়েছে। যদি সে শর্তগুলো পাওয়া যায় তবেই হদ্দের বিধান কার্যকর হবে।

চোরের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ

চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাটতে হলে চোরের মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পেতে হবে:

১. চোর মুসলিম হওয়া বা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হওয়া।

২. চোর প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ জ্ঞানসম্পন হওয়া।

৩. চুরিকৃত মালে চোরের কোনরূপ মালিকানা না থাকা।

৪. কারো সম্পদ জেনেশুনে তার সম্মতি ছাড়া হস্তগত করা। কিন্তু কোন মালকে পরিত্যক্ত মনে করে হস্তগত করলে তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে না।

৫. অনন্যোপায় হয়ে চুরি করলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। যেমন- দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার কারণে বাধ্য হয়ে চুরি করা। কিন্তু লোভ-লালসায় পড়ে চুরি করলে হদ্দ কার্যকর হবে।

৬. ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি করা। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত চুরি বা যদি জবরদস্তিমূলক চুরি করানো হয়- তা প্রমাণিত হলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেউ যদি কারো মাল ব্যবহার করে পরে ফিরিয়ে দেয়া, হাস্যচ্ছলে বা শুধুমাত্র মালিককে জানানোর জন্য কিংবা এটা ভেবে হস্তগত করল যে, মালিক অসন্তুষ্ট হবে না– এরূপ ক্ষেত্রে তার কথা সঠিক প্রমাণিত হলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

---

[৩২৬] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২৪, পৃ. ২৯২।

Dhaka University Institutional Repository

৭. চোর যদি জানে যে, চুরির করা নিষিদ্ধ তাহলে তার উপর হদ্দ কায়িম হবে। এটা শাফিঈগণের অভিমত। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে চুরি নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, চুরি প্রমাণিত হলে হদ্দ কার্যকর হবে।

৮. চোর ও মালিক পরস্পর রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় (পিতৃত্বের সম্পর্ক) হলে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন- বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে প্রভৃতি। সুতরাং বাবা যদি তার সন্তানের মাল চুরি করে তাহলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কিন্ত এরূপ রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় ছাড়া অন্যান্য আত্মীয় (যেমন ভাইবোন, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফী, মামা-মামী, খালা-খালু বা তাদের ছেলেমেয়ে, দুধ মা ও ভাইবোন, সৎ পিতামাতা, শ্বাশুড়-শ্বাশুড়ি ও স্ত্রীর অপর ঘরের ছেলেমেয়ে প্রভৃতি) এক অপরের মাল চুরি করলে অধিকাংশ ইমামের মতে হাত কাটা হবে। তবে হানাফীগণের মতে, রক্তসম্পর্কীয় মাহ্‌রাম আত্মীয়-স্বজন (যেমন- ভাই, বোন, চাচা, মামা, ফুফী, খালা ইত্যাদি) একে অপর থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। তবে রক্তসম্পর্কীয় গাইরে মাহ্‌রাম আত্মীয়-স্বজনরা (যেমন- চাচাতো ফুফাতো ও মামাতো ভাইবোন ইত্যাদি) একে অপর থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মাল চুরি করলে হদ্দ প্রযোগ করা যাবে না, যদি তারা একত্রে থাকে। আর তারা একত্রে না থাকলে বা একত্রে থাকলেও নিজেদের মাল একে অপর থেকে দূরে সরিয়ে নিজেদের একান্ত হিফাযতে রাখলে, তাহলেও অধিকাংশ ইমামের মতে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে মালিকী ও শাফিঈগণের মতে, এমতাবস্থায় হদ্দ কার্যকর হবে। আর রক্তসম্পর্কীয় নয় এমন মাহরাম আত্মীয় যেমন দুধ মা ও বোন চুরি করলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা ও না করা উভয় মতই হানাফী মাযহাবে বিদ্যমান।

৯. যদি একটি চুরিতে একাধিক চোর অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই সেই চুরিকৃত মাল থেকে নিসাব পরিমাণ বা তার অধিক মাল পায়, তবে সকলেরই হাত কাটা হবে। প্রাপ্ত মাল নিসাব পরিমাণ না হলে তা'যীরের শাস্তি দেয়া হবে। আর এ ধরনের চুরিকর্ম যদি এরূপ হয় যে, সকলে একসাথে চুরি করতে গিয়েছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ চুরি কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে আর কেউ সরাসরি অংশগ্রহণ না করে চুরিতে সহযোগিতা করেছে যেমন- চুরিকৃত মাল কোথায় রয়েছে তা দেখিয়ে দেয়া, লোকদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়া, ভেতর থেকে বেরকৃত মাল অন্যত্র সরানো ইত্যাদি তাহলে যারা সরাসরি চুরিতে অংশগ্রহণ করেছে তাদের উপর হদ্দ কার্যকর হবে আর চুরিতে সহযোগিতাকারীদের তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে।

মালের মালিকের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ

চোরের উপর হদ্দ কার্যকর করতে হলে যার মাল চুরি হয়েছে তার মধ্যে কিছু শর্ত থাকতে হবে। যেমন:

১. চুরিকৃত মালের মালিক জানা বা বিদ্যমান থাকতে হবে। কে চুরিকৃত মালের মালিক তা জানা না গেলে বা পরিত্যক্ত হলে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, মালিক উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত চোরকে জেলখানায় বন্দী করে রাখা যাবে।

২. চুরিকৃত মালের মালিক মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক হওয়া।

৩. মালের যথাযথ মালিক বা যামিনদারের সম্পদ থেকে চুরি হওয়া। তাই কেউ যদি অন্য কোন চোরের চুরিকৃত মাল চুরি করে, এজন্য তাকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

চুরিকৃত মালের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ

১. চুরিকৃত বস্তু মাল হতে হবে। ইমাম মালিক এর মতে, যদি কোন ঘরে সংরক্ষিত অবস্থা থেকে শিশু চুরি করা হয়, তাতেও হদ্দ কার্যকর হবে।

২. চুরিকৃত মাল তুচ্ছ বস্তু না হওয়া। অর্থাৎ যে বস্তু লোকেরা সাধারণত গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করে না। (যেমন- মাটি, ঘাস, লাকড়ি প্রভৃতি) এ ধরনের মাল চুরি করলে তাতে হদ্দ কার্যকর হবে না। তবে এসব মালকে শিল্পজাত করে মূল্যবান সামগ্রীতে পরিণত করা হলে তাতে হদ্দ প্রয়োগ হবে। তবে মালিকীগণ এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে, মাল তুচ্ছ বা গুরুত্বপূর্ণ যেমনই হোক না কেন, নিসাব পরিমাণ ও সংরক্ষিত অবস্থায় থাকলে তা চুরি করা হলে তাতে হদ্দ প্রযোজ্য হবে।

৩. চুরিকৃত বস্তু মূল্যবান হতে হবে অর্থাৎ তার আর্থিক মূল্য থাকতে হবে। তাই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যে জিনিসের কোন মূল্য নেই (যেমন মাদকদ্রব্য, শুকর, বাদ্যযন্ত্র, অশ্লীল বই প্রভৃতি; এগুলো নষ্ট করে ফেলার হুকুম রয়েছে) কেউ তা চুরি করলে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৩২৭]

৪. সাধারণভাবে সকলের জন্য ব্যবহার করা বৈধ এমন জিনিস চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। যেমন- আগুন, পানি, ঘাস ইত্যাদি। যদি তা কারো অধীনে সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় চুরি করা হয় এবং তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়, তাতে হদ্দ প্রয়োগের ব্যাপারে আলিমগণের মতভেদ আছে।

৫. চুরিকৃত মাল নিরাপদ সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করা। সুতরাং অযত্নে বা অসংরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা জিনিস কেউ চুরি করলে তাতে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

৬. চুরিকৃত মাল সংরক্ষণযোগ্য হতে হবে। তা অসংরক্ষণযোগ্য বা দ্রুত পচনশীল দ্রব্য হলে হদ্দ কার্যকর হবে না; বরং এজন্য তা'যীরের শাস্তি দেয়া হবে।[৩২৮] গাছে ঝুলন্ত ফল চুরি করলে তাতেও হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। তবে আড়তে সংরক্ষিত ফল ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে তা চুরি করলে হদ্দ কার্যকর হবে। ভালোভাবে না শুকালে ও তা সংরক্ষণের উপযোগী না হলে এবং সহজেই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা চুরি করলেও হদ্দ প্রযোজ্য হবে না।

৭. চুরিকৃত মাল সম্পূর্ণভাবে চোরের দখলে যেতে হবে এবং মাল স্থানান্তরযোগ্য হতে হবে। কেননা, যে মাল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেয়া যায় না, তাকে চুরি গণ্য করা হয় না।

৮. চুরিকৃত মাল মালিকের অনুমতি ও অবগতি ছাড়া গোপনে পূর্ণাঙ্গরূপে হস্তগত করা। পূর্ণাঙ্গরূপে এভাবে যে, চোর চুরিকৃত মাল সংরক্ষিত স্থান থেকে বের করে আনবে; চুরিকৃত মাল মালিকের দখলভুক্ত হতে হবে এবং তা সম্পূর্ণরূপে চোরের নিজের দখলে আসতে হবে। এ শর্তগুলোর কোন একটি পূর্ণ না হলে পূর্ণাঙ্গ হস্তগত গণ্য হবে না। তাই এজন্য হদ্দের পরিবর্তে তা'যীরের শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

কেউ জোরপূর্বক বা প্রকাশ্যে দ্রুতবেগে কারো থেকে কোন জিনিস ছিনিয়ে নিলে বা বিশ্বাঘাতকতা করে কারো কোন মাল নিয়ে নিলে তাও চুরি গণ্য হবে না। তাই এ অবস্থায় তা'যীরের শাস্তি প্রযোজ্য

---

[৩২৭] হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, ক্রসের চুরিতে হাত কাটা হবে না, যদি তার মূল্য নিসাব পরিমাণও হয়। তবে মালিকীগণ এবং হানাফী ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে, যদি ক্রসের মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় এবং তা যদি কারো হিফাযতে থাকে, তা চুরি করা হলে হাত কাটা হবে। অনুরূপভাবে পাত্রসহ কেউ মদ চুরি করলে এবং পাত্রের মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে হাত কাটা হবে। শাফঈ ইমামগণেল মতে, ক্রস, মূর্তি, বাদ্যযন্ত্র ও মদের পাত্র প্রভৃতি বস্তু ভেঙ্গে ফেলার পর মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে, তাহলে হাত কাটা হবে।

[৩২৮] তবে মালিকীগণ এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে, দ্রুত পচনশীল দ্রব্য নিসাব পরিমাণে চুরি করা হলে তাতেও হদ্দ কার্যকর হবে।

Dhaka University Institutional Repository

হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন বিশ্বাসঘাতক, জোরপূর্বক অপহরণকারী ও প্রকাশ্যে ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না।[৩২৯] তবে পকেটমারে হাত কাটার ব্যাপারে আলিমগণ একমত হয়েছেন।[৩৩০]

৯. চুরিকৃত মাল চুরি করাই চোরের মূল উদ্দেশ্য হতে হবে। চুরিকৃত মাল কোন জিনিসের অনুগামী হয়ে হস্তগত হলে চোরের হাত কাটা যাবে না। যেমন- কেউ একটি কুকুর চুরি করল যার গলায় মূল্যবান রৌপ্য বা স্বর্ণের হার রয়েছে। সেই রৌপ্য বা স্বর্ণের পরিমাণ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাতেও চোরের হাত কাটা যাবে না। কেননা, চোরের মূল উদ্দেশ্য ছিল কুকুর চুরি করা, স্বর্ণ বা রৌপ্য চুরি করা নয়। তবে চোর যদি ঐ স্বর্ণ চুরি করার উদ্দেশ্যেই কুকুরটি চুরি করে থাকে তাহলে তার হাত কাটা যাবে।[৩৩১]

১০. চুরিকৃত মালের মূল্য নিসাব পরিমাণ হতে হবে। নতুবা হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না; বরং তা'যীরের শাস্তি দিবে। চুরির নিসাবের পরিমাণ বলতে কতটুকু বুঝাবে এ ব্যাপারে আইনজ্ঞগণ বিভিন্ন মত পেশ করেছেন:

শাফিঈ আলিমগণের মতে, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ বা তার বেশি পরিমাণ মূল্যের সম্পদ চুরিতে হাত কাটা যাবে।[৩৩২] রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন: বর্মের মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের জিনিস চুরি করলে হাত কাটা হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, 'আয়িশাহ (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, বর্মের মূল্য কত? জবাবে তিনি বললেন, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ।[৩৩৩] তবে এক দীনারের এক চতুর্থাংশের পরিমাণ নিয়ে ইমামগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন, তা হচ্ছে তিন দিরহাম। আর ইবনু আবী লায়লা (রহ.) বলেন, তা পাঁচ দিরহাম।

মালিকী আলিমগণের মতে, চুরির নিসাব তিন দিরহাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং উসমান (রাযি.) উভয়েই তিন দিরহাম মূল্যের বর্ম চুরিতে হাত কেটেছেন।[৩৩৪]

হানাফী আলিমগণের মতে, ন্যূনতম দশ দিরহাম[৩৩৫] অথবা তার সমমূল্যের জিনিস চুরি করলে হদ্দ কার্যকর হবে। কেননা, ইবনু মাসঊদ (রাযি.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক দীনার কিংবা দশ দিরহামের কম (মূল্যের জিনিস চুরিতে) হাত কাটবে না।[৩৩৬]

উল্লেখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, বর্মের মূল্য নির্ণয়ের ভিন্নতার কারণে চুরিকৃত মালের নিসাবের ক্ষেত্রে মতভেদ তৈরি হয়েছে। আর বর্মের বিভিন্ন মান বা কোয়ালিটির উপর মূল্য কমবেশি

---

[৩২৯] *জামে আত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: বিশ্বাসঘাতক, অপহরণকারী ও প্রকাশ্যে ছিনতাইকারী প্রসঙ্গে, হাদীস নম্বর ১৪৪৮, পৃ. ৪৬৯।

[৩৩০] *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

[৩৩১] *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

[৩৩২] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: চুরি হদ্দ এবং তার নিসাব, হাদীস নম্বর ১৬৮৪-১৬৮৫, পৃ. ৪৯৪।

[৩৩৩] ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, (দারুল হাদীস, কাহিরা, প্রকাশকাল ২০০৮), ৮ম খণ্ড, কিতাবুস সিরকাতি (চুরি অধ্যায়), অনুচ্ছেদ: ইখতিলাফু নাকিলীনা ফি সামানিল মিজান্নি.., হাদীস নম্বর ১৭১৭১, পৃ. ৫৭৮।

[৩৩৪] ইবনু উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিরহাম মূল্যের বর্মের চুরিতে হাত কেটেছেন। (*সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্‌র বাণী: "পুরুষ বা নারী চুরি করলে তাদের হাত কেটে দাও"; কী পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে, হাদীস নম্বর ৬৭৯৫-৯৮, পৃ. ৮১০)

[৩৩৫] দিরহাম: রৌপ্যের তৈরি মুদ্রা বিশেষ। বর্তমানে তা ২.৯৭৫ গ্রামের সমান।

[৩৩৬] *জামে আত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: কী পরিমাণ চুরিতে হাত কাটা যাবে, হাদীস নম্বর ১৪৪৬, পৃ. ৪৬৭-৪৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া স্বাভাবিক। হানাফী আলিমগণের মতে, যেহেতু বর্মটির মূল্য নির্ধারণ নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যেও বিভিন্ন মত রয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণের বর্ণনা সম্বলিত বর্ণনাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা, কম পরিমাণের মধ্যে সন্দেহের সুযোগ আছে। আর সন্দেহযুক্ত অবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা যায় না।

বর্তমানে দশ দিরহামের সমপরিমাণ প্রায় ২৯.৭৫ গ্রাম রৌপ্য অথবা তার সমমূল্যের কোন বস্তু 'চুরির নিসাব' হিসেবে গণ্য হবে। এর কম মূল্যের জিনিস চুরি করলে হদ্দের পরিবর্তে তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে।

চুরির স্থানের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী

চুরি হতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রে। সুতরাং কোন কাফির কিংবা বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে এমন দেশে চুরি করলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কারণ সেখানে ইসলামের কর্তৃত্ব নেই।[৩৩৭]

(খ) চুরি প্রমাণ করার মাধ্যম

দু'টি মাধ্যমে চুরি সাব্যস্ত করা হয়-

১. সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য লাগবে। সাক্ষী দু'জনের কম হলে বা একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও অন্যজন শ্রোতা হলে, কিংবা একজন পুরুষ সাক্ষী ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হলে– এরূপ অবস্থায় অভিযুক্তের উপর চুরির হদ্দ কার্যকর হবে না।

২. মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। অধিকাংশ আলিমের মতে, বিচারকের সামনে একবার স্বীকারোক্তি দিলেই চলবে। আর ইমাম আবূ ইউসূফ ও হাম্বলী আলিমগণের মতে, দু'বার স্বীকারোক্তি দিতে হবে।

(গ) চুরির শাস্তি, বারবার চুরি করলে তার বিধান, হাত-পা কাটার পদ্ধতি, চুরির তা'যীরী শাস্তি, চুরিকৃত মাল ফেরত দান বা চোরের জন্য জরিমানা ধার্য প্রসঙ্গ

চুরির শাস্তি

চুরির শাস্তি হচ্ছে হাত কাটা। এ শাস্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। আল্লাহ্ বলেন:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী।[৩৩৮]

'আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ খুতবায় দাঁড়িয়ে বললেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ε سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মাত ছিল তারা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েছিল এ কারণে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্মানিত চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করত তখন তারা তার হাত কেটে দিত। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মাদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে

---

[৩৩৭] *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

[৩৩৮] আল-কুরআন: সূরাহ আল-মায়িদা, ৫/৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর হাত কেটে দিবে।[৩৩৯] অতএব, চুরি প্রমাণিত হলে তার অপরাধের শাস্তি হলো- হাত কেটে দেয়া। আর হদ্দ ওয়াজিব না হলে তার থেকে জরিমানা আদায় করা।[৩৪০]

বারবার চুরি করলে তার বিধান

প্রথমবার চুরি করলে ডান হাত কাটতে হবে- এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত। আর দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কাটতে হবে।[৩৪১] কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থবার চুরি করলে কী শাস্তি দেয়া হবে– এ নিয়ে ইমামগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফী ও হাম্বলী আলিমগণের মতে, তৃতীয় ও চতুর্থবার চুরি করলে হাত ও পা কাটা যাবে না; বরং তা'যীরের আওতায় শাস্তি দিতে হবে। যেমন- কারাগারে আটকে রাখা বা অন্য কোন শাস্তি। প্রয়োজনে তাওবা না করা পর্যন্ত বন্দী রাখতে হবে। কেননা, হদ্দের উদ্দেশ্য কাউকে ধ্বংস করা নয়; বরং অপরাধের প্রতি ভীতি জাগানো। মালিকী ও শাফিঈ আলিমগণের মতে, তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত, আর চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কাটতে হবে। যদি এরপরও চুরি করে, তাহলে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দিবে। হাদীসে আছে- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যখন চোর চুরি করে, তার হাত কেটে দাও। যদি আবার চুরি করে তাহলে পা কেটে দাও। যদি আবার চুরি করে, তাহলে তার হাত কেটে দাও। যদি এরপরও চুরি করে তাহলে তার পা কেটে দাও।[৩৪২]

হাত-পা কাটার পদ্ধতি

অধিকাংশ ইমামের মতে, বিচারক চোরের হাত কাটার রায় দিলে তার হাত কাটার দায়িত্ব প্রশাসন বিভাগের। হাত কাটার পরিমাণ হলো- কব্জির জোড়া। চার মাযহাবের ইমামগণের মতে, প্রথমবারে চুরি করলে ডান হাতের কব্জি থেকে হাত কাটতে হবে। আর পা কাটার নিয়ম হলো- পা গোড়ালি থেকে কাটা হবে। অবশ্য কারো মতে, পায়ের গোড়ালি বরাবর ঠিক রেখে অবশিষ্ট অংশ কাটবে, যেন সে পায়ের উপর ভর করে চলাচল করতে পারে।

হাত কাটার কাজটি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে করাতে হবে। কাটার কাজটি যথাসম্ভব দ্রুত ও সহজভাবে সেরে ফেলতে হবে। অপরাধী যেন শারীরিকভাবে কোন ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। হাত বা পা কেটে ফেলার সাথে সাথে বেন্ডিজ করে দিতে হবে, যাতে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়।

চুরির তা'যীরী শাস্তি ও চুরিকৃত জিনিস ফেরত দেয়া বা চোরের জন্য জরিমানা ধার্য প্রসঙ্গে

চুরি সাব্যস্ত হওয়ার কোন শর্তে যদি ত্রুটি বা সন্দেহ পরিলক্ষিত হয় অথবা কোন কারণে যদি চোরের উপর হদ্দ প্রয়োগ অসম্ভব হয়, তাহলে চোর আদালতের বিবেচনা অনুযায়ী তা'যীরী শাস্তি পাবে।

---

[৩৩৯] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: শাসকের কাছে মামলা দায়ের করার পর হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করা অনুচিত, হাদীস নম্বর ৬৭৮৮, পৃ. ৮১০।

[৩৪০] *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬।

[৩৪১] আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চোর চুরি করলে হাত কেটে দাও। এরপর আবার চুরি করলে তার পা কেটে দাও, ..। [ইমাম 'আলী ইবনু উমার আদ্-দারাকুতনী, *সুনান আদ-দারাকুতনী*, (নাশরুস সুন্নাহ, মুলতান-পাকিস্তান), ৩য় খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ ওয়াদ দিয়াত, হাদীস নম্বর ৩৩৫৯, পৃ. ২১৪]

[৩৪২] ইমাম 'আলী ইবনু উমার আদ্-দারাকুতনী, *সুনান আদ-দারাকুতনী*, (নাশরুস সুন্নাহ, মুলতান-পাকিস্তান), ৩য় খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ ওয়াদ দিয়াত, হাদীস নম্বর ৩৩৫৯, পৃ. ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

হাত কাটার নির্দেশের সময় চুরিকৃত মাল যদি বহাল তবিয়তে পাওয়া যায় তাহলে ঐ মাল মূল মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে। চাই চোর স্বচ্ছল বা গরীব হোক, চুরিকৃত মাল চোরের কাছে থাকুক বা অন্যের কাছে থাকুক। এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত।

বিচারকের কাছে মামলা দায়ের করার আগে যার মাল চুরি হয়েছে সে যদি জরিমানা গ্রহণ করাকে প্রাধান্য দেয় তাহলে হাত কাটা যাবে না। আর যদি হাত কাটার বিষয়টি প্রাধান্য দেয় তাহলে জরিমানা নিবে না। মালিকী আলিমগণের মতে, চোর হাত কাটার সময় মাল ফেরত দিতে সক্ষম হলে জরিমানা দিবে। আর অক্ষম হলে জরিমানা দিবে না। শাফিঈ ও হাম্বলী আলিমগণের মতে, চুরি প্রমাণিত হলে একই সাথে চোরের হাত কাটা এবং জরিমানা দিতে বাধ্য করা হবে। কেননা, হাত কাটার বিধান কার্যকর হবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধে আর জরিমানা দিবে বান্দার হক নষ্ট করার কারণে।

(ঘ) যেসব কারণে চুরির হদ্দ রহিত হয়

চুরির হদ্দ রহিত হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১. যার মাল চুরি হয়েছে তার পক্ষ থেকে চোরের স্বীকারোক্তিকে মিথ্যা প্রমাণ করা হলে।

২. যার মাল চুরি হয়েছে তার পক্ষ থেকে সাক্ষীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হলে।

৩. বিচারকের কাছে মামলা দায়েরের পূর্বে চোর যদি চুরিকৃত মাল প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেয়। এক্ষেত্রে চোরকে ক্ষমা করে দিতে অসুবিধা নেই। বিশেষ করে সে যদি পেশাদার ও কুখ্যাত চোর না হয়।

৪. চোরের পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়া। অর্থাৎ সে ভয়ে বা চাপে পড়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছে এরূপ বললে।[৩৪৩]

---

[৩৪৩] *কিতাবুল ফিক্‌হি 'আলা মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪-১৯৩; ইমাম ইবনু রুশ্‌দ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*, (দারুল ফিক্‌র, বৈরুত-লেবানন, প্রকাশকাল ২০০২), ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯৩-৮০৮; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, (দারু আলামিল কুতুব, রিয়াদ, চতুর্থ প্রকাশ ১৯৯৯), খণ্ড ১২, পৃ. ৪১৫-৪৭২; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২৪, পৃ. ২৯২-৩৪৭; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী কর্তৃক ব্যাখ্যাসহ, (দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-লেবানন, প্রথম প্রকাশ: ২০০৩), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫০-৪০৫; *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২২৫; *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৭৮; *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, ২৬৮-২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

[৪]. সশস্ত্র ডাকাতি ও লুণ্ঠনের হদ্দ

সশস্ত্র ডাকাতি ও লুণ্ঠনকে আরবী ভাষায় حرابة বা قطع الطريق বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায়- ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় প্রকাশ্যে কারো উপর চড়াও হওয়াকে ডাকাতি বা লুণ্ঠন বলে।

ইসলামী আইনজ্ঞগণ বলেন: হিরাবাহ হচ্ছে সম্পদ দখলের উদ্দেশ্যে এমন ত্রাস সৃষ্টি করা যার সহায়তা করা সম্ভব হয় না।[৩৪৪] অধিকাংশ আলিমের মতে, কেউ যদি অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য হামলা করে, হামলাকারী অস্ত্র হিসেবে যাই ব্যবহার করুক, তার হাতে লাঠি, বন্দুক, দা- যাই থাকুক না কেন, যা দিয়ে অন্যকে ঘায়েল করা যায়, তাতেই সে মুহারিব (ডাকাত, সন্ত্রাসী) গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে অত্যাচারী আঘাতকারীর সব দণ্ড প্রযুক্ত হবে। এরূপ আক্রমণ শহরে হোক বা গ্রামে, জনপদে হোক বা নির্জন পথে অথবা মাঠে-ময়দানে হোক না কেন তা ডাকাতি বা সন্ত্রাসী গণ্য হবে। সুতরাং সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে- ক. কাউকে হত্যা বা সম্পদ লুণ্ঠন করতে চেয়েছে কিন্তু তা করতে পারেনি; খ. কাউকে হত্যা কিংবা মারধর করেছে; গ. হত্যা বা মারধরের পাশাপাশি সম্পদও লুণ্ঠন করেছে; ঘ. শুধু মাল-সম্পদ লুণ্ঠন করেছে- এ সবই ডাকাতির অন্তর্ভুক্ত।

ডাকাতি অন্যের অধিকার হরণ করে। ডাকাত ডাকাতির মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। ডাকাতের মাধ্যমে যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয় সেজন্য ইসলাম ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে।

(ক). সন্ত্রাস বা ডাকাতির হদ্দ কার্যকরের শর্তাবলী

ডাকাতির হদ্দ প্রয়োগের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তা হলো-

১. ডাকাত মুসলিম হওয়া অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হওয়া।

২.ডাকাত প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন হওয়া।

৩. ডাকাত সশস্ত্র হওয়া। এটা হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের অভিমত। তবে মালিকী ও শাফিঈ ইমামগণ বলেন, ডাকাতির জন্য ডাকাতদের নিজস্ব শক্তি ও অঙ্গ ব্যবহারে সমর্থ হলেই যথেষ্ট (যেমন– লাথি, ঘুষি ইত্যাদি)।

৪. ডাকাত পুরুষ হওয়া, নারী হলে হদ্দ কার্যকর হবে না- এটা হানাফী আলিমগণের অভিমত। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে, যদি কোন মহিলা ডাকাতির কাজে অংশ গ্রহণ করে, তবে তার উপরও হদ্দ কার্যকর করা যাবে।

৫. শাফিঈ আলিমগণের মতে, ডাকাতির কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে হবে। সহযোগী হলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। ইমাম আবূ ইউসূফ এ মত পোষণ করেন। তবে হানাফী, মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে- সহযোগী হলেও হদ্দ কার্যকর হবে।

৭. ডাকাতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ মূল্যবান, কারো মালিকানা বা বৈধ দখলভুক্ত হতে হবে। উক্ত সম্পদ নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে।[৩৪৫] ডাকাত দলের প্রত্যেকের ভাগে নিসাব পরিমাণ সম্পদ না হলে সম্পদ লুঠের জন্য তাদের উপর ডাকাতির হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দিবে।

---

[৩৪৪] *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

[৩৪৫] ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ আল-হানাফী (রহ.) বলেন, ডাকাতির নিসাব চুরির দ্বিগুণ হতে হবে। কেননা, চুরিতে এক হাত বা পা কাটা হয় কিন্তু ডাকাতিতে দুটি অঙ্গই কাটা হয়, তাই এর জন্য বিশ দিরহামের নিসাব নির্ধারণ করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ডাকাতির কাজ ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হতে হবে; তাই অমুসলিম বা অ-ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত ডাকাতির জন্য ডাকাতের উপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

৯. আক্রান্ত ব্যক্তিকে মুসিলম বা যিম্মী হতে হবে। অন্যথায় ডাকাত তা'যীরের আওতায় শাস্তি পাবে।

১০ সম্পদের উপর আক্রান্ত ব্যক্তির যথাযথ মালিকানা থাকতে হবে।

১১. ডাকাত (আক্রান্ত ব্যক্তির) রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় হওয়া যাবে না।

(খ) ডাকাতি সাব্যস্তকরণ, ডাকাতির শাস্তি এবং ডাকাত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শাস্তি

দুটি উপায়ে ডাকাতি প্রমাণ হতে পারে-

১. অভিযুক্ত ডাকাতের স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তির মাধ্যমে।

২. সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা অথবা ডাকাতকর্তৃক আক্রান্ত দলের দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারাও ডাকাতি প্রমাণ করতে হবে।

যে ডাকাত বা ডাকাতদল নিরাপরাধ ও নিরীহ লোকদের উপর হামলা করে, হত্যা করে এবং তাদের ধন-মাল ছিনিয়ে নেয়, তাদের জন্য কঠোরতম শাস্তির কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেন তা দেখে অন্যান্য ডাকাত ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা সমাজে কোন ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করতে সাহসী না হয়। আল্লাহ্ কুরআনে ডাকাতি বা সন্ত্রাসীর শাস্তি সম্পর্কে বলেন:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং দেশে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করে তাদের শাস্তি হলো, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে নির্বাসিত করা হবে। এ অপমান তাদের জন্য দুনিয়ায় আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।[৩৪৬]

সুতরাং ইসলামী শরীয়তে সশস্ত্র ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে চার ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে। যথা-

১. হত্যা করা;

২. শূলবিদ্ধ করা;

৩. হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা; এবং

৪. নির্বাসন।

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত শাস্তি সম্পর্কে হানাফী, শাফিয়ী ও মালিকী আলিমগণ বলেন: ডাকাতির ধরন বুঝে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত শাস্তি কার্যকর করা হবে। ধারাবাহিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে হানাফী আলিমগণ বলেন: যদি ডাকাত ত্রাসের মাধ্যমে শুধু সম্পদ নিয়ে যায়, তাহলে তার তার হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কাটা হবে। আর যদি হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে। ডাকাত যদি সম্পদও নিয়ে যায় এবং হত্যাও করে, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী শাস্তি দিবেন। তিনি চাইলে তার হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবেন তারপর তাকে হত্যা করবেন অথবা শূলে চড়িয়ে মারবেন। আর যদি ইচ্ছা করেন হাত পা না কেটে হত্যা করবেন অথবা শূলে চড়াবেন। আর যদি ডাকাত সম্পদও ছিনিয়ে না নেয় এবং হত্যাও না করে; বরং শুধুমাত্র ভয়ভীতি দেখায়, তাহলে তাকে জেলখানায় বন্দী রাখবেন এবং তা'যীরের আওতায় শাস্তি দিবেন।

---

[৩৪৬] আল-কুরআন: সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫/৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

ডাকাতির উপর্যুক্ত শাস্তি পুরুষ ডাকাতের বেলায় প্রযোজ্য। শূলে চড়ানো বা নির্বাসন দেয়ার শাস্তি মহিলা ডাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মহিলা ডাকাতের শাস্তি হচ্ছে, তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া কিংবা হত্যা করা।[৩৪৭]

শূলবিদ্ধ করার নিয়ম

হানাফী ও মালিকী আলিমগণের মতে, ডাকাতকে জীবিত অবস্থায় শূলে চড়িয়ে শূলবিদ্ধ অবস্থায় বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করতে হবে। হাম্বলী ও শাফিঈ আলিমগণের মতে, প্রথমে হত্যা করতে হবে। তারপর শূলবিদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ্ যেহেতু আয়াতের মধ্যে হত্যার কথা আগে বলেছেন, তারপর শূলবিদ্ধ করার কথা বলেছেন, তাই আয়াতের ইঙ্গিত অনুসারে প্রথমে হত্যা করেই তারপর শূলে চড়াতে হবে। কোন কোন শাফিঈ আলিমগণের মতে, জীবিত অবস্থায় শূলে চড়াতে হবে। তারপর নামিয়ে হত্যা করতে হবে। হানাফী আলিমগণ বলেন, মৃত্যুর পর তাকে শূলবিদ্ধ অবস্থায় তিনদিন রেখে দিবে। হাম্বলী আলিমগণ বলেন, এর সময় নির্ধারিত নয়; শাসক তার সুবিবেচনা অনুযায়ী প্রচারে জন্য যে কয়দিন প্রয়োজন মনে করবেন, ততদিন রাখবেন। মালিকী আলিমগণ বলেন, মৃত দেহ পঁচে দুর্গন্ধ ছড়ানোর আশঙ্কা দেখা দিলে তাকে নামিয়ে ফেলতে হবে।

হাত-পা কাটা ও নির্বাসন করার নিয়ম

ডান হাত কব্জি থেকে আর বাম পা গোড়ালী থেকে কাটতে হবে। হানাফী ও মালিকী আলিমগণ বলেন, আয়াতে নির্বাসন দ্বারা কারাগারে বন্দী করে রাখাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, কারারুদ্ধ ব্যক্তি প্রকারান্তে নির্বাসিত ব্যক্তি।

ডাকাতের জরিমানা

যে মাল ডাকাতি করেছে তা বহাল তবিয়তে থাকলে জরিমানা আদায় করা হবে- এ ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদগণ একমত। আর যদি মাল বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে হানাফী আলিমগণের মতে, জরিমানা দিতে হবে না। অধিকাংশ আলিমের মতে, চুরির মালের মত ডাকাতির ক্ষেত্রেও জরিমানা দিতে হবে।

সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক বা সহযোগীদের শাস্তি

হানাফী, মালিকী ও হাম্বলীসহ অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, যারা ডাকাত ও সন্ত্রাসীর পৃষ্ঠপোষক এবং সহযোগী তাদেরকেও ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের অনুরূপ শাস্তি দিতে হবে। এরূপ করা না হলে দেশে বিশৃঙ্খলার পথ বৃদ্ধি পাবে। আর শাফিঈ আলিমগণ বলেন, পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগীদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না; তবে তা'যীরের আওতায় কারাগারে বন্দী রাখা বা নির্বাসন দণ্ড দেয়া যেতে পারে।

(ঘ) যে কারণে হদ্দ রহিত হয়

১. ডাকাত যদি নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে;

২. আক্রান্ত ব্যক্তি যদি ডাকাতের স্বীকারোক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে;

৩. বিচারকের কাছে মামলা দায়ের হওয়ার পূর্বে বা ধরা পড়ার আগেই ডাকাত তাওবা করলে, ডাকাতিকৃত মাল ফেরত দিলে এবং যাদের মাল ডাকাতি করেছে তারা তাকে ক্ষমা করে দিলে।[৩৪৮]

৪. যদি সাক্ষী সাক্ষ্য-প্রমাণের বিষয়টিকে অস্বীকার করে অথবা সঠিক নয় বলে।[৩৪৯]

---

[৩৪৭] *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

[৩৪৮] *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৯; *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

[৫]. যেনার হদ্দ

মান-ইজ্জত সংরক্ষণ মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। যে সমাজে মানুষের এ অধিকার সংরক্ষিত নয় সেখানে মানবাধিকার লুণ্ঠিত হয়। যে পাপ ও অনৈতিক কাজ মানুষের মান-সম্মান বিনষ্ট করে তা হলো- যেনা ও ধর্ষণ। যেনার শাব্দিক অর্থ পাপকাজ করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- বিশুদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন ছাড়া নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতিতে অবৈধ যৌনমিলনকে যেনা বলা হয়। চাই তা বিবাহিত অবস্থায় হোক বা অবিবাহিত অবস্থায় হোক। জোরপূর্বক হোক বা স্বেচ্ছায়। এটা এমনই অনৈতিক কাজ যা শুধু সমাজকে কলুষিতই করে না; বরং চরমভাবে মানবাধিকারও লঙ্ঘন করে। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা কোন অবৈধ পন্থায় যৌনাচারের লিপ্ত হবে না। সুতরাং তাদের কারো দ্বারা অপরেরর সাথে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া মানে একে অপরের অধিকার ক্ষুন্ন করা। ধর্ষণও নিষিদ্ধ। জোর পূর্বক কারো সতীত্ব ছিনিয়ে নেয়া চরম অন্যায়। যে সমাজে যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে সে সমাজে যেকোন অনৈতিক কাজ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সকল ধর্মেই ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ইসলামী আইনে এর বীভৎস কদর্যতা ও এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً

তোমরা যেনার কাছেও যেয়ো না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও খুবই খারাপ পথ।[৩৫০]

(ক). যেনার শাস্তি, অবিবাহিত ও বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি

ইসলামী আইনে অবস্থাভেদে ব্যভিচারের তিন ধরনের শাস্তির যেকোন একটি বা একাধিক নির্ধারণ করা হয়েছে। তা হলো- ১. বেত্রাঘাত; ২. নির্বাসন; ৩. প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা। শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিবাহিত ব্যভিচারী ও অবিবাহিত ব্যভিচারীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

ব্যভিচারীণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ– তাদের প্রত্যেককে একশোটি করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্র বিধান কার্যকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে।[৩৫১]

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ε " خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْىٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ " .

উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: তোমরা আমার থেকে গ্রহণ করো। তোমরা আমার থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ্ তাদের জন্য বিধান দিয়েছেন: বিবাহিত

---

[৩৪৯] *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০৯-৮১৭; *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১২, পৃ.৪৭৩-৪৯২; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১৭, পৃ. ১৫৩-১৬৪; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০৬-৪২৭; *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৯; *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৯৬।

[৩৫০] আল-কুরআন: সূরাহ আল-ইসরা, ১৭/৩২।

[৩৫১] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নূর, ২৪/২।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ ও বিবাহিতা নারী অপরাধী প্রমাণিত হলে, তাদের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। আর অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারীর শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন।[৩৫২]

উল্লেখ্য, অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারীণীকে বেত্রাঘাতের পাশাপাশি এক বছরের নির্বাসনের শাস্তি দেয়া হবে কিনা এ সম্পর্কে ইমামগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন:

হানাফী আলিমগণ বলেন: ব্যভিচারী– নারী হোক বা পুরুষ হোক– তাকে এক বছরের নির্বাসনের শাস্তি দেয়া ওয়াজিব নয়। রাষ্ট্রের স্বার্থে কল্যাণকর মনে করলে বিচারক হদ্দ হিসেবে নয়; বরং তা'যীরের শাস্তি হিসেবে এ শাস্তি দিতে পারেন। কেননা, কুরআনে কেবল বেত্রাঘাতের কথাই উল্লেখ আছে।

শাফিঈ ও হাম্বলী আলিমগণ বলেন: ব্যভিচারী– পুরুষ হোক অথবা নারী হোক– তাকে অবশ্যই এক বছরের জন্য নির্বাসন (কারাদণ্ড) দিতে হবে। ইতোপূর্বে বর্ণিত উবাদাহ বিন সামিতের হাদীসের ভিত্তিতে তারা এ মত দিয়েছেন। মালিকী আলিমগণের মতে, শুধু পুরুষ ব্যভিচারীকে একশো বেত্রাঘাতের পাশাপাশি এক বছরের জন্য নির্বাসনের দণ্ড দিতে হবে। অর্থাৎ জেলখানায় বন্দী রাখতে হবে।

আর ব্যভিচারী পুরুষ বা নারী বিবাহিত হলে তার শাস্তি হলো প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা- এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত।[৩৫৩] এ শাস্তির বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা ও কাজ উভয় দিক থেকে প্রমাণিত। ইতোপূর্বে উল্লেখিত উবাদাহ বিন সামিত (রাযি.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে-

الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْىٌ بِالْحِجَارَةِ .

বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারী অপরাধী প্রমাণিত হলে, তাদের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা।[৩৫৪]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মালিকের স্ত্রীর সাথে জনৈক মজুরের যেনার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উনাইস আল-আসলামী (রাযি.)-কে হুকুম দিয়েছিলেন যে, হে উনাইস! আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাবে। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম করবে। উনাইস (রাযি.) পরদিন সকালে মহিলাটির কাছে গেলে সে অপরাধ স্বীকার করে নেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশে তাকে রজম করা হয়।[৩৫৫]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً، - قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ - أَتَتِ النَّبِيَّ ε فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى . فَدَعَا النَّبِيُّ ε وَلِيَّهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ε " أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئْ بِهَا " . فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ε فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلَّوْا عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا "

---

[৩৫২] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, বাবু ফী রাজমি, হাদীস নম্বর ৪৪১৫, পৃ. ১৮৮৮।

[৩৫৩] ইসলামে বিবাহিত নারী ও পুরুষের ব্যভিচারের শাস্তি স্বরূপ রজম করার যে বিধান দেয়া হয়েছে, তা কিন্তু নতুনভাবে প্রবর্তন করা হয়নি; বরং তাওরাতেও এ শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে। তাওরাতের যে বিধানগুলো রহিত হয়নি, সেগুলো পরবর্তীতে অবতীর্ণ ইঞ্জিলের বিধান হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। তাওরাতের অনেক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও আজকের তাওরাতে সেই রজমের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। যদিও বর্তমানে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা এ বিধান কার্যকর করে না।

[৩৫৪] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: রজম সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ৪৪১৫, পৃ. ১৮৮৮।

[৩৫৫] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুশ শুরূত, অনুচ্ছেদ: হুদূদের ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত বৈধ নয়, হাদীস নম্বর ২৭২৪-২৭২৫, পৃ. ৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযি.) হতে বর্ণিত। একদা জুহাইনাহ গোত্রের এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, সে যেনা করেছে এবং অন্তঃসত্তা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার অভিভাবককে ডেকে এনে বলেন: এর সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। আর যখন সে সন্তান প্রসব করবে, তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। অতঃপর সে সন্তান প্রসব করলে অভিভাবক তাকে নিয়ে এলো। নবী ﷺ-এর আদেশে তাকে কাপড় দিয়ে বেঁধে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়। অতঃপর তিনি সাহাবীদের আদেশ দিলেন তার জানাযার সলাত পড়তে। 'উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তার জানাযার সলাত পড়বেন? সে তো যেনা করেছে! তিনি বললেন: যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! সে এরূপ তাওবাহ করেছে, যা মাদীনাবাসীদের সত্তরজনের মধ্যে বন্টন করে দিলেও তাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে। তুমি কি তার চাইতে উত্তম কোন ব্যক্তিকে পাবে যে নিজের সত্তাকে উৎসর্গ করে দিলো? [৩৫৬]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ε لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ " أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ " . قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ " بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلاَنٍ " . قَالَ نَعَمْ . فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ .

ইবনু আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাঈয ইবনু মালিককে ডেকে বললেন: তোমার সম্বন্ধে যে সংবাদ আমার কানে পৌঁছেছে তা কী সত্য? সে বললো, আমার সম্বন্ধে আপনার নিকট কীরূপ সংবাদ পৌঁছেছে? তিনি বললেন: তুমি নাকি অমুক গোত্রের জনৈক বাঁদীর সঙ্গে যেনা করেছ? সে বললো, হাঁ। অতঃপর সে চারবার একথার স্বীকারোক্তি করে। সুতরাং তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার আদেশ দেন। অতঃপর তাকে পাথর মারা হয়।[৩৫৭]

মুহাম্মাদ ﷺ মদীনায় অমুসলিমদেরকেও তাদের ধর্মানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করতেন। যেমন- একবার জনৈক ইয়াহুদী তাদের এক জোড়া নারী-পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের ধর্মানুযায়ী রজমের শাস্তি প্রয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ε فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ε " مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الزِّنَا " . فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ . فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ . فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ . فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ε فَرُجِمَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ .

ইবনু 'উমার (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইয়াহুদীরা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, তাদের একজোড়া নারী-পুরুষ যেনা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন: তাওরাতে তোমরা যেনা সম্বন্ধে কী হুকুম পেয়েছো? তারা বললো, আমরা তো অপমান করি এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হয়। একথা শুনে 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সালাম (রাযি.) বলেন, তোমরা মিথ্যা বলেছো। নিশ্চয়ই তাতে রজম করার হুকুম বিদ্যমান। অতঃপর তারা তাওরাত কিতাব নিয়ে আসে এবং তা খোলে। তাদের একজন তার একটি হাত রজমের আয়াতের উপর রেখে দিয়ে এর পূর্বাপর পড়তে থাকে। 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সালাম (রাযি.) তাকে হাত উঠিয়ে নিতে আদেশ দেন। সে হাত উঠিয়ে নিতেই দেখা গেলো যে, তাতে রজমের

---

[৩৫৬] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: নবী ﷺ জুহাইনাহ গোত্রের যে মহিলাকে পাথর মারার আদেশ দিয়েছিলেন, হা/৪৪৪০, পৃ. ১৮৯৮-১৮৯৯।

[৩৫৭] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: মাঈয ইবনু মালিককে রজম করার ঘটনা হাদীস, নম্বর ৪৪২৫, ১৮৯২-১৮৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

আয়াত রয়েছে। তারা বললো, হে মুহাম্মাদ! তিনি সত্যিই বলেছেন, নিশ্চয়ই তাতে রজমের আয়াত আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আদেশে দু'জনকেই রজম করা হলো।[৩৫৮]

উল্লেখ্য, রজমের পূর্বে বেত্রাঘাত করবে কি না– এ ব্যাপারে আলিমগণের কিছুটা মতভেদ আছে। অবশ্য চার মাযহাবের আলিমগণের সর্বসম্মত অভিমত হলো, বিবাহিতদেরকে শুধু রজম করতে হবে; বেত্রাঘাত নয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও চার খলীফার যুগে বিবাহিতদের যেনার কিছু ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু কোন ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বা চার খলীফা রজমের পূর্বে বেত্রাঘাতের হুকুম দিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(খ) যেনার হদ্দ কার্যকর করার শর্তাবলি

ব্যভিচারে অভিযুক্ত নারী-পুরুষকে

১. প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।

২. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন (জ্ঞানবান) হতে হবে।

সুতরাং ব্যভিচারে অভিযুক্ত কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা পাগল হলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ায় আদালত তা'যীরের আওতায় শাস্তি দিতে পারবে। কিন্তু উভয়ের কোন একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হলে তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে।

৩. মুসলিম হতে হবে। মালিকী আলিমগণের মতে, কোন অমুসলিম যদি মুসলিম নারীর সাথে তার সম্মতিতে যেনা করে, তাহলে অমুসলিমকে হদ্দের শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে মুসলিম নারীকে হদ্দের শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু কাফির যদি মুসলিম নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে তাহলে কাফিরকে হদ্দের শাস্তি দিতে হবে। শাফিঈ আলিমগণ বলেন, মুসলিম হোক বা যিম্মী সকলের উপর হদ্দ কার্যকর হবে।

৪. স্বেচ্ছায় যেনা করা। তাই অধিকাংশ ইমামের মতে, কাউকে জবরদস্তি করে যেনা করা হলে হদ্দ কার্যকর হবে না। চাই জবরদস্তিকারী পুরুষ হোক বা নারী। হাদীসে এসেছে-

ওয়াইল (রাযি.) হতে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে অন্ধকারে সলাতে যাওয়ার জন্য বের হল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। মহিলার চিৎকারে চারদিক থেকে লোকেরা একত্র হলো এবং ধর্ষণকারীকে ধরে ফেলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ধর্ষণকারীকে রজমের শাস্তি দিলেন আর মহিলাকে বললেন, তুমি চলে যাও, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৩৫৯]

উল্লেখ্য যে, যদি কোন কারণে শাস্তি মওকুফ হয় তাহলে ধর্ষণকারী কর্তৃক ধর্ষিতাকে যথোপযুক্ত মাহর পরিমাণ অর্থ দিতে হবে।

৫. যেনা হারাম হওয়া সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। সুতরাং কেউ যদি যেনা করার পর এ দাবি করে যে, সে তা হারাম হওয়া সম্পর্কে জানত না। তাহলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

৬. পুরুষাঙ্গ পুরো অথবা পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ নারীর যোনীতে প্রবেশ করাতে হবে। সুতরাং কেউ কেউ গুহ্যদ্বারে যৌনকর্ম করলে তাকে হদ্দ দেয়া যাবে না; বরং তা'যীরের শাস্তি দেয়া হবে। এটা ইমাম আবূ হানিফার অভিমত। আর শাফিঈ আলিমগণের মতে, এমতাবস্থায় শুধু পুরুষের উপরই হদ্দ কার্যকর করা হবে। নারী চাই সে বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা হোক না কেন তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে এবং নির্বাসন দণ্ড দিতে হবে। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে, গুহ্যদ্বারে করলেও যেনার হদ্দ প্রয়োগ হবে।

---

[৩৫৮] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: দুই ইয়াহুদীকে রজম করার ঘটনা, হাদীস নম্বর ৪৪৪৬, পৃ. ১৯০১-১৯০২।

[৩৫৯] *জামে আত- তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: যে নারীকে জোড়পূর্বক ধর্ষন করা হয়েছে, হাদীস নম্বর ১৪৫৪, পৃ. ৪৭২।

Dhaka University Institutional Repository

৭. সন্দেহমুক্ত হয়ে যেনা করা। তাই কেউ যদি নিজের স্ত্রী মনে করে কারো সাথে সহবাস করে (হয়ত সে তার ঘরে ঘুমিয়ে ছিল এবং সে তাকে নিজের স্ত্রী মনে করেছিল) তাহলে তার উপর যেনার হদ্দ কার্যকর হবে না।

৮. যিনকারী নারী-পুরুষ উভয়কেই জীবিত হতে হবে। তাই কেউ মৃত মহিলার সাথে সঙ্গম করলে তাকে হদ্দের শাস্তি দেয়া যাবে না; বরং আদালতের বিবেচনায় তাকে তা'যীরের শাস্তি দেয়া যাবে। এটা অধিকাংশ আলিমের অভিমত।

৯. মানুষের সাথে যেনা করতে হবে। সুতরাং কেউ পশুর সাথে সঙ্গম করলে তাকে হদ্দের শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে তা'যীরের শাস্তি দিবে। এটাই অধিকাংশ আলিমের অভিমত।

১০. ইসলামী রাষ্ট্রে যেনা সম্পন্ন হওয়া।

(গ) যেনা প্রমাণ হওয়ার পদ্ধতি

তিনটি পদ্ধতির যে কোন একটি দ্বারা যেনা সাব্যস্ত করা যায় । যথা-

(এক.). মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে: এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় রয়েছে-

ক. স্বীকারকারীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়: প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন যেনাকারী পুরুষ বা নারী যদি কারো চাপের মুখে না পড়ে স্বেচ্ছায় নিজের মুখে স্বীকার করে যে, সে যেনা করেছে, তাহলে তা দ্বারা যেনা প্রমাণিত হবে। ইমাম শাফিঈ, মালিক ও আহমাদ (রহ.)-এর মতে, বোবার লিখিত ও ইশায় স্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য হবে, যদি ইশারা দ্বারা যেনা বোঝায়। সুতরাং কোন বালক, পাগল ও মাতালের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. স্বীকারোক্তির সাথে সম্পর্কিত বিষয়: ১. চারবার স্বীকারোক্তি দিবে। হানাফী ও হাম্বলী আলিমগণ এ অভিমত দিয়েছেন। মালিকী ও শাফিঈ আলিমগণের মতে, একবার স্বীকার করলেও চলবে; ২. স্বীকারোক্তি সুস্পষ্ট হতে হবে। অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই কখন, কোন জায়গায়, কার সাথে, কী অবস্থায় এবং কীভাবে যেনা করেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা স্বীকারোক্তিতে থাকতে হবে; ৩. বিচারকের এজলাসে স্বীকারোক্তি দিতে হবে; ৪. ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে চার বার স্বীকারোক্তি দিতে হবে। হানাফী আলিমগণ এ মত দিয়েছেন। তবে অন্য ইমামদের মতে, এক মজলিসে চারবার স্বীকৃতি দিলেও চলবে; ৫. স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে হবে না। প্রত্যাহার করলে হদ্দ কার্যকর হবে না। এমনকি হদ্দ কার্যকর করার সময়েও যদি স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে তবে অবশিষ্ট হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

গ. অপরাধ সংঘটিত করার দীর্ঘ দিন পর স্বীকারোক্তি দিলে তাতেও হদ্দ কার্যকর হবে। এটা অধিকাংশ আলিমের অভিমত।

ঘ. কেউ স্বেচ্ছায় বিচারকের কাছে গিয়ে যেনার স্বীকৃতি দিলে বিচারক তাকে তার স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে। বিচারকের জন্য এটি বৈধ ও মুস্তাহাব।[৩৬০] আর যদি একজন ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দেয় এবং অপরজন অস্বীকার করে তাহলে স্বীকারকারী শাস্তি পাবে আর অস্বীকারকারী শাস্তি পাবে না।

(দুই). সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে

সাক্ষ্যের কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন–

১. সাক্ষীদেরকে মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ ও বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে।

২. সাক্ষীদের সংখ্যা চারজন হতে হবে। চারজন থেকে একজনও কম হলে চলবে না।

৩. সাক্ষীদের সকলকেই পুরুষ হতে হবে। যেনার ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

---

[৩৬০] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: মা'ইয বিন মালিকের রজম সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ৪৪১৯, ৪৪২৭, পৃ. ১৮৯০-৯১, ১৮৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সকল সাক্ষীকে যেনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে হবে। কেউ কোন সাক্ষীর কাছ থেকে শুনে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৫. চারজন সাক্ষীকে একই মজলিসে একসাথে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে। আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে সাক্ষ্য দিলে চলবে না।

৬. সাক্ষীদের সাক্ষ্য সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত হতে হবে। একই ঘটনা, কখন, কোন স্থানে, কার সাথে এবং কীভাবে যেনা সংঘটিত হয়েছে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিতে হবে। নারী-পুরুষ উভয়ের লজ্জাস্থান পরস্পরের লজ্জাস্থানের ভেতর ঢোকানো অবস্থায় দেখেছে কিনা তা সকলকে স্পষ্ট করে বলতে হবে। কেননা, অনেক সময় যেনা নয় এমন কাজকেও সাক্ষীরা যেনা মনে করতে পারে। কাজেই তারা যেনা করেছে সাক্ষীদের কেবল এরূপ কথার দ্বারা হদ্দ কার্যকর হবে না।

৭. সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্যে পূর্ণ মিল থাকতে হবে। তাদের কারো কথায় কোনরূপ পার্থক্য থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। (যেমন যেনার দিন, তারিখ, সময় ইত্যাদির ব্যাপারে গরমিল হওয়া)।

৮. বিশেষ কোন কারণ ছাড়া সাক্ষ্যদানে বিলম্ব করা যাবে না। যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত সাক্ষীদানে বিলম্ব করলে হানাফী আলিমগণের মতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন কোন আলিমের মতে, হদ্দ কার্যকর হওয়া পর্যন্ত সকল সাক্ষীকে জীবিত থাকতে হবে।

৯. যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হবে তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক, যেনা করতে সক্ষম এবং আত্মপক্ষ অবলম্বন করার মত সামর্থবান হতে হবে।

(তিন). লক্ষণ দ্বারা

যেমন- কুমারী বা স্বামীহীনা মেয়ের গর্ভধারণ। এটা যেনার লক্ষণ। তবে হদ্দের শাস্তি দিতে হলে তাকে স্বেচ্ছায় যেনার কথা স্বীকার করতে হবে অথবা উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ লাগবে। কেননা এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যে, মেয়েটি ধর্ষিতা হয়েছে বা কোন সন্দেহে পড়ে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে।[৩৬১]

যেনার শাস্তি প্রদান করা মানবাধিকার সংরক্ষণে অত্যন্ত সহায়ক। কারণ জৈবিক চাহিদা পূরণ কেবল বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার। বৈবাহিক সম্পর্ক এবং স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য উপায়ে এ চাহিদা পূরণে অন্যের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। তাছাড়া অবিবাহিত নারী-পুরুষ যদি যেনায় লিপ্ত হয় এবং ঐ নারী-পুরুষ যদি অন্য নিষ্কলুষ নারী-পুরুষকে বিয়ে করে তাতে অন্য নিষ্কলুষ নারী-পুরুষের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। কেননা নিষ্কলুষ নারী-পুরুষের অধিকার হচ্ছে নিষ্কলুষ জীবনসঙ্গী পাওয়া। তাই যেনার শাস্তি সমাজে পরিচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা যোগায়।

---

[৩৬১] *কিতাবুল ফিক্‌হি 'আলা মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-১৪৩; *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৯-৭৮১; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১২, পৃ. ৩০৮-৩৮৩; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫-২৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

[৬]. যেনার অপবাদের হদ্দ

মান-ইজ্জত সংরক্ষণের অধিকার হচ্ছে মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এ অধিকার বিনষ্ট করার একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে, কাউকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া। মুসলিম সমাজে কোন চরিত্রবান পুরুষ বা মহিলাকে যেনার অপবাদ দেয়া মারাত্মক অপরাধ। কেননা, এ ধরনের অভিযোগ অভিযুক্ত ব্যক্তি (বিশেষ করে অভিযুক্ত যদি নারী হয়) এবং পাশাপাশি গোটা সমাজের উপর অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, অভিযুক্তের উপর কখনো বা এর ভয়াবহতা মারাত্মক রূপ ধারণ করে। তাই মান-ইজ্জত সংরক্ষণের অধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলাম এ ধরনের অপবাদ আরোপ কঠোরভাবে নিষেধ করেছে এবং এজন্য যথাযথ শাস্তির বিধানও রেখেছে। যাতে অপরাধী শাস্তির ভোগ করে পুনরায় অনুরূপ অপরাধ করা থেকে এবং জনতা শাস্তির ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে কাউকে যেনার অপবাদ দিয়ে মানহানি করার অপকর্ম থেকে নিজেদের দূরে রাখে। এ ধরনের শাস্তি প্রয়োগে নিঃসন্দেহে মানুষের মান-সম্মান সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন একেবারে অথবা বহুলাংশে কমে আসবে।

যেনার অপবাদকে আরবী ভাষায় 'কাযাফ' বলা হয়। 'কাযাফ' শব্দের অর্থ হলো- নিক্ষেপ করা, সঞ্চার করা। শব্দটি কাউকে গালি দেয়া বা দোষারোপ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৩৬২] ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- কোন নারী অথবা পুরুষের বিরুদ্ধে স্পষ্টাভাবে বা ইঙ্গিতে যেনার অপবাদ দেয়াকে 'কাযাফ' বলা হয়। মালিকী আলিমগণের মতে, কোন প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানবান ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোন প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানবান মুসলিমকে যেনার অপবাদ দেয়া বা কারো পিতৃ পরিচয় অস্বীকার করাকে 'কাযাফ' বলা হয়।

(ক) যেনার অপবাদ আরোপের বিভিন্ন ভাষা ও তার বিধান

যেনার অপবাদ আরোপের ভাষার ধরন নিম্নরূপ:

১. সুস্পষ্ট অপবাদ: যেমন এরূপ বলা- তুমি ব্যভিচারী, বা তুমি জারজ সন্তান ইত্যাদি। এরূপ বলা হদ্দযোগ্য অপরাধ।

২. অস্পষ্ট ভাষায় অপবাদ: যা যেনার অর্থ প্রদানের সম্ভাবনা রাখে। যেমন- কোন পুরুষকে নষ্ট বা লম্পট বলা। অথবা কোন মহিলাকে বলা, তুমি নষ্টা মেয়ে, তোমাকে তো নির্জনে খুব দেখা যায়, তুমি কাউকে ফিরিয়ে দাওনা প্রভৃতি। এরূপ ভাষা দিয়ে অপবাদের বিধান সম্পর্কে হানাফী ও হাম্বলী আলিমগণ বলেন, এতে হদ্দ কার্যকর হবে না। তবে এগুলো অশোভনীয় বাক্য বিধায় আদালত এজন্য তা'যীরের আওতায় শাস্তি দিতে পারবে। শাফিঈ ও মালিকী আলিমগণ বলেন, অপবাদকারী যদি যেনার নিয়্যতে নয়; বরং ছোট বা মানহানি করার উদ্দেশ্যে এরূপ বলে থাকে তবে তা হদ্দযোগ্য না হয়ে তা'যীরের আওতায় শাস্তি পাবে।

৩. পরোক্ষ ভাষায় অপবাদ: যেমন– ঝগড়ার সময় কাউকে এরূপ বলা যে, আমি তো আর যেনাকারী নই। এতে ইঙ্গিত থাকে যে, যাকে লক্ষ্য করে কথাটি বলা হচ্ছে, তাকে যেনার অপবাদ দেয়া হলো। অনুরূপ কাউকে বলা যে, আমার মা তো আর যেনাকারীণী নয়। এতেও ইঙ্গিত থাকে যে, তোমার মা যেনাকারীণী। হানাফী ও শাফিঈ আলিমগণ বলেন, এ ধরনের ভাষা প্রয়োগে হদ্দ কার্যকর হবে না। কিন্তু এ ধরনের পরোক্ষ বাক্য অশোভনীয় বিধায় আদালত অবস্থা বুঝে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দিতে পারবে।

---

[৩৬২] ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১২, পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) 'কাযাফ' এর শর্তাবলী- অপবাদকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহ, স্থানের সাথে শর্ত

হদ্দ কার্যকর করার জন্য 'কাযাফ' এর কতিপয় শর্ত রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ:

অপবাদকারীর সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহ

১. অপবাদকারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক ও বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে এবং কাযাফের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

২. মুসলিম অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

৩. জোরপূর্বক নয়; বরং স্বেচ্ছায় অভিযোগ আরোপ করবে। আর অভিযোগ আরোপে অভিযুক্ত ব্যক্তিরও অনুমতি থাকা চলবে না। যদি কেউ অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুমতি নিয়েই তার বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ তোলে, তাহলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

৪. অভিযোগের পক্ষে চারজন সাক্ষী পেশ করতে হবে এবং সকল সাক্ষীকে একই ধরনের সাক্ষ্য দিতে হবে। চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে অভিযোগকারীর উপর শাস্তি কার্যকর হবে। সাক্ষ্য প্রদানের পর হদ্দ প্রয়োগের পূর্বেই যদি সাক্ষীগণের কেউ নিজের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে যেনা সাব্যস্ত হবে না এবং সাক্ষীগণের প্রত্যেকেই কাযাফের শাস্তি পাবে।

৫. অপবাদকারী অভিযুক্ত ব্যক্তির উর্ধ্বতন অথবা অধস্তন কেউ হবে না। যেমন পিতা, মাতা, দাদা, ছেলে, মেয়ে, নাতি ইত্যাদি। এটা অধিকাংশ আলিমের অভিমত। তবে মালিকী আলিমগণের একটি অভিমত অনুযায়ী কোন পিতা তার ছেলের বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ দিলে তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে।

৬. সুস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে যেনার অপবাদ দিতে হবে। ইঙ্গিতবহ কোন শব্দ ব্যবহার করে অপবাদ দিলে হদ্দ কার্যকর হবে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহ

১.অভিযুক্তকে মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ও স্বাধীন হওয়া এবং ইতোপূর্বে যেনা করেছে বলে প্রমাণিত না হওয়া।

২. অভিযুক্তকে অপরাধ কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হওয়া। অক্ষম হলে অপবাদ দাতার তা'যীরী শাস্তি হবে।

৩. অভিযুক্ত ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট হওয়া। অনির্দিষ্ট কারো বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ দিলে অপবাদকারীর উপর হদ্দ কার্যকর হবে না।

স্থানের সাথে শর্ত

যেনার মিথ্যা অপবাদের ঘটনাটি ইসলামী রাষ্ট্রে হতে হবে।

(গ) কাযাফ প্রমাণের পদ্ধতি

১. অভিযোগকারীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে।

২. সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে। দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারাও কাযাফ প্রমাণিত হবে। অধিকাংশ আলিমের মতে, সাক্ষীদের পুরুষ হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) যেনার মিথ্যা অপবাদের শাস্তি, বারবার অপবাদ দেয়ার শাস্তি ও একাধিক ব্যক্তির প্রতি যেনার অপবাদ দেয়ার শাস্তি

যেনার মিথ্যা অপবাদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যেনার অভিযোগ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং কখনও (যে কোন ক্ষেত্রে) তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। তারা ফাসিক। তবে যারা এরপর তাওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।[৩৬৩]

আলোচ্য আয়াতে পার্থিব জীবনে 'কাযাফ' এ দুই ধরনের শাস্তির কথা জানা যায়। এক. ৮০টি বেত্রাঘাত; দুই. চিরদিনের জন্য অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান। সুতরাং কেউ কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে যেনা বা সমকামিতার অভিযোগ এনে তা চারজন উপযুক্ত সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে না পারলে উক্ত অভিযোগ মিথ্যা গণ্য হবে। আর অপবাদকারীকে আশিটি বেত্রাঘাতের দণ্ড দেয়া হবে এবং কখনোই তার কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।[৩৬৪]

---

৩৬৩ আল-কুরআন: সূরাহ আন-নূর, ২৪/৪-৫।

৩৬৪ সকল আলিম এ বিষয়ে একমত যে, যদি অপবাদ প্রদানকারী তাওবা না করে, তবে তার কোন সাক্ষ্যই কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে সারা জীবন ফাসিক হিসেবেই পরিচিত থাকবে।

উল্লেখ্য যে, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং এর পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী উপস্থাপনে ব্যর্থ হয় কিংবা স্বামী যদি স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান তার ঔরসজাত নয় দাবি করে, তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আদালতের সামনে নিজ নিজ অবস্থান ও বক্তব্যের স্বপক্ষে বিশেষ পন্থায় শপথ করতে হবে। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় এ বিশেষ পন্থাকে লি'আন বলা হয়। এ লি'আন করার পদ্ধতি হলো: প্রথমে স্বামী এই বলে চারবার শপথ করবে যে, আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি যে, আমি এ মহিলার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছি, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই সত্যবাদী। পঞ্চমবারে অভিযুক্তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলবে, আমি এ মহিলার বিরুদ্ধে যেনার যে অভিযোগ পেশ করেছি, সে ক্ষেত্রে আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক। অতঃপর স্ত্রী এ বলে চারবার শপথ করবে যে, আমি আল্লাহ্র নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ ব্যক্তি আমার প্রতি যেনার যে অভিযোগ করেছে সে ব্যাপারে সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চমবারে বলবে, এই ব্যক্তি আমার প্রতি যেনার যে অভিযোগ আরোপ করেছে সে ক্ষেত্রে সে সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক।

স্বামী শপথ করতে অস্বীকার করলে স্বামীকে কারাগারে আটকে রাখা হবে, যতক্ষণ না সে শপথ করে বা তার উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করে। অভিযোগ মিথ্যা স্বীকার করলে তার উপর কাযাফের হদ্দ কার্যকর হবে। আর যদি স্ত্রী শপথ করতে অস্বীকার করে তাকেও কারাগারে আটকে রাখা হবে, যতক্ষণ না সে শপথ করে বা তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করে। মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী আলিমগণ বলেন, হদ্দ কার্যকরের জন্য শপথ করতে অস্বীকার করাই যথেষ্ট, এজন্য অপরাধীকে কারাগারে আটক রাখার দরকার নেই।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে লি'আন করার পর তাদের বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে এবং তারা পুনরায় কখনও বিয়েতে আবদ্ধ হতে পারবে না। তবে স্বামী তার অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করলে শাস্তি পাওয়ার পর উভয়ে পুনরায় বিয়েতে আবদ্ধ হতে পারবে। লি'আনের সন্তান মায়ের সাথে যুক্ত হবে, মা ও সন্তান পরস্পরের ওয়ারিস হবে। লি'আনকারী মহিলার সন্তানকে জারজ সন্তান বলা বৈধ নয়। কেউ এরূপ বললে অধিকাংশ ইমামের মতে, তাকে হদ্দের শাস্তি দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তার ও তার সন্তানের প্রতি যেনার অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না। কেউ তার বা তার সন্তানের প্রতি যেনার অভিযোগ তুললে তার উপর হদ্দের শাস্তি বর্তাবে। (*সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ: লি'আন সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ২২৫৬)

Dhaka University Institutional Repository

বারবার অপবাদ দেয়ার শাস্তি

শাফিঈ ইমামগণ বলেন, কেউ কোন ব্যক্তির উপর একই যেনার ব্যাপারে বারবার অপবাদ দিলে তাকে শুধু প্রথম হদ্দের শাস্তি দেয়া হবে। পরবর্তীতে তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দিতে হবে। আর মালিকী আলিমগণ বলেন, হদ্দ কার্যকরের পূর্বে কেউ কারো প্রতি বারবার অপবাদ দিলে তাকে একবারই শাস্তি দিতে হবে। একবার হদ্দ প্রয়োগের পর পুনরায় ঐ ব্যক্তিকে অপবাদ দিলে তাকে পুনরায় হদ্দের শাস্তি দিতে হবে। হাম্বলী ইমামগণ এ মতকে সমর্থন করেন।

একাধিক ব্যক্তির প্রতি যেনার অপবাদ দেয়ার শাস্তি

হানাফী ও মালিকী আলিমগণের মতে, অভিযোগকারীর উপর একটি মাত্র হদ্দ ওয়াজিব হবে। চাই সে সকলকে এক বাক্যে বা ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে অভিযুক্ত করুক। চাই সবাই একত্রে তার বিচার দাবি করুক বা আলাদাভাবে। তবে দলের কারো বিরুদ্ধে নতুন কোন যেনার অভিযোগ উত্থাপন করলে তাতে নতুন হদ্দ কার্যকর হবে।

শাফিঈ আলিমগণের মতে, যদি কেউ একটি দলকে যেনার অপবাদ দেয় এবং তা একই শব্দে হোক (যেমন- সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলা: হে যেনাকারীরা!) অথবা পৃথকভাবে, যতজনকে অপবাদ দিয়েছে ততজনের বিপরীতে হদ্দ কার্যকর হবে। অর্থাৎ জনপ্রতি ৮০টি করে বেত্রাঘাত।[৩৬৫]

(ঙ) যেসব কারণে কাযাফ -এর হদ্দ রহিত হয়

১. অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীকার করে নিলে।

২. উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা অভিযোগ প্রমাণিত হলে।

৩. হদ্দ কার্যকর করার পূর্বে এক বা সকল সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিলে।

৪. অভিযোগকারী স্বামী হলে এবং সে লি'আন করলে কাযাফের হদ্দ রহিত হবে।

৫. অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অভিযোগ উত্থাপনকারীকে ক্ষমা করে দেয়। শাফিঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, ক্ষমা করাটা আদালতে মামলা দায়েরের পূর্বে হোক বা পরে হোক, এতে কাযাফের শাস্তি রহিত হবে। মালিকী আলিমগণের মতে, আদালতে মামলা দায়েরের পূর্বে হলে ক্ষমা করা বৈধ। কিন্তু মামলা দায়েরের পরে ক্ষমা করা বৈধ নয়। হানাফী আলিমগণের মতে, কোন অবস্থায়ই যেনার অপবাদের হদ্দ ক্ষমা করা বৈধ নয়।

---

[৩৬৫] *কিতাবুল ফিক্‌হি 'আলা মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-২২৭; *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৩-৭৮৭; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১২, পৃ. ৩৮৩-৪০৯; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খণ্ড ৩৩, পৃ. ১১-২২; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩-৩২৮; *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৩-২১০; *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২-১৬৯; *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭-২৫৯; *ইসলামী দণ্ডবিধি*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯-২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

[৭]. মদপানের হদ্দ

আরবী ভাষায় মদকে خمر বলা হয়। এর অর্থ ঢেকে ফেলা, সমাচ্ছন্ন করা, মিশে যাওয়া।[৩৬৬] ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় যেসব দ্রব্য মাদকতা সৃষ্টি করে এবং বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে বা বোধশক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে মদ বলা হয়।

মাদক মানুষের দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি ঘটায়। ইসলাম কাউকে নিজের বা অন্য কারোর ক্ষতি সাধনের অনুমতি দেয় না। ইসলামের শিক্ষাই হচ্ছে- নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দেওয়া, নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া এবং অপরের ক্ষতি না করা। ইসলামী আইনে মাদক সেবন একটি ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য। শুধু তাই নয়; বরং ইসলামের দৃষ্টিতে মদ হচ্ছে সকল অপরাধের মূল, সকল অপরাধের চাবি এবং সকল অপরাধের চূড়া। তাই ইসলামে সকল প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সেই সাথে নিষিদ্ধ মদের ব্যবসা, মদ তৈরি, আমদানি, রফতানি, মদ উপহার দেয়া, মদপানের মজলিসে বসা প্রভৃতি। কেননা এরূপ কাজ মদের সাথে নৈকট্যতা গড়ে তোলে। মদপানের মতো নিষিদ্ধ কাজে যেন কোনভাবেই কেউ সহযোগিতা না করে সেজন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। যদি কেউ বলে যে, মদ বা মাদক নিষিদ্ধ করা মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার হস্তক্ষেপের শামিল। তবে বলতে হয়, আত্মহত্যা করা, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার ও পরিবেশ ধ্বংস করা কোন মানবাধিকার নয়। সভ্যতার অর্থই হলো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা এবং পরিবার, সমাজ ও আশ-পাশের পরিবেশ-প্রকৃতির স্বার্থে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা।

মাদক ছোট-বড় বহু অপরাধের উৎস; বরং মাদক মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকে ধাবিতকারী অন্যতম বড় উপকরণ বা সহায়ক বস্তু। মাদক সেবনে মনুষ্যত্ববোধ ও ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান লোপ পায়। ফলে মাদকাসক্ত হয়ে বা মাদকের পয়সা সংগ্রহ করতে গিয়ে মাদকসেবী নারী নির্যাতন, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মানুষ হত্যা প্রভৃতি বড় বড় অপরাধ করে বসে। যদ্বারা মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়। কাজেই ইসলামী নির্দেশনা অনুসরণ করে যদি মদপানের শাস্তি প্রয়োগ করা হয় এবং মাদক উৎপাদন, সেবন, ব্যবসা প্রভৃতি যথাযথভাবে বন্ধ করা যায়, তবে মদপান বা মাদক সেবনের কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেসব অপরাধ সংঘটন হয়ে থাকে তা আর হবে না অথবা বহুলাংশে কমে আসবে। অপরাধী শাস্তি পেয়ে পুনরায় মাদক সেবনে ধাবিত হবে না এবং জনতাও শাস্তি প্রত্যক্ষ করে মাদক থেকে দূরে থাকবে। ফলে তরুণ সমাজ সুস্থ দেহ ও সুস্থ মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠবে। তারা বিভিন্ন অপরাধ, বিকৃত ও মন্দ আচরণ থেকে দূরে সরে আসবে এবং দেশ ও জাতির অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

মাদক হারাম প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

ইবনু ‘উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই মদ। আর প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই হারাম।[৩৬৭]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " .

জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যে জিনিসের অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা সৃষ্টি হয় তার সামান্য পরিমাণও হারাম।[৩৬৮]

---

[৩৬৬] ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫২।

[৩৬৭] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ: নেশা উদ্রেককারী প্রতিটি জিনিস নিষিদ্ধ, হাদীস নম্বর ৩৬৭৯, পৃ. ১৫৯২-১৫৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ε يَقُولُ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ " .

'আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: নেশা উদ্রেককারী যে কোন বস্তুই হারাম। যে বস্তু এক পাত্র পান করলে নেশা সৃষ্টি করে তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম।[৩৬৯]

(ক) মদপানের শাস্তি

মদপানের শাস্তি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে এর শাস্তির কথা উল্লেখ নেই। হাদীসে মদ পানকারীদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাস্তি দেয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে।[৩৭০] আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, মদ পানকারীর শাস্তি হলো বেত্রাঘাত। অধিকাংশ ইসলামী আইনজ্ঞের মতে, মদপানের শাস্তি ৮০টি বেত্রাঘাত। কেননা, আনাস (রাযি)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাদক দ্রব্য সেবনের অপরাধে খেজুরের দুটি ডালি দিয়ে ৪০ বার প্রহার করতেন। আবূ বকর (রাযি.)ও তাই করেছেন এবং উমার (রাযি.) মদ পানকারীর শাস্তি নির্ধারণের জন্য সাহাবীগণের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তখন আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযি.) বললেন, তার শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাতই নির্ধারণ করুন।[৩৭১]

শাফিঈ আলিমগণের মতে, মদপানের শাস্তি ৪০টি বেত্রাঘাত। অবশ্য বিচারক চাইলে অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে ৮০টি পর্যন্ত বেত্রাঘাত করতে পারবেন। কিন্তু ৪০ এর অধিক বেত্রাঘাত তা'যীরের আওতাভুক্ত। তাছাড়া কাপড়, খেজুরের ডাল ও জুতা দ্বারাও যদি প্রহার করা হয়, তাও শুদ্ধ হবে। কেননা, হাদীসে এসেছে-

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ε وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.

সায়িব ইব্নু ইয়াযীদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে ও আবূ বকর (রাযি.)-এর খিলাফতকালে এবং 'উমার (রাযি.)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে আমাদের কাছে যখন কোন

---

[৩৬৮] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ: নেশা উদ্রেককারী প্রতিটি জিনিস নিষিদ্ধ, হাদীস নম্বর ৩৬৮১, পৃ. ১৫৯৩।

[৩৬৯] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ: নেশা উদ্রেককারী প্রতিটি জিনিস নিষিদ্ধ, হাদীস নম্বর ৩৬৮৭, পৃ. ১৫৯৬।

[৩৭০] হাদীসে মদপানকারীর শাস্তি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হওয়ার কারণে আল্লামা শাওকানী, ইবনু মুনযির ও আত-তাবারী প্রমুখ আলিমগণ মনে করেন যে, মদ্যপানের শাস্তি হদ্দের পর্যায়ভুক্ত নয়; বরং তা'যীরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা যুরকানীর মতে, চল্লিশ বেত্রাঘাত সুনির্ধারিত শাস্তি অর্থাৎ হদ্দ। আর এর অতিরিক্ত আশিটি বেত্রাঘাত হচ্ছে তা'যীরের আওতাভুক্ত, যা বিচারকের রায়ের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু চার মাযহাবের ইমামগণের অভিমত হলো, মদপানের শাস্তি হদ্দের পর্যায়ভুক্ত। কেননা, বিভিন্ন হাদীসে অনেক সাহাবীকেই মদপানের শাস্তির জন্য হদ্দ শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) বলেন, এক মাতাল ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হলে তিনি বলেন: তোমরা একে প্রহার করো। আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) বলেন, আমাদের মধ্যকার কেউ তাকে হাত দিয়ে মেরেছে, কেউ জুতাপেটা করেছে আর কেউবা কাপড় দিয়ে মেরেছে। (*সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: মদপানের হদ্দ, হাদীস নম্বর ৪৪৭৭, পৃ. ১৯১৫)

আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ-এর কাছে একজন মদপানকারীকে উপস্থিত করা হলো। তখন তিনি তাকে দুটি ডালা একত্র করে প্রায় ৪০ বার প্রহার করেছেন। (*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: মদপানের হদ্দ, হাদীস নম্বর ১৭০৬, পৃ. ৫০০)

[৩৭১] *সুনান আবূ হাদীস*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: মদপানের হদ্দ, হাদীস নম্বর ৪৪৭৯, পৃ. ১৯১৭।

Dhaka University Institutional Repository

মদ্যপায়ীকে আনা হত তখন আমরা তাকে হাত দিয়ে, জুতা দিয়ে এবং আমাদের চাদর দিয়ে প্রহার করতাম। অতঃপর 'উমার (রাযি.)-তাঁর খিলাফতের শেষ দিকে চল্লিশটি করে চাবুক মেরেছেন। যখন মদ্যপায়ীদের বাড়াবাড়ি সীমালঙ্ঘন বেড়ে যেত তখন আশিটি করে চাবুক মারা হত।[৩৭২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ε ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ.

আনাস ইব্নু মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ মদপানের জন্য গাছের ডাল এবং জুতা দ্বারা মেরেছেন। আর আবূ বকর (রাযি.) চল্লিশ চাবুক লাগিয়েছেন।[৩৭৩]

উসমান (রাযি.)-এর খিলাফতকালে এক ব্যক্তি ওয়ালীদ ইবনু উকবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে মদপান করতে দেখেছে এবং আরেক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে বমি করতে দেখেছে। উসমান (রাযি.) আলী (রাযি.)-কে নির্দেশ দিলেন, তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য। তাকে ৪০টি বেত্রাঘাত করার পর আলী (রাযি.) প্রহারকারীকে থামতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ৪০টি বেত্রাঘাত করেছেন, আবূ বকরও ৪০টি বেত্রাঘাত করেছেন। আর উমার (রাযি.) ৮০টি বেত্রাঘাত করেছেন। সবগুলোই সুন্নাত, তবে আমি এটা (অর্থাৎ ৪০টি) পছন্দ করি।[৩৭৪]

উল্লেখ্য, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে মাদকাসক্ত হয়ে কোন অপরাধ করলে সে শাস্তিযোগ্য হবে, অপরাধ ইচ্ছাকৃত করুক বা ভুলবশত করুক না কেন।

মদ তৈরি, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবেশন, উপঢৌকন, বহন এবং আমদানী-রপ্তানিও দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই এসব অপরাধের জন্য আদালত তা'যীরের আওতায় শাস্তি নির্ধারণ করবে।

(খ) মদপানকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগের শর্তসমূহ

মদপানকারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তা হলো-

১. মদপানকারীকে মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, বাকশক্তি ও সুস্থবিবেক সম্পন্ন হতে হবে এবং মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। সুতরাং কোন অমুসলিমকে মদপানের হদ্দ দেয়া যাবে না। তবে দেশীয় আইনে তার শাস্তি বিধান করা যাবে। অবশ্য হাসান ইবনু যিয়াদ (রহ.) বলেন: 'অমুসলিমকেও হদ্দ দেয়া যাবে, যদি সে নেশাগ্রস্ত হয়। কেননা মাদক সেবন সকল ধর্মেই নিষিদ্ধ।' মদপানকারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাকে তা'যীরের আওতায় সংশোধনীমূলক শাস্তি দেয়া যাবে। বোবার উপর হদ্দ কার্যকর হবে না, কারণ তাতে সন্দেহ বিদ্যমান। কোন নব মুসলিম বা অমুসলিম দেশের কোন মুসলিম যদি দাবি করে যে, মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে সে জানত না, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে মুসলিম দেশের কোন মুসলিমের এরূপ দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।[৩৭৫]

২. জেনে-বুঝে স্বেচ্ছায় মদপান করা। কেউ যদি নিরুপায় হয়ে পিপাসা বা ক্ষুধার কারণে মদপান করে, এজন্য হদ্দ প্রয়োগ হবে না। অনুরূপভাবে কাউকে বাধ্য করে বা জবরদস্তিমূলক মদপান করানো হলেও শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে জবরদস্তির বিষয়টি প্রমাণিত হতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

---

[৩৭২] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: গাছের ডাল এবং জুতা দিয়ে মারার বর্ণনা, হাদীস নম্বর ৬৭৭৯, পৃ. ৮০৯।

[৩৭৩] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: মদ্যপায়ীকে প্রহার করা সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ৬৭৭৩ পৃ. ৮০৮।

[৩৭৪] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: মদপানের হদ্দ, হাদীস নম্বর ১৭০৭, পৃ. ৫০১।

[৩৭৫] *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮-১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তবে যে ব্যক্তি অনন্যোপায়; কিন্তু বিদ্রোহী বা অবাধ্যচারী নয় তার হারাম দ্রব্য গ্রহণে কোন পাপ হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[৩৭৬]

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ

তবে (সে শাস্তি পাবে না) যাকে বল প্রয়োগে বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকে।[৩৭৭]

(গ) মদপানের প্রমাণ ও শাস্তি কার্যকরের সময়

নিম্নের যে কোন উপায়ে মদপান প্রমাণিত হতে পারে-

১. দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা। তবে সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যে গরমিল হলে হদ্দ প্রযোজ্য নয়। মাতলামী হলে একজনের সাক্ষ্য যথেষ্ট আর মুখে মদের গন্ধ থাকলে দু'জন সাক্ষী প্রয়োজন।

আদালতে সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, অপরাধী কখন, কোথায়, কোন অবস্থায় মদপান করেছে? কেননা, এরূপও হতে পারে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি সিরকা পান করেছে, আর সাক্ষীরা ধারণা করেছে যে, সে মদপান করেছে। আর অপরাধ সংঘটনে দীর্ঘ দিন পরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া সাক্ষ্য হতে হবে মৌলিক। কারো সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

২. আদালতে মদ পানকারীর স্বীকারোক্তি। ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) বলেন, দু'বার স্বীকারোক্তি আবশ্যক। অপরাধী স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে হদ্দ কার্যকর হবে না।

উল্লেখ্য যে, মাতাল অবস্থায় কোন ব্যক্তির স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ঐ অবস্থার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।

৩. মুখে মদের গন্ধ পাওয়া, বমি হওয়া বা মাতলামী করা। তবে এসবের কোন একটি আলামতের ভিত্তিতে হদ্দ প্রয়োগ হবে কিনা এ নিয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে।[৩৭৮]

রুগ্ন ও মাতাল অবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। যখন মাদকের নেশা কেটে যাবে এবং এবং মাদকসেবী সুস্থ হবে তখন তার উপর হদ্দ কার্যকর করবে।[৩৭৯]

---

[৩৭৬] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/১৭৩।

[৩৭৭] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নাহল, ১৬/১০৬।

[৩৭৮] হানাফী ও শাফিঈ আলিমগণের অভিমত হলো, কারো মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া হদ্দ প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট নয়। অন্য বস্তু খাওয়ার দ্বারাও মুখ থেকে মাদকের মত গন্ধ বের হতে পারে। এমনও তো হতে পারে যে, তাকে জবরদস্তিভাবে বা অনন্যোপায় হয়ে মদ খেয়েছে। শুধু গন্ধের কারণে হদ্দ দেয়া যাবে না। মালিকীগণের মতে, শাস্তি দেয়ার জন্য গন্ধই যথেষ্ট। কেননা, উমার, উসমান ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযি.) মুখে মদের গন্ধ পেয়েই বিভিন্ন মদ্যপায়ীকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে, সাক্ষ্যপ্রমাণ বা অপরাধীর স্বীকারোক্তি দ্বারা মদপান সাব্যস্ত না হলে শুধুমাত্র মাতলামি করা হদ্দযোগ্য মদপান প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা অন্য কারণেও মাতলামি হতে পারে। (ইসলামের শাস্তি আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮২)

[৩৭৯] *কিতাবুল ফিক্‌হি 'আলা মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-৪৭; *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৮-৭৯১; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১২, পৃ. ৪৯৩-৫২০; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২৫, পৃ. ৯০-১০৪; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৩০২; *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০-২১৫; *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৮২; *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, ২৬০-২৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

[৮]. কিসাস সম্পর্কে আলোচনা

ইসলামে কিসাস হলো অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের অনুরূপ শাস্তি দেয়া। যেমন- হত্যার বদলে হত্যাকারীকে হত্যা করা, যখমের বদলে যখমকারীকে যখম করা এবং অঙ্গকাটার বদলে অঙ্গকর্তনকারীর অঙ্গকাটা। যখন কোন অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের (যেমন- যখম বা অঙ্গকাটা, কাউকে এসিড নিক্ষেপ করা ইত্যাদি) অনুরূপ শাস্তি দেয়া হবে, তখন অপরাধী শাস্তির যন্ত্রণা বা ক্ষতি স্বয়ং নিজেই অনুভব করবে এবং সে বুঝতে পারবে যে, সে অন্যের কতটা ক্ষতি সাধন করেছে। ফলে সে পুনরায় অনুরূপ অপরাধ থেকে নিবৃত হবে। অনুরূপ কেউ যদি হত্যার বদলে হত্যার শাস্তি পায়, তাহলে খুনি পুনরায় আর কাউকে খুন করার সুযোগ পাবে না। আর কিসাসের প্রতিটি শাস্তির ক্ষেত্রেই জনতা তা প্রত্যক্ষ করে অনুরূপ শাস্তি ভোগের ভয়ে মানব জীবন বা দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোন অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। সুতরাং মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে কিসাস অত্যন্ত কার্যকরী ও সফল পন্থা। যা অপরাধকে একেবারে বন্ধ বা বহুলাংশে কমিয়ে আনতে সক্ষম।

উল্লেখ্য যে, কিসাস প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করবেন ইসলামী সরকার। তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা চাইলে অপরাধীকে ক্ষমাও করতে পারে অথবা রক্তমূল্য (দিয়াত) নিয়ে তাকে ছেড়েও দিতে পারে। এ স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। যখম ও অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারেও একই বিধান।

কিসাস প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ.

হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের বদলে দাস এবং নারীর বদলে নারী। অতঃপর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে ন্যায়নীতির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তা আদায় করা উচিত। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সহজীকরণ ও রহমত বিশেষ।[৩৮০]

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

এবং আমরা তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমসমূহের বদলে অনুরূপ যখম। আর কেউ কিসাস ক্ষমা করে দিলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে।[৩৮১]

وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً

কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে আমি তার উত্তরাধিকারীকে তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি (কিসাস দাবি করার অথবা ক্ষমা করার)। কাজেই সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে। কারণ, সে তো (আইন-বিধান দ্বারা) সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে।[৩৮২]

আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

---

[৩৮০] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/১৭৮।

[৩৮১] আল-কুরআন: সূরাহ আর-মায়িদাহ, ৫/৪৫।

[৩৮২] আল-কুরআন: সূরাহ বনী ইসরাঈল, ১৭/৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ

যার কোন ব্যক্তি নিহত হবে, তার দুটি স্বাধীনতা রয়েছে। ইচ্ছে হলে সে রক্তমূল্য নিতে পারবে, আর ইচ্ছে হলে কিসাসও নিতে পারবে।[৩৮৩]

ইবনু 'উবাইদ (রহ.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে তার কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) কার্যকর হবে।[৩৮৪]

আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا العَفْوَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا النَّبِيَّ ε فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ε إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ

রুবাই'ই বিনতু নাদর ইবনে আনাস (রাযি.) এক দাসীর সামনের একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেললে সাহাবীগণ এর জন্য রক্তমূল্য দাবি করেন। কিন্তু দাসীর অভিভাবকরা রক্তমূল্য নাকচ করে কিসাস চাইল। অতঃপর সবাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলো। তিনিও কিসাস গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। এমন সময় রুবাই'ই এর ভাই আনাস ইবনে নাদর (রাযি.) এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, আপনি কি রুবাই'ইর দাঁত ভেঙ্গে ফেলবেন? সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, আপনি তার দাঁত ভাঙ্গবেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্র কিতাবে কিসাসের বিধান রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে দাসীর অভিভাবকরা ক্ষমা করে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্র এমন কিছু বান্দা আছে, যারা আল্লাহ্র নামে কসম করলে আল্লাহ্ তাদের কসমকে পূর্ণ করে দেন।[৩৮৫]

কিসাসের অপরাধ প্রধানত দুই ধরনের: ১. মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিসাসযোগ্য অপরাধ; ২. মানব দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট কিসাসযোগ্য অপরাধ।

---

[৩৮৩] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল দিয়াত, অনুচ্ছেদ: কাউকে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারীরা দু'রকমের শাস্তির যে কোন একটি দেয়ার অধিকার রাখে, হাদীস নম্বর ৬৮৮০, পৃ. ৮২০।

[৩৮৪] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি অদৃশ্যভাবে নিহত হলো, হাদীস নম্বর ৪৫৩৯, পৃ. ১৯৪৬।

[৩৮৫] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সুল্হ, অনুচ্ছেদ: দিয়াতের ব্যাপারে সন্ধি, হাদীস নম্বর ২৭০৩, পৃ. ৩২৪।

Dhaka University Institutional Repository

মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিসাসযোগ্য অপরাধ

মানব হত্যাই হচ্ছে মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিসাসযোগ্য অপরাধ। এ সম্পর্কিত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল।

(ক) হত্যার প্রকার

উদ্দেশ্যে ও ধরন বিবেচনা করে হত্যাকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়।[৩৮৬] যেমন-

১. ইচ্ছাকৃত হত্যা
২. প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা
৩. ভুলবশত হত্যা
৪. প্রায় ভুলবশত হত্যা
৫. কারণবশত হত্যা

ইচ্ছাকৃত হত্যা

কেউ যদি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে এমন কাজ করে যদ্বারা অন্য লোকের প্রাণনাশ হয়, তখন তার ঐ কাজটিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয়। এরূপ হত্যাকাণ্ডের জন্য কিসাস কার্যকর হবে। ইচ্ছাকৃত হত্যা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন- লোহা, হাতুড়ি, ধারালো বা ভারি অস্ত্র, ভারি পাথর, গুলি বা বোমা মেরে হত্যা করা, মাটিতে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করা, শ্বাসরুদ্ধ করে, আগুনে নিক্ষেপ করে, উঁচু স্থান থেকে ফেলে দিয়ে, পানিতে ডুবিয়ে, বিষ পান করিয়ে ইত্যাদি। যাদু করে হত্যা করাও ইচ্ছাকৃত হত্যার অন্তর্ভুক্ত এবং এজন্য হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে যদি সেরূপ যাদু দ্বারা সচরাচর লোকজন মারা যায়। আর যদি সে যাদুতে সচরাচর লোকজন মারা না যায় তাহলে এরূপ যাদুতে কেউ মারা গেলে এজন্য দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। এমনিভাবে হিংস্র জন্তু বা সাপের স্থানে নিক্ষেপ করার ফলে জন্তুর আক্রমণে বা সাপের দংশনে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তা ইচ্ছাকৃত হত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।[৩৮৭]

প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা

যেসব বস্তু দ্বারা সাধারণত হত্যা সংঘটিত হয় না এমন কোন বস্তু (যেমন- ক্ষুদ্র পাথর, ক্ষুদ্র লাঠি, চাবুক, কলম ইত্যাদি) দ্বারা হত্যা করা হলে তাকে প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় এবং এর জন্য দিয়াত প্রযোজ্য।

এ ধরনের হত্যায় হত্যাকারীর হত্যা করার ইচ্ছার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকায় এক্ষেত্রে কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।

ভুলবশত হত্যা

কোন বৈধ কাজ (যা নিষিদ্ধ নয়) করার সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের অভাবে কোন হত্যা সংঘটিত হলে তাকে ভুলবশত হত্যা বলে। এরূপ হত্যাকাণ্ডের জন্য অপরাধীর উপর দিয়াত ও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

---

[৩৮৬] এটি ইমাম আবূ বকর রাযীর অভিমত। অধিকাংশ হানাফী আলিম এটি গ্রহণ করেছেন। কোন কোন আলিম হত্যাকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। যাতে প্রায়ভুলবশত হত্যার কথা উল্লেখ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতে হত্যা তিন প্রকার: ইচ্ছাকৃত হত্যা, প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং ভুলবশত হত্যা। শাফিঈ ও হাম্বলী আলিমগণের অভিমতও তাই।

[৩৮৭] *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের ভুল কর্তার ধারণার মধ্যে হতে পারে, কাজের মধ্যেও হতে পারে, আবার উভয়টির মধ্যেও হতে পারে।

১. "কর্তার ধারণায় ভুল: যেমন– শিকারী কোন মানুষকে শিকারের পশু ভেবে সেদিকে তীর বা গুলি ছুঁড়ল, পরে দেখা গেল যে, সে মানুষ, শিকারের পশু নয়। অনুরূপ কাউকে শত্রু সৈন্য ভেবে তীর মারল, পরে দেখা গেল যে, সে শত্রু সৈন্য নয়। এখানে অপরাধীর কাজে ভুল হয়নি; সে যা মারতে চেয়েছে তা-ই মেরেছে; বরং ভুল হয়েছে তার ধারণায়।

২. কর্তার কাজে ভুল: যেমন- শিকারী একটি হরিণকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল; কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঝোপের মধ্যে কর্মরত কোন ব্যক্তির শরীরে বিদ্ধ হল এবং এতে লোকটি মারা গেল। অনুরূপভাবে শত্রুসৈন্যকে লক্ষ্য করে তীর বা গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু তীর বা গুলি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে অপর ব্যক্তির দেহে বিদ্ধ হল এবং এর ফলে লোকটি মারা গেল।

৩. কর্তার ধারণা ও কাজ উভয়ের মধ্যে ভুল: শিকারী কোন মানুষকে শিকারের পশু মনে করে সেদিকে তীর বা গুলি ছুঁড়ল; কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অপর ব্যক্তির শরীরে বিদ্ধ হলো এবং এতে লোকটি মারা গেল। এ ক্ষেত্রে সে মানুষকে শিকারের পশু মনে করে অনুমানে ভুল করেছে এবং যার দিকে তীর বা গুলি ছুঁড়েছে তা তার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির শরীরে লাগায় সে কাজেও ভুল করেছে।"[৩৮৮]

প্রায় ভুলবশত হত্যা

কোন ব্যক্তির কোন কাজের দ্বারা হত্যা সংঘটিত হলে তাকে প্রায় ভুলবশত হত্যা বলে। এতে অপরাধীর কোন প্রকার ইচ্ছা ছাড়াই অসতর্কতার দরুন হত্যা সংঘটিত হয় বলে একে প্রায় ভুলবশত হত্যা বলা হয়। যেমন– কেউ ঘুমন্ত অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতে গিয়ে অন্য লোকের উপর উল্টে পড়ল এবং এতে অপর লোকটি মারা গেল। এ ধরনের হত্যার জন্য দিয়াত ও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

কারণবশত হত্যা

কোন ব্যক্তির কোন কাজে যথাযথ সতর্কতার অভাবের কারণে কারো মৃত্যু হলে তাকে কারণবশত হত্যা বলা হয়। যেমন– কেউ রাস্তার পার্শ্বে গর্ত করল এবং সেই গর্তে পড়ে কোন পথচারীর মৃত্যু হলো। এখানে গর্ত খনন করে কাউকে হত্যার ইচ্ছা খননকারীর ছিল না; কিন্তু যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই এ ধরনের হত্যায় কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) প্রযোজ্য নয়। তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে।

(খ) কিসাস ওয়াজিব হবার শর্তসমূহ, হত্যাকারীর সাথে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ, হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ, নিহত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ, নিহতের অভিভাবকদের সাথে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ

কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) ওয়াজিব হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। তা নিম্নরূপ:

হত্যাকারীর সাথে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ

১. হত্যাকারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানবান (সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন) হতে হবে। সুতরাং নাবালক বা পাগলের উপর কিসাস কার্যকর হবে না; বরং এক্ষেত্রে তার সম্পদ থেকে রক্তমূল্য দেয়া বাধ্যতামূলক হবে। এমনিভাবে ঘুমন্ত ও বেহুঁশ ব্যক্তির উপর কিসাস কার্যকর হবে না। কেউ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে মাদক সেবন করে মাতাল হয়ে কাউকে হত্যা করলে তার উপর কিসাস কার্যকর হবে।

---

[৩৮৮] *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৩-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

২. নিহত ব্যক্তিকে হত্যার ইচ্ছা হত্যাকারীর থাকতে হবে এবং ইচ্ছার বিষয়টি সন্দেহমুক্তভাবে প্রমাণিত হতে হবে।

৩. কোনরূপ জবরদস্তি ছাড়াই বিনা চাপে স্বেচ্ছায় হত্যা করতে হবে। যদি কারো চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারীকে তা'যীরের শাস্তি দিতে হবে। আর চাপ প্রয়োগকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফার মত। ইমাম যুফার ও অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে, চাপ প্রয়োগের কারণে কিসাসের বিধান রহিত হবে না; বরং হত্যাকারী ও চাপ প্রয়োগকারী উভয়কে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

৪. হত্যাকারীকে ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম বা স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হতে হবে।

হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ

১. হত্যাকাণ্ড সরাসরি হতে হবে। এটা হানাফী আলিমগণের অভিমত। তবে অন্যান্য মাযহাবের আলিমগণ বলেন, কিসাস কার্যকর করার অন্যান্য শর্ত পাওয়া গেলে কারণবশত হত্যাকাণ্ডের জন্যও হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে।

২. হত্যা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়মূলক বা সীমালঙ্ঘনমূলক হতে হবে। সুতরাং কেউ আইনসম্মত পন্থায় বা কাউকে তার অনুমতিক্রমে হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর কিসাস প্রযোজ্য নয়। অনুরূপ কেউ নিজের জান, মাল বা স্বীয় স্ত্রী-কন্যার সতীত্ব রক্ষার্থে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে গিয়ে হত্যা করলে তার উপরও কিসাস কার্যকর হবে না। এমনিভাবে যদি কোন পিতা-মাতা, শিক্ষক বা আইনানুগ অভিভাবকের শিষ্টাচার ও শিক্ষাদানমূলক শাস্তিতে কোন ছাত্র কিংবা সন্তানের মৃত্যু হয় তাতেও কিসাস কার্যকর হবে না।

৩. হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রে।

নিহত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ

১. নিহত ব্যক্তিকে পবিত্র ও নিরপরাধ হতে হবে- যাকে হত্যা করা শরীয়তে হারাম। তাই যিম্মী, কাফির, মুরতাদ, বিবাহিত ব্যভিচারী, বিদ্রোহীর হত্যার বদলে কোন মুসলিমকে কিসাস দেয়া যাবে না। এজন্য তাকে তা'যীরের শাস্তি দিতে হবে।

২. নিহত ব্যক্তির সাথে হত্যাকারীর পিতৃত্বের সম্পর্ক থাকা চলবে না। সুতরাং কোন পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী যদি তাদের নিজের সন্তান, বা নাতি-নাতনিকে হত্যা করে তাহলে কিসাস রহিত হবে এবং দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। আর যদি হত্যাকারী উর্ধ্বতন কাউকে যথা পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী এদের কাউকে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

সুরাকা ইবনু মালিক (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিতাকে হত্যার অপরাধে পুত্রের উপর কিসাস কার্যকর করেছেন আর পুত্র হত্যার অপরাধে পিতার উপর কিসাস কার্যকর করেননি।[৩৮৯]

৩. হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির মাঝে ধর্ম ও স্বাধীনতার দিক থেকে সমতা থাকতে হবে। সুতরাং কোন মুসলিম কোন কাফিরকে এবং কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন ক্রীতদাস-দাসীকে হত্যা করলে এজন্য কিসাস কার্যকর হবে না; বরং দিয়াত প্রযোজ্য হবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত।

নবী ﷺ বলেছেন: لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ কাফির হত্যার দায়ে কোন মু'মিনকে হত্যা করা যাবে না।[৩৯০]

---

[৩৮৯] *জামে আত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: পিতা পুত্রকে হত্যা করলে তার কিসাস হবে কি না, হাদীস নম্বর ১৩৯৯, পৃ. ৪৩৯।

[৩৯০] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: কাফির হত্যার দায়ে মুসলিমকে হত্যা করা হবে কি না, হাদীস নম্বর ৪৫৩০, পৃ. ১৯৪২।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনু আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে দাসের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।[৩৯১]

নিহতের অভিভাবকের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ

১. নিহতের অভিভাবক বা ওয়ারিস বিদ্যমান ও জানা থাকতে হবে। এরূপ দাবিদার খুঁজে পাওয়া না গেলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, এরূপ অবস্থায় সরকার দাবিদার হবে। সরকার চাইলে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে বা ক্ষমা করতে পারে।

২. নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে কিসাসের দাবি থাকতে হবে। যদি ওয়ারিসের পক্ষ থেকে কিসাস দাবি না করা হয় অথবা তাদের একজনও যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে কিসাস রহিত হবে এবং দিয়াত ওয়াজিব হবে।

ইবনু আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইচ্ছাকৃত হত্যায় অবশ্যই সদৃশ্য বদলা গ্রহণযোগ্য। তবে নিহতের ওয়ারিসরা ক্ষমা করলে ভিন্ন কথা।[৩৯২]

(গ) হত্যা সাব্যস্তকরণ : হত্যা সাব্যস্ত হবে-

১. হত্যাকারীর স্বেচ্ছায় হত্যার স্বীকারোক্তি দ্বারা।

২. অথবা সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা। এ ক্ষেত্রে দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষকে সাক্ষ্য দিতে হবে। একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্য কিসাসযোগ্য হত্যা প্রমাণে যথেষ্ট নয়। কিন্তু ভুলবশত হত্যা এবং কিসাসযোগ্য নয় এমন হত্যার ব্যাপারে একজন পুরুষের সাথে দু'জন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। হত্যার স্থান, সময় ও উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষীদের সাক্ষ্যে পূর্ণ মিল থাকতে হবে।

কোন কোন আলিমের মতে, শপথ এবং সুস্পষ্ট লক্ষণপ্রমাণ দ্বারাও হত্যা প্রমাণ করা যাবে। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, সাক্ষ্য-প্রমাণ বা স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কিসাস কিংবা দিয়াতযোগ্য হত্যা প্রমাণ করা যাবে না। অবশ্য শক্তিশালী কোন লক্ষণ পাওয়া গেলে শপথের মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণ করা যাবে।

(ঘ) মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের উপায়, তরবারির বিকল্প যন্ত্রদ্বারা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা প্রসঙ্গে, কে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে

হানাফী ও হাম্বলী আলিমগণের বিশুদ্ধ মতে, শুধুমাত্র তরবারি দ্বারা কিসাস কার্যকর করবে। অন্য কিছুর সাহায্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেবল তরবারির মাধ্যমে কিসাস কার্যকর করবে।[৩৯৩] তবে তরবারি হতে হবে খুবই তীক্ষ্ণ ও ধারালো, যাতে হত্যার কাজটি দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং আসামী অন্যভাবে কষ্ট না পায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করেছেন। কাজেই তোমরা যখন (কিসাস হিসেবে) হত্যা করবে, তখন হত্যাকার্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করবে।[৩৯৪]

মালিকী ও শাফিঈ আলিমগণের মতে, হত্যার কিসাস হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ঠিক সেভাবেই হতে হবে যেভাবে খুনি হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছিল।

---

[৩৯১] *সুনান আদ-দারাকুতনী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ ওয়াদ দিয়াত, হাদীস নম্বর ৩২২৫, পৃ. ১৫৯)

[৩৯২] *সুনান আদ-দারাকুতনী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ ওয়াদ দিয়াত, হাদীস নম্বর ৩১১২, পৃ. ১১৪।

[৩৯৩] *সুনান ইবনু মাজাহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু লা কাওদা ইল্লা বিস সাইফ, হাদীস নম্বর ২৬৬৮, পৃ. ২৭৭।

[৩৯৪] *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: অঙ্গচ্ছেদন করা নিষেধ হওয়া সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ১৪০৯, পৃ. ৪৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ

যখন তোমরা প্রতিশোধমূলক শাস্তি দিবে, তখন তোমরা তা ঠিক সেভাবেই দিবে, যেভাবে তোমরা নিজেরা শাস্তি পেয়েছ।[৩৯৫]

আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত। এক ইয়াহুদি দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে এক মুসলিম নারীর মাথা চূর্ণ করায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিসাসস্বরূপ উক্ত ইয়াহুদির মাথাকে দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করার আদেশ দিয়েছিলেন।[৩৯৬]

তরবারির বিকল্প যন্ত্রদ্বারা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা প্রসঙ্গে

তরবারীর মাধ্যমে কিসাস কার্যকর করা শরীয়তের বিধান। এর দ্বারা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে নিহতের আত্মীয়দের রাগ প্রশমিত হয় এবং শাস্তি অবলোকন করে তারা কিছুটা প্রশান্তিও লাভ করে। অনেক সময় মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঐ কঠিনতম সময়ে তাদের মনে দয়ার উদ্রেগ হলে তারা খুনিকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। এসব দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যুদণ্ড তরবারি দ্বারা জনসমক্ষে কার্যকর করাই উত্তম।

বর্তমান যুগে খুব সহজে প্রাণনাশের জন্য বিভিন্ন যন্ত্র আছে। যেমন- ইলেকট্রিক্যাল চেয়ার, ফাঁসি দেয়া ইত্যাদি। মিসরের জাতীয় ফতোয়া কমিটি মনে করেন যে, আধুনিক যন্ত্রদ্বারা কিসাস প্রয়োগ করা যাবে। কেননা, কিসাসের উদ্দেশ্য হল, কম কষ্টদানের মাধ্যমে খুব সহজে খুনিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া। ঐসব যন্ত্রপাতির দ্বারা তা করা সম্ভব। সুতরাং তা দ্বারা কিসাস কার্যকরে কোন বাধা নেই।[৩৯৭]

কে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে

অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির রক্তের বদলা নেয়ার অধিকার তার অভিভাবকের আছে। তবে কাউকে বক্তিগতভাবে এ অধিকার দেয়া হলে বাড়াবাড়ির আশংকা থাকে বিধায় সরকার বা তার অধীনে পরিচালিত ইসলামী বিচার ব্যবস্থার উপরই এ দায়িত্ব অর্পিত হবে।

তবে নিহতের অভিভাবক যদি নিজ হাতে কিসাস কার্যকরের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় এবং সরকার অথবা তার প্রতিনিধি এ কাজের জন্য তাকে উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে তাকে নিজ হাতে খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের অনুমতি দিতে পারেন। কিন্তু এ কাজটি সরকার কর্তৃপক্ষীয় লোকের উপস্থিতিতে করতে হবে, যেন মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি না হয়। নিহতের অভিভাবক সরকারের অনুমতি ব্যতীত খুনিকে হত্যা করলে সরকারের কর্তৃত্বের অবমাননা করায় সে তা'যীরের আওতায় শাস্তি পাবে।

(ঙ) কিসাসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

১. সরাসরি হত্যা না করে কোন মাধ্যম গ্রহণ করে হত্যা করা কিসাসের জন্য প্রতিবন্ধক।

২. একাধিক ব্যক্তি মিলে হত্যাকাণ্ড ঘটালে তাদের মধ্যে যারা সরাসরি হত্যার কাজে জড়িত নয়, তাদের উপর কিসাস কার্যকর হবে না।

৩. সন্তানকে বাবা হত্যা করলে তার পিতৃত্ব তাকে মৃত্যুদানে প্রতিবন্ধক।

---

[৩৯৫] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নাহল, ১৬/১২৬।

[৩৯৬] *সুনান ইবনু মাজাহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল দিয়াত, বাবু ইউকতাদু মিনাল কাতিলি কামা কাতালা, হাদীস নম্বর ২৬৬৫, পৃ. ২৭৭।

[৩৯৭] *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২-১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কোন মুসলিম কোন কাফিরকে হত্যা করলে বা কোন দাস কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করলে উভয়ের মাঝে দ্বীন ও স্বাধীনতা কিসাস কার্যকরে প্রতিবন্ধক হবে।

৫. হানাফী আইনবিদগণের মতে, হত্যাকাণ্ড কাফির (অমুসলিম) রাষ্ট্রে সংঘটিত হলে খুনির উপর কিসাস প্রযোজ্য নয়।

৬. হানাফী আলিমগণের মতে, নিহতের স্বজনদেরকে চিহ্নিত করা না গেলে কিসাস কার্যকর করা যাবে না।[৩৯৮]

(চ) যেসব অবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের কিসাস রহিত হয়

১. যদি হত্যাকারী মারা যায় বা অন্য কোন কারণে নিহত হয়, তাহলে কিসাস রহিত হবে। হানাফী আলিমগণের মতে, এ অবস্থায় দিয়াতও প্রযোজ্য নয়। তবে শাফিঈ ও হাম্বলী আলিমগণের মতে, তার পরিত্যক্ত সম্পদের মাধ্যমে দিয়াত দেয়া ওয়াজিব।

২. নিহতের ওয়ারিছরা হত্যাকারীর সাথে অর্থের বিনিময়ে সমঝোতা করলে কিসাস রহিত হবে।

৩. নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা হত্যাকরীকে ক্ষমা করে দিলে। যদি হত্যাকারী একাধিক হয় এবং তাদের মধ্যকার কোন একজনকে ক্ষমা করা হয়, তাহলে শুধুমাত্র ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কিসাস রহিত হবে আর অন্যদের কিসাস বহাল থাকবে।

(ছ) হত্যার আনুষঙ্গিক শাস্তিসমূহ

হত্যার শাস্তি হিসেবে কিসাস প্রয়োগের পাশাপাশি কিছু আনুষঙ্গিক শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে। যা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. কাফফারা: এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً

কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নয় তবে ভুলবশত হতে পারে। কেউ কোন মু'মিনকে ভুলক্রমে হত্যা করলে, একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা বা তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ দেয়া কর্তব্য, যদি না তারা ক্ষমা করে দেয়। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে একজন মু'মিন গোলাম আযাদ করা কর্তব্য, আর নিহত ব্যক্তি তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিম) কওমের লোক হলে তার পরিবারকে রক্তপণ দেয়া এবং একজন মু'মিন গোলাম আযাদ করা কর্তব্য, আর যে তা না পাবে তাকে একাধারে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। এটাই হল আল্লাহ্র নিকট তাওবাহ করার ব্যবস্থা, আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, সুবিজ্ঞ।[৩৯৯]

সুতরাং হত্যার কাফফারা হল একজন ঈমানদার কৃতদাস বা দাসী মুক্ত করা। যদি তা পাওয়া না যায় তবে একাধারে দু'মাস রোযা রাখা।

---

[৩৯৮] *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

[৩৯৯] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নিসা, ৪/৯২।

Dhaka University Institutional Repository

কোন মুসলিম অপর মুসলিমকে বা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অমুলিম নাগরিককে হত্যা করলে তাকে উক্ত কাফফারা দিতে হবে।

ভুলবশত ও প্রায় ভুলবশত এবং প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কাফফারা আদায় ওয়াজিব। শাফিঈ ও হাম্বলী আলিমগণের মতে, সব ধরনের হত্যায় কাফফারা ওয়াজিব।

২. অসিয়ত থেকে বঞ্চিত হওয়া: ইচ্ছাকৃত হত্যায় হত্যাকারী নিহতের অসিয়ত থেকেও বঞ্চিত হবে। এ মর্মে হাদীসে এসেছে-

আলী (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: হত্যাকারীর জন্য অসিয়ত নেই।[৪০০]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) প্রমুখের মতে, হত্যাকারী– ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশতভাবে যেভাবেই হত্যা করুক না কেন সে নিহত ব্যক্তির অসিয়ত থেকে বঞ্চিত হবে।

মালিকী আলিমগণ বলেন, অসিয়তের পরপরই অসিয়তকারীর মৃত্যু হলে খুনি অসিয়ত থেকে বঞ্চিত হবে, যদি সে সরাসরি ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড ঘটায়। আর যদি অসিয়তকারী আক্রান্ত হবার দীর্ঘ দিন পরে মারা যায়, তাহলে অসিয়ত বাতিল হবে না।

৩. মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া: ইচ্ছাকৃত হত্যায় হত্যাকারী নিহতের উত্তরাধিকারস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না, যদিও তার অন্য কোন ওয়ারিস না থাকে বা সে তার পিতা কিংবা পুত্র হয়।[৪০১]

হানাফী আলিমগণের মতে, কারণবশত হত্যায় এ বিধান প্রযোজ্য নয়। মালিকী আলিমগণের মতে, ভুলবশত এবং অন্যান্য হত্যায় এ বিধান প্রযোজ্য নয়। শাফিঈ ও হাম্বলী আলিমগণের মতে, কিসাস বা দিয়াতযোগ্য যে কোন ধরনের হত্যার জন্য হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে, যদিও হত্যাকারী নাবালক ও পাগল হয়।[৪০২]

---

[৪০০] ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬, কিতাবুল অসায়া, অনুচ্ছেদ: হত্যাকারীর জন্য অসিয়ত সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ১২৬৫২, পৃ. ৫৩৮।

[৪০১] ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬, কিতাবুল ফারায়িয, বাবু লা ইয়ারিসুল কাতিল, হাদীস নম্বর ১২২৪২, পৃ. ৪১৮।

[৪০২] *কিতাবুল ফিক্হি 'আলা মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-৩১৫; *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০১-৭১৭; ইবনু হাযম, *আল-মুহাল্লা*, (দারুল ফিক্র, বৈরুত-লেবানন, প্রকাশকাল ২০০১), খণ্ড ১০, পৃ. ২১৩-৩০০; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩৩, পৃ. ২৫৯-২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

মানবদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট কিসাসযোগ্য অপরাধ

(ক) প্রকারভেদ ও বিধান

মানবদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধ কয়েক ধরনের। যেমন–

১. অঙ্গহানি করা: কারো শরীরের কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা বা কেটে ফেলা। যেমন– হাত, পা, নখ, আঙ্গুল, কান, ঠোঁট, জিহ্বা, অণ্ডকোষ, গুপ্তাঙ্গ প্রভৃতি কেটে ফেলা কিংবা দাঁত, দাড়ি, মাথার চুল বা চোখের ভ্রূ উপড়িয়ে ফেলা।

২. অঙ্গের কর্মক্ষমতা বিনষ্ট করা: কারো বাকশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, চলারশক্তি, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি নষ্ট করে দেয়া।

৩. যখম করা: মাথা ও চেহারা ব্যতীত দেহের যে কোন স্থানে আঘাত করে স্থায়ী বা অস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করা।

৪. চেহারায় আঘাত করা অথবা মাথা ফাটানো।

মানবদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট কিসাসযোগ্য অপরাধ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন:

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

অতএব, তোমাদেরকে যে যেটুকু আক্রমণ করবে, তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে।[৪০৩]

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

আমরা তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমসমূহের বদলে অনুরূপ যখম।[৪০৪] সুতরাং অপরাধী কারো শরীরের যতটুকু ক্ষতি করবে কিসাস হিসেবে তার শরীরেরও ঠিক সে অঙ্গের ততোখানি ক্ষতি সাধন করা হবে। আর "যখমসমূহের বদলে অনুরূপ যখম" এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে- যে ক্ষেত্রে যখমের সমপরিমাণ বদলা নেয়া সম্ভব, শুধু সে ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে আর যেসব ক্ষেত্রে তা অসম্ভব সে ক্ষেত্রে দিয়াত বা সাধারণ কোন দণ্ড দেয়া হবে। মানবদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধে যেসব অঙ্গের কিসাস বাধ্যতামূলক হবে তা হলো- ১. হাত ও পায়ের কিসাস; ২. চোখের কিসাস; ৩. কানের কিসাস; ৪. নাকের কিসাস; ৫. দাঁতের কিসাস; ৬. জিহবার কিসাস; ৭. ওষ্ঠের কিসাস; ৮. স্তনের কিসাস; ৯. মাথা ফাটার কিসাস; ১০. পুরুষাঙ্গের কিসাস; ১১. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা বিনষ্ট করার কিসাস।

উল্লেখ্য যে, হাড় ভাঙ্গার জন্য কোন কিসাস নেই। এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত। হাড়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা রক্ষা করে প্রতিশোধ বা বদলা নেয়া দুরূহ ব্যাপার, সেজন্য এ ব্যাপারে কিসাস না থাকাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

মালিকী আলিমগণের মতে, শরীরের যেসব হাড়ে গুরুতর বিপদের ঝুঁকি আছে (যেমন- ঘাড়, পিঠ, বুক ও উরুর হাড়) তাতে কিসাস প্রয়োগ হবে না। এ ক্ষেত্রে বিচারক অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে তা'যীরের আওতায় ক্ষতিপূরণসহ কোন সাধারণ দণ্ড দিবে।

---

[৪০৩] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/১৯৪।

[৪০৪] আল-কুরআন: সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫/৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) মানবদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধের কিসাস আবশ্যক হওয়ার শর্তসমূহ

১. অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনমূলক অপরাধ হওয়া।

২. অপরাধ ইচ্ছাকৃত বা শত্রুতামূলক সংঘটিত হওয়া। মালিকী আলিমগণ বলেন, খেলাধুলা বা শিক্ষাদানমূলক শাস্তিতে শরীরে কোন ক্ষতি হলে তাতে কিসাস ওয়াজিব নয়।

৩. অপরাধী ও আহত ব্যক্তি উভয়ের সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহের মধ্যে কার্যক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যগত মিল থাকতে হবে।

৪. অপরাধী ও আহত ব্যক্তির মধ্যে লিঙ্গের মিল থাকা। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য অপরাধী ও আহত ব্যক্তির মধ্যে লিঙ্গের মিল থাকা শর্ত নয়।

৫. অপরাধী ও আহত ব্যক্তির মধ্যে ধর্মগত মিল থাকা। কতিপয় আলিম এটিকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন আর কতিপয় আলিমের মতে, ধর্মগত মিল থাকাটা শর্ত নয়।

৬. অপরাধী ও আহত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিল থাকতে হবে। অর্থাৎ অপরাধী আহত ব্যক্তির যে অঙ্গের ক্ষতি করেছে, তার অনুরূপ অঙ্গ বিদ্যমান থাকা। হাতের বদলে শুধু হাতে এবং পায়ের বদলে শুধু পায়ে কিসাস প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে ডান-বাম, উপর-নীচ, সামনে-পিছনে প্রভৃতি পার্থক্য থাকলে তাতে সমতা থাকতে হবে। সুতরাং ডান হাতের বদলে ডান হাত এবং বাম হাতের বদলে বাম হাত, সামনের দাঁতের বদলে সামনের দাঁত, উপরের দাঁতের বদলে উপরের দাঁত এবং নিচের দাঁতের বদলে নীচের দাঁতে কিসাস কার্যকর হবে। দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে একই ধরনের সমতা থাকতে হবে।

৭. অপরাধী ও আহত ব্যক্তির মধ্যে সংখ্যাগত মিল থাকা। অর্থাৎ যদি একাধিক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে কারো হাত বা পা ইত্যাদি কেটে ফেললে, এজন্য কোন অপরাধীর উপরই কিসাস বাধ্যতামূলক হবে না; বরং সকলের উপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। এটা হানাফীগণের অভিমত। তবে অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে, যদি দলের সকল অপরাধীর ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণ করা না যায় তাহলে সবার উপর কিসাস কার্যকর হবে। আর যদি দলের মধ্যে কার কী ভূমিকা ছিল তা নিরূপণ করা সম্ভম হয় তাহলে এক্ষেত্রে শাফিঈ ও হাম্বলী আলিমগণের অভিমত হলো, কারো উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না; বরং প্রত্যেকের উপর তার অপরাধ অনুপাতে দিয়াতের অংশ (আর্থিক দণ্ড) বাধ্যতামূলক হবে। আর মালিকী আলিমগণের অভিমত হলো, প্রত্যেকের উপর তার অপরাধ অনুপাতে কিসাস আবশ্যক হবে।

৮. অপরাধের বদলায় সীমালঙ্ঘন না করে সমপরিমাণ বদলা নিতে হবে। সুতরাং কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কারো হাত বা পা ভেঙ্গে দিলে কিসাসস্বরূপ অপরাধীর হাত বা পা কাটা যাবে না।

(গ) যেসব অবস্থায় মানবদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধের কিসাস রহিত হয়

১. অপরাধী মারা গেলে বা অন্য কোন কারণে নিহত হলে।

২. আহত ব্যক্তির নির্দিষ্ট যে অঙ্গে ক্ষতি সাধন করা হয়েছে, ঐ নির্দিষ্ট অঙ্গ অপরাধীর না থাকলে কিসাস রহিত হবে।

৩. যদি আহত ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়। তবে অপরাধীকে ক্ষমা করার পর যদি আহত ব্যক্তি যখমের প্রতিক্রিয়ায় মারা যায়, তাহলে ক্ষমা বাতিল হবে। কারণ কিসাস নেয়া ওয়ারিছদের অধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

৪. আহত ব্যক্তি বা তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিছরা যখমকারীর সাথে অর্থের বিনিময়ে সমঝোতা করলে।[৪০৫]

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামে কিসাস প্রয়োগের বিধান কার্যকরই মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কিসাস কার্যকর করা হলে মানুষ ভয়ে অপরাধ ত্যাগ করবে। কোন মানুষকে হত্যা করলে বা দৈহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলে অপরাধীকেও ঠিক ঐ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করতে হবে- এই ভীতি সমাজে অপরাধের মাত্রা রোধ করতে সক্ষম। আজকাল মানুষ তার অপরাধের অনুরূপ শাস্তি পায় না বিধায় কিংবা হালকা শাস্তি পেয়ে ছাড়া পেয়ে যায় বলেই অপরাধ কমার পরিবর্তে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরাধীর মন থেকে ভয়-ভীতি উঠে যাচ্ছে। আইনী দুর্বলতা ও আইন প্রয়োগের শিথিলতার সুযোগে অপরাধীরা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। সুতরাং মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে কিসাসের বিধান প্রয়োগই হতে পারে এ দুরাবস্থা থেকে উত্তোরণের উপায়।

---

[৪০৫] *কিতাবুল ফিক্‌হি 'আলা মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬-৩৭৫; *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৫-৭৫৭; *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭-২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

[৯]. দিয়াত সম্পর্কে আলোচনা

কিসাস রহিত হলে তার বিকল্প হিসেবে দুই ধরনের শাস্তি রয়েছে। ১. দিয়াত; ২. তা'যীরী শাস্তি। এখানে দিয়াত সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হল।

(ক). দিয়াত-এর পরিচয়

দিয়াত হল খুনের বদলে বা মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বদলে অপরাধীর উপর আরোপিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক দণ্ড। দিয়াত প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

অতঃপর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে ন্যায়নীতির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তা আদায় করা উচিত। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সহজীকরণ ও রহমত বিশেষ।[৪০৬]

فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

আর কেউ কিসাস ক্ষমা করে দিলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে।[৪০৭]

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার কোন ব্যক্তি নিহত হবে, তার দুটি স্বাধীনতা রয়েছে। সে ইচ্ছে হলে রক্তমূল্য নিবে, (অথবা) ইচ্ছে হলে কিসাস গ্রহণ করবে।[৪০৮]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ε رُفِعَ إِلَيْهِ شَىْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .

আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে কিসাসের কোন মামলা এলে তিনি তা ক্ষমা করে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।[৪০৯]

উল্লেখ্য, এমন কয়েকটি শব্দ প্রচলিত আছে যা প্রায় দিয়াতের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

আরশ: নির্দিষ্ট দিয়াতের পরিমাণ যখন পূর্ণ দিয়াতের চেয়ে কম হয়, তখন তাকে আরশ বলা হয়। সাধারণত বিচারক যখমের ক্ষেত্রে আরশ বা আংশিক দিয়াত অর্থদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করতে পারেন। কখনো খুনের বদলে হত্যাকারীর উপর আরোপিত নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক দণ্ডকেও আরশ বলে।

গুররা: গুররা হলো ভ্রূণ হত্যার বদলে অপরাধীর উপর আরোপিত আর্থিক দণ্ড। এর পরিমাণ হলো পূর্ণ দিয়াতের বিশভাগের একভাগ।

হুকুমাতুল 'আদল: অর্থাৎ যার পরিমাণ নির্ধারিত নয়। মানবদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের বদলে আর্থিক দণ্ডের পরিমাণ ইসলামী শরীয়ত নির্দিষ্ট করেনি; বরং পরিমাণ নির্ধারণ বিচারকের ইচ্ছাধীন করেছে তাকে হুকুমাতুল 'আদল বলা হয়।

(খ) যেসব অবস্থায় দিয়াত বাধ্যতামূলক

---

[৪০৬] আল-কুরআন: সূরাহ আল-বাকারা, ২/১৭৮।

[৪০৭] আল-কুরআন: সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫/৪৫।

[৪০৮] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল দিয়াত, অনুচ্ছেদ: কাউকে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারীরা দু'রকমের শাস্তির যে কোন একটি দেয়ার অধিকার রাখে, হাদীস নম্বর ৬৮৮০, পৃ. ৮২০।

[৪০৯] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: শাসক বা বিচারক যদি খুনিকে ক্ষমা করার আদেশ দেন, হাদীস নম্বর ৪৪৯৭, পৃ. ১৯২৫।

Dhaka University Institutional Repository

নিহতের ওয়ারিছগণ বা আহত ব্যক্তি নিজেই কিসাসের বদলে দিয়াত গ্রহণে রাজি হলে কিংবা উভয় পক্ষের মধ্যে দিয়াতের ব্যাপারে সমঝোতা হলে দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। আর যে সকল ক্ষেত্রে কিসাস প্রয়োগ নিষিদ্ধ (যেমন– পুত্র হত্যার বদলে খুনি পিতার কিসাস) সেসব ক্ষেত্রেও দিয়াত বাধ্যতামূলক। প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা, কারণবশত হত্যা ও যখম, ভুলবশত হত্যা এবং ভুলবশত যখমের জন্য দিয়াত বাধ্যতামূলক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা পাগল হত্যা বা কিসাসযোগ্য অপরাধ করলে তাতেও দিয়াত বাধ্যতামূলক।

(গ) দিয়াত ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) হবার শর্তসমূহ

১. নিহত ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে পবিত্র ও নিরপরাধ হতে হবে।

২. হত্যা ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হতে হবে। এটা হানাফী আলিমগণের অভিমত। আর অন্যান্য মাযহাবের আলিমগণের অভিমত হলো, দিয়াত ওয়াজিব হবার জন্য হত্যাকাণ্ড ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হওয়া শর্ত নয়। তাই কেউ অমুসলিম রাষ্ট্রে কোন মুসলিমকে হত্যা করলে হত্যাকরীর উপর দিয়াত ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, নিহত ব্যক্তি বা হত্যাকারী উভয়কে মুসলিম, সাবালক বা জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া দিয়াতের জন্য শর্ত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

[১০]. মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধের দিয়াতের পরিমাণ ও ধরন

মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার অপরাধের দিয়াতের পরিমান ও ধরন নিম্নে তুলে ধরা হলো।

(ক) বিভিন্ন প্রকার হত্যার দিয়াত

হত্যার অবস্থা বুঝে এর দিয়াতের ধরন বা পরিমাণে পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল।

১. ভুলবশত হত্যার দিয়াত

ভুলবশত হত্যায় কিসাস নেই। এ ক্ষেত্রে দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে এবং হত্যাকারীকে হত্যার কাফফারাও দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً

কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নয় তবে ভুলবশত হতে পারে। কেউ কোন মু'মিনকে ভুলক্রমে হত্যা করলে, একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা বা তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ দেয়া কর্তব্য, যদি না তারা ক্ষমা করে দেয়। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তাহলে একজন মু'মিন গোলাম আযাদ করা কর্তব্য, আর যদি সে এমন গোত্রের লোক হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তবে তার পরিবারকে রক্তপণ দেয়া এবং একজন মু'মিন গোলাম আযাদ করা কর্তব্য এবং যে ব্যক্তি আর্থিক দিক দিয়ে সামর্থহীন সে একাধারে দুই রোযা রাখবে। এটাই হল আল্লাহ্র নিকট তাওবা করার ব্যবস্থা, আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, সুবিজ্ঞ।[৪১০]

ভুলবশত হত্যার দিয়াতের পরিমাণ:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ε قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ .

'আমর ইবনু শু'আইব হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ভুলবশত হত্যার দিয়াত হবে একশো উট। এর মধ্যে ত্রিশটি হবে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং দশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উট।[৪১১]

আরেক হাদীসে রয়েছে: আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ε " فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُرٌ " .

---

[৪১০] আল-কুরআন, সূরাহ আন-নিসা, ৪/৯২।

[৪১১] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: দিয়াতের পরিমাণ কত, হাদীস নম্বর ৪৫৪১।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: ভুলবশত হত্যার দিয়াত হলো বিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, বিশটি পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, বিশটি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, বিশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং বিশটি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উট।[৪১২]

দিয়াত হিসেবে উটের পরিবর্তে ১০০০ (এক হাজার) দীনার বা ১০০০০ (দশ হাজার) দিরহাম[৪১৩] অথবা এর সমপরিমাণ যে কোন অর্থসম্পদও দেয়া যাবে।

দিয়াত পরিশোধের সময়সীমা: হত্যাকারীর বংশের লোকদেরকে তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তিন কিস্তিতে দিয়াত পরিশোধ করতে হবে। উমার (রাযি.) সাহাবীগণের উপস্থিতিতে এরূপ ফায়সালা দিয়েছিলেন।[৪১৪] কোন সাহাবী তার বিরোধিতা করেননি।

২. প্রায় ভুলবশত ও কারণবশত হত্যার দিয়াত

প্রায় ভুলবশত ও কারণবশত হত্যার দিয়াত ভুলবশত হত্যার অনুরূপ হবে।

৩. ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত

ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হলো কিসাস। তবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা হত্যাকারীর সাথে দিয়াতের সমঝোতা করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে দিয়াত কঠোর হবে। এ কঠোরতা হবে তিন দিক থেকে। ১. হত্যাকারীকেই দিয়াতের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। ২. সম্পূর্ণ অর্থ নগদ পরিশোধ করতে হবে। ৩. দিয়াত হিসেবে প্রদেয় উটের উচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করা হবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কাছে সমর্পণ করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবে অথবা দিয়াত গ্রহণ করবে। দিয়াতের পরিমাণ হল- ত্রিশটি তিন বছর বয়সের, ৩০টি চার বছর বয়সের (উট) এবং ৪০টি গর্ভবতী উষ্টী। আর যদি তারা সমঝোতা করে নেয় তাহলে যে পরিমাণের বিনিময়ে সমঝোতা হয়েছে, তারা তা-ই পাবে। দিয়াতের কঠোরতা সৃষ্টির জন্যই এ বিধান করা হয়েছে।[৪১৫] নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছদের জন্য এর চেয়ে অধিক পরিমাণ দাবি করা বৈধ নয়। তবে এর চেয়ে কম পরিমাণের উপরও সমঝোতা হতে পারে।

৪. প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত

প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি কিসাস নয়; বরং কঠোর দিয়াত। এরূপ হত্যার দিয়াতে প্রদেয় উটগুলো উচ্চ বয়সের হতে হবে। অর্থাৎ একশত উষ্ট্রীর মধ্যে ত্রিশটি চার বছর বয়সের; ত্রিশটি তিন বছর বয়সের উট এবং ৪০টি গর্ভবতী উষ্ট্রী দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যায় নিহত অর্থাৎ বেত ও লাঠি আঘাতে নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একশটি উট দিতে হবে। তন্মধ্যে ৪০টি গর্ভবতী হতে হবে।[৪১৬]

অধিকাংশ ইমামের মতে, এ দিয়াত পরিশোধের দায়িত্ব ভুলবশত হত্যার মতোই হত্যাকারী এবং তার বংশের লোকদের উপর বর্তাবে এবং তারা তিন বছরের মধ্যে তিন কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবে।

---

[৪১২] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: দিয়াতের পরিমাণ কত, হাদীস নম্বর ৪৫৪৫।

[৪১৩] এটা হানাফী আলিমগণের অভিমত। অন্যান্য ইমামগণের মতে, ১২০০০ দিরহাম।

[৪১৪] ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু তানজীমিদ্ দিয়াতি আলাল 'আকিলাতি, হাদীস নম্বর ১৬৩৯০, পৃ. ৩০৭।

[৪১৫] *সুনান ইবনু মাজাহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু মান কাতালা আমদান ফারাযু বিদ্দিয়াত, হাদীস নম্বর ২৬২৬, পৃ. ২৭৩।

[৪১৬] ইমাম আবদুর রাযযাক, *আল-মুসান্নাফ*, (দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-লেবানন, ২০১০), ৯ম খণ্ড, কিতাবুল উকুল, বাবু দিয়াতু শুবহিল আমদি, হাদীস নম্বর ১৭৫২৫, পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) হত্যার দিয়াত কী দিয়ে পরিশোধ করবে

দিয়াত আদায়ের প্রধান সামগ্রী হলো উট। তাই উট পাওয়া গেলে উট দিয়ে দিয়াত আদায় করবে। এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত। কিন্তু উট পাওয়া না গেলে বা তা সংগ্রহ করা কঠিন হলে এর সমতুল্য দিয়াত বিভিন্ন উপকরণ বা নগদ অর্থে পরিশোধ করা যাবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও চার খলীফার যুগে নগদ অর্থ পূর্ণ দিয়াতের পরিমাণ উটের সমসাময়িক বাজার মূল্যের উঠা-নামার ভিত্তিতে স্বর্ণমুদ্রায় ৪০০ (চার শত) দীনার থেকে ১০০০ (এক হাজার) দীনার পর্যন্ত এবং রৌপ্য মুদ্রায় ৮০০০ (আট হাজার দিরহাম) থেকে ১২০০০ (বার হাজার দিরহাম) পর্যন্ত উন্নীত হয়।[৪১৭]

উমার (রাযি.) স্বর্ণের মালিকদের উপর এক হাজার দীনার আর রৌপ্যের মালিকদের উপর বার হাজার দিরহাম দিয়াতস্বরূপ নির্ধারণ করতেন।[৪১৮] উমার (রাযি.) কাপড় ব্যবসায়ীদের উপর দুইশো জোড়া কাপড় দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৪১৯] রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাদের গরু আছে তাদের কাছ থেকে পূর্ণ দিয়াত হিসেবে দুইশো গরু এবং যাদের বকরী আছে, তাদের কাছ থেকে দুই হাজার বকরী গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।[৪২০] সুতরাং উট, সোনা, রূপা, গরু, ছাগল ও কাপড় দিয়েও দিয়াত আদায় করা যাবে।

(গ) ইচ্ছাকৃত হত্যার দ্বিতীয় বিকল্প শাস্তি তা'যীর

ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি কোন কারণে কিসাস বা দিয়াত কিংবা উভয়টি রহিত হয়ে যায়, তবুও অপরাধীর কিছু শাস্তি হওয়া উচিত কিনা এ ব্যাপারে অধিকাংশ আলিম বলেন, হত্যাকারী পেশাদার দুষ্কৃতিকারী হলে সরকার তাকে তা'যীরের আওতায় যে কোন শাস্তি দিতে পারবে। তাকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, অথবা দিয়াতের সাথে কারাভোগের শাস্তিও দিতে পারেন। তা'যীরী শাস্তি দেয়া বা না দেয়া সরকারের ইচ্ছাধীন। সরকার জনগণের কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবেন।

মালিকী আলিমগণের মতে, কিসাস ক্ষমার ক্ষেত্রে সরকার অবশ্যই খুনিকে তা'যীরী শাস্তি দিবেন। তা হলো- একশত বেত্রাঘাত বা এক বছরের কারাদণ্ড।

(ঘ) দিয়াতের পরিমাণ

১. পুরুষ হত্যার দিয়াতের পরিমাণ: একশোটি উট বা তার সমতুল্য অর্থ-সম্পদ।[৪২১]

২. নারী হত্যার দিয়াতের পরিমাণ: পুরুষের অর্ধেক। এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত।

মু'আয বিন জাবাল (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মহিলার দিয়াত হল পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক।[৪২২] এ বিধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা ও যখমের জন্যও প্রযোজ্য।[৪২৩] আলী (রাযি.)

---

[৪১৭] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: দিয়াতের পরিমাণ কতো, হাদীস নম্বর ৪৫৪২, পৃ. ১৯৪৭-৪৮।

[৪১৮] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: দিয়াতের পরিমাণ কতো, হাদীস নম্বর ৪৫৪২।

[৪১৯] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: দিয়াতের পরিমাণ কতো, হাদীস নম্বর ৪৫৪২।

[৪২০] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: দিয়াতের পরিমাণ কতো, হাদীস নম্বর ৪৫৪৩, পৃ. ১৯৪৮।

[৪২১] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: দিয়াতের পরিমাণ কত, হাদীস নম্বর ৪৫৪১; ইমাম আবদুর রাযযাক, *আল-মুসান্নাফ*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, কিতাবুল উকুল, বাবু দিয়াতু শুবহিল আমদি, হাদীস নম্বর ১৭৫২৫, পৃ. ১৮৬; *সুনান ইবনু মাজাহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু মান কাতালা আমদান ফারাযু বিদ্‌দিয়াত, হাদীস নম্বর ২৬২৬, পৃ. ২৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, হত্যা ও মানবদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে মহিলার দিয়াত হল পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক।[৪২৪]

৩. অমুসলিম এর দিয়াতের পরিমাণ: এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিম) জাতির লোক হয়, তাহলে তার পরিবারকে দিয়াত দেয়া বিধেয়।[৪২৫]

হানাফী আলিমগণের মতে, মুসলিম ও অমুসলিম সকলের দিয়াত সমান।[৪২৬] আর অন্যান্য ইমামগণের মতে, অমুসলিমের দিয়াত মুসলিমের অর্ধেক।[৪২৭]

৪. ভ্রূণ হত্যার দিয়াত: ক. যদি অপূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ নষ্ট করা হয় তবে অপরাধীর উপর দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূক নয়। বিচারক চাইলে তাকে তা'যীরের আওতায় যে কোন শাস্তি দিতে পারেন। যদি তা ঐ মহিলার জীবন রক্ষা বা প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য না হয়। তবে গর্ভপাত ঘটানোর ফলে ঐ মহিলার প্রতি কোন আঘাত ঘটানো হলে বা সে মারা গেলে অপরাধী উপর্যুক্ত আঘাত বা মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে। স্বামী, এমনকি মহিলা যদি নিজেও নিজের গর্ভপাত ঘটায়, তাতেও বিচারক তাদেরকে তা'যীরের আওতায় যে কোন শাস্তি দিতে পারবেন।

খ. কেউ কোন মহিলার পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ নষ্ট করল যার কিছু বা পূর্ণ অবয়ব গঠিত হয়েছে এবং যদি তা উক্ত নারীর জীবন রক্ষার্থে বা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করার জন্য না হয়ে থাকে, তাহলে গর্ভস্থ শিশু- ছেলে হোক বা মেয়ে হোক– মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলে বা জীবিত ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারা গেলে সংখ্যা অনুযায়ী

---

[৪২২] ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: মহিলার দিয়াত সম্পর্কে, হাদীস নম্বর ১৬৩০৫, পৃ. ২৮৩।

[৪২৩] এটা হানাফী ও শাফিঈ আলিমগণের অভিমত। মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেলায় দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মহিলা পুরুষের সমান অংশ পাবে। দিয়াতের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশের বেশি হলে মহিলার দিয়াত হবে পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মহিলার দিয়াত পুরুষের দিয়াতের সমান হবে। (*সুনান আদ-দারাকুতনী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ ওয়াদ দিয়াত, হাদীস নম্বর ৩১০৫, পৃ. ১১০-১১১)

[৪২৪] ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু মা জাআ ফী জিরাহিল মারআতি, হাদীস নম্বর ১৬৩০৯, পৃ. ২৮৪।

[৪২৫] আল-কুরাআন: সূরাহ আন-নিসা, ৪/৯২।

[৪২৬] এর দলীল হল, আলী (রাযি.) বলেন, ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও প্রত্যেক অমুসলিম (যিম্মী) নাগরিকের দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের অনুরূপ। (ইমাম আবদুর রাযযাক, *আল-মুসান্নাফ*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, কিতাবুল উকুল, বাবু দিয়াতিল মাজুসী, হাদীস নম্বর ১৮৮১৭, পৃ. ৪২২)

ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, নবী ﷺ, আবূ বকর, উমার ও উসমান (রাযি.)-এর যুগে (ইয়াহুদী, নাসারা) যিম্মীর দিয়াত ছিল মুসলিমের দিয়াতের সমপরিমাণ। (ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: দিয়াতু আহলিয যিম্মাতি, হাদীস নম্বর ১৬৩৫৪, পৃ. ২৯৬)

[৪২৭] এর পক্ষে দলীল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের দিয়াত স্বাধীন মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক। (*সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: যিম্মীর দিয়াত, হাদীস নম্বর ৪৫৮৩, পৃ. ১৯৬৩)

আরেক হাদীসে রয়েছে: কাফিরের দিয়াত মু'মিনের দিয়াতের অর্ধেক। (*জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: কাফিরের দিয়াত প্রসঙ্গে, হাদীস নম্বর ১৪১৩, পৃ. ৪৪৬)

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি শিশুর জন্য আলাদাভাবে দিয়াতের বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ পাঁচটি উট বা পঞ্চাশ দীনার দেয়া ওয়াজিব।

আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইল গোত্রের এক নারীর গর্ভ নষ্ট করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশভাগের একভাগ দিয়াত দেয়ার নির্দেশ দেন।[৪২৮]

আর যদি গর্ভপাত ঘটানোর কারণে উক্ত মহিলার প্রতি কোন আঘাত ঘটানো হয় বা সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে অপরাধী উপর্যুক্ত আঘাত বা মৃত্যুর জন্যও নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে। স্বামী, এমনকি মহিলা যদি নিজেই নিজের গর্ভপাত ঘটায়, তার উপরও উপর্যুক্ত নিয়মে দিয়াত প্রদান ওয়াজিব।[৪২৯]

---

[৪২৮] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: মহিলার ভ্রূণ, হাদীস নম্বর ৬৯০৪, পৃ. ৮২৩।

[৪২৯] *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৭-৭৪৩; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১২, পৃ. ৬-১০৪; *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭-২৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

[১১]. মানবদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহের দিয়াত

মানবদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন অপরাধের জন্য কিসাস প্রয়োগ অসম্ভব হলে অপরাধীর উপর দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। মানব দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট দিয়াতযোগ্য অপরাধ কয়েক ধরনের। ১. অঙ্গহানি বা অঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট করা; ২. যখম করা; ৩.মুখমণ্ডলে আঘাত বা মাথা ফাটানো (শিজাজ)

(এক). অঙ্গহানি বা অঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট করার দিয়াত

অঙ্গহানি বা অঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট করার দিয়াত কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

পূর্ণ দিয়াত ও আংশিক দিয়াত: পূর্ণ দিয়াত হল, একশটি উট অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য। এ দিয়াত হত্যার জন্য প্রযোজ্য। একইভাবে মানবদেহের যেসব অঙ্গ একটি করে আছে (যথা- জিহ্বা, নাক, পুরুষাঙ্গ, নারীর যৌনাঙ্গ, গুহ্যদ্বার, মুত্রনালী, মেরুদণ্ড প্রভৃতি) অপরাধী যদি এসবের কোন একটি অঙ্গ কর্তন, বিচ্ছিন্ন বা তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয় তাতেও পূর্ণ দিয়াত (১০০ উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য) বাধ্যতামূলক।

আর মানবদেহে যেসব অঙ্গ দুটি করে আছে (যেমন– হাত, পা, কান, চোখ, ভ্রূ, স্তন, প্রভৃতি) অপরাধী যদি এসব অঙ্গের দুটিই কর্তন, বিচ্ছিন্ন বা তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয় তাহলে পূর্ণ দিয়াত (১০০ উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য) প্রদান বাধ্যতামূলক। আর যদি দুইয়ের কোন একটি কর্তন, বিচ্ছিন্ন, বা তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে (যেমন- একটি হাত বা পা বিচ্ছিন্ন করল) এক্ষেত্রে অর্ধেক দিয়াত (৫০টি উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য) বাধ্যতামূলক হবে।

আর যদি এমন হয় যে, এক জাতীয় একাধিক অঙ্গের মধ্যে একটি অঙ্গ আগে থেকেই সুস্থ ছিল এবং অপরটি আগে থেকেই অকেজো ছিল, এক্ষেত্রে সুস্থ অঙ্গটির ক্ষতিসাধন করলে পূর্ণ দিয়াত (১০০ উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য) দিবে। এটা মালিকী ও হাম্বলী আলিমগণের অভিমত। আর অন্যান্য ইমামগণের মতে, এরূপ অবস্থায়ও অর্ধেক দিয়াত (৫০টি উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য) বাধ্যতামূলক হবে।

মানবদেহে যে অঙ্গের চারটি প্রত্যঙ্গ আছে (যেমন– চোখের পাতা ও অক্ষীপক্ষ), কেউ ঐ অঙ্গের সব প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন করলে পূর্ণ দিয়াত (১০০ উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য) এবং তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গের জন্য দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ (২৫টি উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য) প্রদান করবে।

মানবদেহে যে অঙ্গের দশটি প্রত্যঙ্গ আছে (যেমন– হাত ও পায়ের আঙ্গুল), অপরাধী সে অঙ্গের সব প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন করলে পূর্ণ দিয়াত (১০০ উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য) দিবে এবং তার প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গের জন্য পূর্ণ দিয়াতের এক-দশমাংশ (১০টি উট বা সমপরিমাণ অর্থ) প্রদান করবে।

মানবদেহে যে অঙ্গে বিশের অধিক প্রত্যঙ্গ আছে (যেমন– দাঁতের সংখ্যা সাধারণত ৩২ হয়ে থাকে) তার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গের দিয়াতের পরিমাণ হবে বিশভাগের এক ভাগ (৫টি উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য)। কেউ যদি সে অঙ্গের সব প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন করে তাহলে পূর্ণ দিয়াত (১০০ উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য) এবং এর অতিরিক্ত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।

মাথার চুল বা দাড়ি উৎপাটন করা হলে এবং তা পুনরায় না গজালে পূর্ণ দিয়াত (১০০ উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য) বাধ্যতামূলক। ভ্রুর চুল উৎপাটন করলে এবং তা পুনরায় না গজালে দুই ভ্রুর জন্য পূর্ণ দিয়াত (১০০ উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য) এবং এক ভ্রুর জন্য পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক (৫০টি উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য) ওয়াজিব। গোঁফ উৎপাটন করলে এবং তা পুনরায় না গজালে হানাফী ও হাম্বলী আলিমগণের মতে বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী তার দিয়াত নির্ধারণ করবেন। মালিকী ও শাফিঈ

Dhaka University Institutional Repository

আলিমগণ বলেন, উপর্যুক্ত যে কোন স্থানের চুল উৎপাটনের ব্যাপারে বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী তার দিয়াত নির্ধারণ করবেন।

মুখের ত্বক উৎপাটনের ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াত (১০০ উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য) বাধ্যতামূলক। আর যদি দেহের ত্বক এমনভাবে উৎপাটন বা কর্তন করা হয় যে, আক্রান্ত স্থানে লোম গজায়নি, এরূপ অবস্থায় বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত নির্ধারণ করবেন। বিচারক চাইলে অপরাধীকে তা'যীরের যে কোন শাস্তিও দিতে পারবেন।

অনির্ধারিত দিয়াত: মানবদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব অপরাধের জন্য 'আরশ' নির্ধারিত নেই, সে ক্ষেত্রে বিচারক আঘাতের অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বুঝে দিয়াত ধার্য করবেন। যেমন– কেউ কারো কোন অঙ্গ গ্রন্থিসন্ধি থেকে না কেটে তার নিম্নাংশ থেকে কেটে ফেলল। ইসলামী আইনবিদগণের মতে, এ অবস্থায় কিসাস কার্যকর অসম্ভব আর এর জন্য নির্ধারিত আরশও নেই। কাজেই এ অবস্থায় বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত ধার্য করবেন। কারো শরীরে গজানো অতিরিক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (যথা- হাতে বা পায়ে অতিরিক্ত আঙ্গুল) ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রেও অনির্ধারিত দিয়াত প্রযোজ্য।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি মানবদেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুরো নয়; বরং আংশিক ক্ষতিসাধন করে তাহলে ক্ষতি অনুপাতে দিয়াত নির্ধারণ করা হবে। ক্ষতির অনুপাত নির্ধারণ করা দুরূহ হলে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত নির্ধারণ করবেন। প্রত্যঙ্গের দিয়াত সংশ্লিষ্ট অঙ্গের দিয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে; তাই এক্ষেত্রে কেবল অঙ্গের জন্য নির্ধারিত দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।

পূর্ণ ও আংশিক দিয়াত সম্পর্কে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হল-

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক হাতের জন্য ৫০টি উট।[৪৩০] এক পায়ের জন্য পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক (৫০টি উট)। হাত ও পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত ১০টি উট। দুই চোখের জন্য পূর্ণ দিয়াত (১০০টি উট)। আর এক চোখের জন্য ৫০টি উট। পুরো নাক কেটে ফেললে পূর্ণ দিয়াত (১০০টি উট)।[৪৩১] এক কানের দিয়াত ৫০টি উট।[৪৩২] দুই ওষ্ঠের জন্য পূর্ণ দিয়াত (১০০টি উট)।[৪৩৩] প্রতিটি দাঁতের দিয়াত ৫টি উট।[৪৩৪] জিহ্বাতেও পূর্ণ দিয়াত (১০০টি উট)। পুরুষাঙ্গেও পূর্ণ দিয়াত (১০০টি উট)। মেরুদণ্ডের জন্য পূর্ণ দিয়াত (১০০টি উট)।[৪৩৫] বোধশক্তি লোপের জন্য পূর্ণ দিয়াত (১০০টি উট)।[৪৩৬]

---

৪৩০ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আবূ শায়বাহ, *আল-মুসান্নাফ*, (আল-ফারুক আল-হাদীসিয়াহ, কাহিরা, প্রথম প্রকাশ ২০০৮), ৯ম খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: হাতের দিয়াত কত, হাদীস নম্বর ২৭৪৭৩, পৃ. ৪৩; ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু মুনাক্কিলাহ, হাদীস নম্বর ১৬২০৪, পৃ. ২৫৯।

৪৩১ ইমাম হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলা সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নম্বর ১৪৭৮, পৃ. ৫০৩-৫০৫; ইমাম আবদুর রাযযাক, *আল-মুসান্নাফ*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, কিতাবুল উকুল, বাবুল আনফি, হাদীস নম্বর ১৭৭৭১, পৃ. ২৩০।

৪৩২ ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু মুনাক্কিলাহ, হাদীস নম্বর ১৬২০৪, পৃ. ২৫৯।

৪৩৩ *আল-মুস্তাদরাক আলা সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নম্বর ১৪৭৮, পৃ. ৫০৩-৫০৫।

৪৩৪ ইমাম মালিক বিন আনাস, *আল-মুয়াত্তা*, (দারু আনদালুস আল-জাদীদাহ, প্রথম প্রকাশ ২০০৯), কিতাবুল উকুল, বাবুল আমালি ফী আকলিল আসনানি, হাদীস নম্বর ১৫৫৪, পৃ. ৬৩২।

৪৩৫ *আল-মুস্তাদরাক আলা সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নম্বর ১৪৭৮, পৃ. ৫০৩-৫০৫।

৪৩৬ ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু যাহাবিল আকলি মিনাল জিনায়াতি, পৃ. ২৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

(দুই). যখমের প্রকারভেদ ও দিয়াত

যখমের দিয়াতও তার ধরনের ভিত্তিতে কয়েক রকমের হয়ে থাকে। নিম্নে তার প্রকারভেদ ও দিয়াতের পরিমাণ পেশ করা হল।

যখমের প্রকারভেদ

ক. জাইফাহ: এমন আঘাত যা শরীরের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। গলায় নিম্নাংশ থেকে উরুসন্ধির মধ্যকার আঘাত জাইফাহ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- বুক, পিঠ, পার্শ্বদ্বয় এবং অণ্ডকোষ ও পাছার মধ্যবর্তীস্থান। তবে দুই হাত, দুই পা এবং ঘাড়ের যখম জাইফাহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

জাইফাহ এর শাস্তি

জাইফাহ এর কিসাস কার্যকর হবে না। হাড়ের ন্যায় এরূপ আঘাতেও কিসাস নিতে গেলে সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকে। সেজন্য নবী ﷺ বলেছেন, মামূমাহ, জাইফাহ ও মুনাক্কিলায় কিসাস নেই।[৪৩৭]

জাইফাহ এর শাস্তি হচ্ছে আরশ। এর পরিমাণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ। নবী ﷺ বলেছেন, জাইফাহ এর দিয়াত পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ।[৪৩৮]

প্রতিটি জাইফাহ এর জন্য আলাদাভাবে পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ বাধ্যতামূলক। যদি এ ধরনের একটি আঘাত শরীরের অন্য অঙ্গে সংক্রমিত হয় তাহলে তা দুটি জাইফাহ গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াতের দুই-তৃতীয়াংশ প্রদান ওয়াজিব। এছাড়া প্রয়োজনবোধে বিচারক তা'যীরের অধীনে আহতের চিকিৎসা খরচসহ অন্য যে কোন সাধারণ শাস্তি দিতে পারবেন। আর যদি এরূপ আঘাতের ফলে কেউ মারা যায় তাহলে এক্ষত্রে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

খ. গাইর জাইফাহ: এমন আঘাত যা শরীরের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত পৌঁছে না। শিজাজ ও জাইফাহ ছাড়া শরীরের অন্যান্য স্থানের আঘাত গাইর জাইফাহ এর অন্তর্ভুক্ত। শরীরের গোশত ফেটে যাওয়া, হাড় প্রকাশ পাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়া এর পর্যায়ভুক্ত।

গাইর জাইফার প্রকারভেদ

ক. আদ-দামিয়াহ: যে আঘাতে শরীরের চামড়া কেটে রক্ত বের হয়।

খ. আল-বাদি'আহ: যে আঘাতে শরীরের গোশত কেটে বা চিরে যায়, তবে হাড় প্রকাশ পায় না।

গ. আল-মুতালাহিমাহ: যে আঘাতে শরীরের গোশত বিছিন্ন হয়ে যায়।

ঘ. আল-মুদিহাহ: যে আঘাতে শরীরের গোশত কেটে হাড় প্রকাশ পায়।

ঙ. আল-হাশিমাহ: যে আঘাতে শরীরের হাড় ভেঙ্গে যায়, তবে স্থানচ্যুত হয় না।

চ. আল-মুনাক্কিলাহ: যে আঘাতে শরীরের হাড় ভেঙ্গে স্থানচ্যুত হয়।

গাইর জাইফার শাস্তি

গাইর জাইফার নির্দিষ্ট কোন আরশ নেই। বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী এর দিয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা খরচসহ তা'যীরের অধীনে অপরাধীকে অন্য কোন সাধারণ শাস্তি দিবে। হানাফী আলিমগণ এ অভিমত পেশ করেছেন। তাঁদের মতে, মাথা ও চেহারা ব্যতীত শরীরের অন্য স্থানে আঘাতের জন্য কিসাস বাধ্যতামূলক নয়। মালিকী আলিমগণের মতে, বিপদের আশঙ্কা না থাকলে শরীরের যে কোন আঘাতের জন্য কিসাস প্রযোজ্য, এমনকি হাশিমাহ (যে আঘাতে শরীরের হাড় ভেঙ্গে যায়, তবে স্থানচ্যুত হয় না) এর বেলায়ও। তাঁদের মতানুযায়ী বুক, ঘাড়, পিঠ, উরু ইত্যাদি অঙ্গের হাড়ের বদলা নেয়া যাবে না। অন্যান্য হাড় ভাঙ্গার জন্য কিসাস কার্যকর হবে। শাফিঈ আলিমগণের

---

[৪৩৭] *সুনান ইবনু মাজাহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু মা লা কাওদা ফীহি, হাদীস নম্বর ২৬৩৭, পৃ. ২৭৪।

[৪৩৮] ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু মুনাক্কিলাহ, হাদীস নম্বর ১৬২০৪, পৃ. ২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধ মতে, মুদিহাহ (যে আঘাতে শরীরের গোশত কেটে হাড় প্রকাশ পায়) এর জন্য কিসাস বাধ্যতামূলক। তাঁদের মতানুযায়ী আঘাত যদি হাড় পর্যন্ত পৌছে এবং তা ভেঙ্গে না যায় তাহলে শরীরের যে কোন জায়গায় আঘাতের জন্য কিসাস কার্যকর হবে।

(তিন). শিজাজ -এর দিয়াত, প্রকারভেদ ও শাস্তি

চেহারায় আঘাত করা বা মাথা ফাটানোকে শিজাজ বলা হয়। শিজাজ কয়েক প্রকারের। যথা-

১. আল-হারিসাহ: যে আঘাতে চামড়া আহত হয়; তবে রক্ত প্রবাহিত হয় না।

২. আল-মুনাক্কিলাহ: যে আঘাতে শরীরের হাড় ভেঙ্গে স্থানচূত হয়ে যায়।

৩. আল-মা'মূমাহ: মাথায় এমন আঘাত যা মাথার হাড্ডি ভেদ করে ঘিলুর উপরিভাগের পাতলা চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

৪. আদ-দামিয়াহ: এমন আঘাত যার ফলে চোখের রক্ত প্রবাহিত হয়।

৫. আদ-দামি'আহ: যে আঘাতে চোখের পানির মত রক্ত বের হয় কিন্তু তা প্রবাহিত হয় না।

৬. আল-হাশিমাহ: যে আঘাতে হাড্ডি ভেঙ্গে যায়; কিন্তু স্থানচ্যুত হয় না।

৭. আস-সিমহাক: যে আঘাত মস্তকের হাড়ের উপরিভাগের ঝিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে; কিন্তু তা ছিন্ন হয় না।

৮. আল-মুদিহাহ: এমন আঘাত যার ফলে মস্তকের হাড়রে উপরিভাগের ঝিল্লি ফেটে হাড় প্রকাশ পায়।

৯. আদ-দামিগাহ: এমন আঘাত যার ফলে মগজের ঝিল্লি কেটে যায় এবং ক্ষত মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

১০. আল-বাদি'আহ: যে আঘাতে চামড়া কেটে যায়।

১১. আল-মুতলাহিমাহ: যে আঘাতে গোশত কেটে যায়; তবে পরে তা মিলিত হয়ে জোড়া লেগে যায়।

শিজাজ (চেহারায় আঘাত ও মাথা ফাটানো) এর শাস্তি

হারিসাহ (যে আঘাতে চামড়া আহত হয়; তবে রক্ত প্রবাহিত হয় না), দামি'আহ (যে আঘাতে চোখের পানির মত রক্ত বের হয় কিন্তু তা প্রবাহিত হয় না) ও দামিয়াহ (যে আঘাতে চোখের রক্ত প্রবাহিত হয়) প্রভৃতি আঘাতের নির্দিষ্ট কোন আরশ নেই। সুতরাং বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী এসব অপরাধের দিয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।

মুদিহার (যে আঘাতে মস্তকের হাড়রে উপরিভাগের ঝিল্লি ফেটে হাড় প্রকাশ পায়) ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ব্যতীত সমান বদলা নেয়া যায়, মাথার হাড্ডি পর্যন্ত সহজেই ছুরি পৌঁছানো সম্ভব, তাই এ ধরনের আঘাতের বদলায় কিসাস প্রযোজ্য। তবে কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা অসম্ভব হলে আহত ব্যক্তিকে আরশ বাবদ পাঁচটি উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য দেয়া ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুদিহাহর বেলায় দিয়াত হল পাঁচটি উট।[৪৩৯]

বাদি'আহ (যে আঘাতে চামড়া কেটে যায়), মুতলাহিমাহ (যে আঘাতে গোশত কেটে যায়; তবে পরে তা মিলিত হয়ে জোড়া লেগে যায়) ও সিমহাক (যে আঘাত মস্তকের হাড়ের উপরিভাগের ঝিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে; কিন্তু তা ছিন্ন হয় না) প্রভৃতি আঘাতের বদলায় কিসাস ওয়াজিব। কারণ এ ধরনের আঘাতের বদলায় সীমালঙ্ঘন ছাড়াই সমান বদলা নেয়া যায়। এটা হানাফী ও মালিকী আলিমগণের অভিমত। শাফিঈ ও হাম্বলী আলিমগণ বলেন, এসব অপরাধের ব্যাপারে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।

হাশিমাহ (যে আঘাতে হাড্ডি ভেঙ্গে যায়; কিন্তু স্থানচ্যুত হয় না), মুনাক্কিলাহ (যে আঘাতে শরীরের হাড় ভেঙ্গে স্থানচূত হয়ে যায়), মা'মূমাহ (মাথায় এমন আঘাত যা মাথার হাড্ডি ভেদ করে ঘিলুর

[৪৩৯] *আল-মুস্তাদরাক আলা সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নম্বর ১৪৭৮, পৃ. ৫০৩-৫০৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিভাগের পাতলা চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়) ও দামিগার (এমন আঘাত যার ফলে মগজের ঝিল্লি কেটে যায় এবং ক্ষত মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়) বেলায় মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা থাকে বিধায় এ ধরনের অপরাধে কিসাস প্রযোজ্য নয়। এর বদলায় আরশ বাবদ হাশিমাহর (যে আঘাতে হাড্ডি ভেঙ্গে যায়; কিন্তু স্থানচ্যুত হয় না) জন্য ১০টি উট, মুনাক্কিলাহর (যে আঘাতে শরীরের হাড় ভেঙ্গে স্থানচূত হয়ে যায়) জন্য ১৫টি উট এবং মা'মূমাহর (মাথায় এমন আঘাত যা মাথার হাড্ডি ভেদ করে ঘিলুর উপরিভাগের পাতলা চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়) জন্য পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ বা তার সমপরিমাণ মূল্য দেয়া ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুনাক্কিলাহর বেলায় দিয়াত হল, পনেরটি উট এবং মা'মূমাহর ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ।[৪৪০]

দামিগাহ এর বেলায়ও পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ। শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের কোন কোন আলিমের মতে, এরূপ আঘাত অত্যন্ত মারাত্মক বিধায় এ ক্ষেত্রে দিয়াতের পাশাপাশি বিচারক তা'যীরের আওতায় অতিরিক্ত আরশও ধার্য করবেন।

মানবদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট একত্রে দিয়াতযোগ্য একাধিক অপরাধের শাস্তি

যদি আহত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করে তাহলে একত্রে দিয়াতযোগ্য যে কয়টি অপরাধ করবে, প্রতিটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। আর আহত ব্যক্তি মারা গেলে সবগুলো অপরাধের দিয়াত হত্যার দিয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এর জন্য একটি মাত্র দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। যদি অপরাধের ধরন ও ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হয় (যথা- একটি ইচ্ছাকৃত আর অন্যটি ভুলবশত) তাহলে শরীরের কোন ক্ষতি সাধন হলে বা অন্য অঙ্গ আক্রান্ত হলে প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য পৃথক পৃথক সংশ্লিষ্ট বিধান প্রযোজ্য হবে।

কে দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) পরিশোধ করবে?

১. অপরাধী।

২. অপরাধীর বংশের লোকেরা।

আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) বলেন, হুযাইল গোত্রের দুই মহিলা ঝগড়ার এক পর্যায়ে একজন অপরজনকে লক্ষ্য করে একটি পাথরখণ্ড ছুড়ে মারল। এর ফলে মহিলাটি মারা গেল এবং তার গর্ভও নষ্ট হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ঘটনায় খুনি মহিলাটির বংশের লোকদের দিয়াত দেয়ার আদেশ দেন।[৪৪১]

ভুলবশত বা প্রায় ইচ্ছাকৃত অপরাধের দিয়াত– চাই দিয়াত কম হোক বা বেশি হোক[৪৪২]– অপরাধীর বংশের প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ লোকদের উপর বর্তাবে। নাবালক ও পাগলের অপরাধের সম্পূর্ণ দিয়াত তাদের বংশের লোকেরা দিবে। বংশের লোক দ্বারা উদ্দেশ্য হল অপরাধীর আসাবা। অর্থাৎ পিতা, চাচা, ভাই, ছেলে ও নাতি।

---

৪৪০ ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু মুনাক্কিলাহ ও বাবু মা'মূনাহ, হাদীস নম্বর ১৬২০৪ ও ১৬২০৬, পৃ. ২৫৯-২৬০।

৪৪১ *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ: মহিলার ভ্রূণ এবং দিয়াত পিতা ও পিতার নিকটাত্মীয়দের ওপর বর্তায়, সন্তানের উপর নয়, হাদীস নম্বর ৬৯১০, পৃ. ৮২৩।

৪৪২ এটা হানাফী ও শাফিঈ আলিমগণের অভিমত। মালিকী ও অধিকাংশ হাম্বলী আলিমের মতে, দিয়াতের পরিমাণ হলো- পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশের বেশি হলে অপরাধীর বংশের লোকেরা দিয়াত দিবে। আর পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম হলে অপরাধীকেই সম্পূর্ণ দিয়াত পরিশোধ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

হত্যাকারী বেতনভুক্ত কর্মচারী না হলে তার বংশের লোকদের উপরই দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। যদি বংশের লোকজন কম হয় তাহলে তার নিকটবর্তী বংশের লোকজন এবং সহকর্মীদের উপরও দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। উমার (রাযি.) রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বেতন কাঠামো চালুর পর সহকর্মীদের উপর দিয়াত আরোপ করতেন।

হাম্বলী মাযহাবের আলিম ইমাম আল-বাহুতী (রহ.) বলেন, ভুলবশত অপরাধ সচরাচর ঘটেই থাকে। এর দিয়াতের পরিমাণও প্রচুর। এ অবস্থায় ভুলের ক্ষতিপূরণ বাবদ শুধু হত্যাকারীর সম্পদেই দিয়াত বাধ্যতামূলক করা হলে তার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। সুতরাং তার এ কঠিন বিপদের মূহুর্তে তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা বংশের লোকদের একান্ত কর্তব্য বিধায় বংশের লোকদের উপর দিয়াত ওয়াজিব করা হয়েছে– যা খুবই যুক্তিযুক্ত।

ইমাম আল-কাসানী (রহ.) বলেন, হত্যাকারীকে হত্যার অপরাধ থেকে নিষেধ করা বংশের লোকদের দায়িত্বেও বর্তায়। বংশের লোকেরা তাকে এ অপরাধ থেকে নিষেধ না করাটা তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলার পরিচায়ক এবং অপরাধও বটে। সুতরাং দায়িত্ব পালনে বংশের লোকদের এ অবহেলা প্রদর্শনের কারণে তাদের উপর দিয়াত বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে, যা একান্ত যুক্তিসঙ্গত।

৩. জনপদবাসী: কোন জনপদে অথবা সামষ্টিক মালিকানাভুক্ত স্থানে কোন মৃতদেহ পাওয়া গেল, কিন্তু খুনী চিহ্নিত করা যাচ্ছে না, এরূপ অবস্থায় নিহতের অভিভাবকরা ঐ জনপদ বা স্থানের মালিকদের প্রতি হত্যার সম্পর্ক করল, এরূপ অবস্থায় জনপদবাসী বা জায়গার মালিকরা হত্যার বিষয়টি অস্বীকার করে শপথ করবে অন্যথায় তাদের উপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।

৪. বায়তুল মাল: কয়েকটি অবস্থায় বায়তুল মাল থেকে দিয়াত পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। যেমন-

ক. অপরাধী লাওয়ারিছ, ছিন্নমূল হলে অথবা দিয়াত পরিশোধে অসমর্থ হলে সরকার বায়তুল মাল থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করবে।

আল-মিকদাম (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ আমি লাওয়ারিছ ব্যক্তির ওয়ারিছ। আমি তার পক্ষ হতে দিয়াত আদায় করব এবং তার ওয়ারিছ হবো।[৪৪৩]

খ. ব্যক্তি মালিকানাবিহীন কোন উন্মুক্ত জায়গায় কোন মৃতদেহ পাওয়া গেলে এবং তার খুনী চিহ্নিত করা সম্ভব না হলে বায়তুল মাল থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করবে। একইভাবে কা'বা তাওয়াফের সময় বা কোন জনসমাবেশে অত্যন্ত ভীড়ের মধ্যে পড়ে কেউ মারা গেলে এবং তার খুনী চিহ্নিত করা সম্ভব না হলে বায়তুল মাল থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করবে।

গ. প্রশাসক বা বিচারকের ভুল রায়ের কারণে বা কোন অপরাধের সাধারণ দণ্ড কার্যকর করার সময় কারো প্রাণ বা অঙ্গহানি হলে তার দিয়াতও বায়তুল মালের উপর বর্তাবে। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। আলী (রাযি.) বলেন, কোন মুসলিমের রক্ত মূল্যহীন যেতে পারে না।[৪৪৪]

ইসলাম বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেছে। আর তা নির্ধারণ করেছে যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয়। যাতে এ শাস্তির মাধ্যমে মানুষ সংশোধন হয়; কোন অপরাধে সম্পৃক্ত না হয়। সুতরাং মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামের অবদান অপরিসীম।

---

[৪৪৩] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল ফারাইদ, অনুচ্ছেদ: মীরাসু যাবিল আরহাম, হাদীস নম্বর ২৮৯৯, পৃ. ১২৬৭।

[৪৪৪] ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১২, পৃ. ১০৫-১৬৯; ইবনু হাযম, *আল-মুহাল্লা*, (দারুল ফিক্‌র, বৈরুত-লেবানন, প্রকাশকাল ২০০১), খণ্ড ১১, পৃ. ৮-৯৬; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২১, পৃ. ৪৪-৯৫; *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯-৩১১।

Dhaka University Institutional Repository

[১২]. তা'যীর (অনির্দিষ্ট শাস্তি, যা বিচারক বিবেচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করেন)

হুদূদ ও কিসাস জাতীয় কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অন্যান্য সব অপরাধ তা'যীরী অপরাধ। শাস্তিসমূহের মধ্যে এর ক্ষেত্র বিশাল। ইসলামে একে অপরাধ প্রতিরোধে একটি কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়।

তা'যীরী অপরাধ আল্লাহ্‌র অধিকারের ক্ষেত্রে হতে পারে আবার বান্দার অধিকারের ক্ষেত্রেও হতে পারে। দায়িত্ব পালনে বা ওয়াজিব আদায়ে অবহেলার কারণেও হতে পারে, আবার হারাম কাজে লিপ্ত হবার কারণেও হয়ে থাকে। এ জাতীয় অপরাধ যেমন- সামর্থ্যবান হয়েও ঋণ পরিশোধ না করা, বিক্রির সময় পণ্যের দোষ গোপন রাখা, আমানত আদায় না করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, অসংরক্ষিত মাল চুরি করা, যেনা ছাড়া কাউকে অন্য অপরাধের অপবাদ দেয়া, প্রতারণা করা, ওজনে কম দেয়া, খাদ্যে ভেজাল মেশানো, সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে খাদ্যবস্তু গুদামজাত করে রাখা, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, দুর্নীতি করা, কাউকে মারধর করা বা গালি দেয়া, দায়িত্ব পালনে ফাঁকি দেয়া, যাকাত আদায় না করা, বিনা ওজরে নামায বা রামাযানের রোযা ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি।

হদ্দ ও কিসাসের অপরাধ প্রমাণে শর্তাদি পূর্ণমাত্রায় পাওয়া না গেলে বা কোন শর্তের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে সে অপরাধও তা'যীরের পর্যায়ভুক্ত হবে। কতিপয় ফিকাহবিদের মতে, কোন মুস্তাহাব কাজ সম্পাদনে অবহেলা করা বা কোন মাকরূহ কাজ সম্পাদন করার কারণেও তা'যীরের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। আবার কখনো আদব ও শিষ্টাচার শেখানোর উদ্দেশ্যে অভিভাবক কর্তৃক সন্তানকে এবং শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রকে শিক্ষামূলক শাস্তি দেয়া জায়িয। এ সবই তা'যীরের পর্যায়ভুক্ত।

(ক) তা'যীরের উদ্দেশ্য

অপরাধীকে সংশোধন করা, ভবিষ্যতে অপরাধ থেকে দূরে থাকতে ও নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে দিক-নিদের্শনা দেয়া ও অনুপ্রাণিত করাই হচ্ছে তা'যীরের উদ্দেশ্য। অপরাধীকে চরমভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা, অনর্থক কষ্ট দেয়া বা ধ্বংস করা এর উদ্দেশ্য নয়। তাই তা'যীরের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শাসক বা বিচারককে অভিযুক্ত ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং অপরাধের ধরন ও মাত্রার প্রতি খেয়াল রাখা একান্ত কর্তব্য।

(খ) তা'যীর ও অন্যান্য শাস্তির মধ্যে পার্থক্য

১. হদ্দ, কিসাস ও দিয়াতের শাস্তি শরীয়ত কর্তৃক সুনির্ধারিত। বিচারক তাতে কোন পরির্বতন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে না। পক্ষান্তরে তা'যীরের শাস্তি সুনির্দিষ্ট নয়। তাই এক্ষেত্রে বিচারক পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং অপরাধের ধরন ও মাত্রা বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান করতে পারেন।

২. হদ্দ, কিসাস ও দিয়াতে শাসকের ক্ষমা করার এখতিয়ার নেই। কিন্তু তা'যীরে শাসকের ক্ষমা করার এখতিয়ার রয়েছে।

৩. হদ্দ, কিসাস ও দিয়াতের ক্ষেত্রে শুধু অপরাধ বিবেচনায় আনতে হয়। এতে অপরাধীর সামাজিক মর্যাদা বা ব্যক্তিত্ব বিবেচ্য নয়। পক্ষান্তরে তা'যীরের ক্ষেত্রে অপরাধ ও অপরাধী দু'টি বিষয়ই একত্রে বিবেচনায় আনা হয়।[৪৪৫]

---

[৪৪৫] *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬-২৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) তা'যীরী শাস্তির প্রকারভেদ

ইসলামী শরীয়তে তা'যীরী শাস্তি কয়েক ধরনের। অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থা বুঝে যে শাস্তি প্রয়োগ করা সমীচীন তা-ই কার্যকর করা হবে। কারণ সমাজে এমন কিছু লোক থাকে, যাদের সামান্য শাস্তিতে শিক্ষা হয়ে যায়। আবার এমন কিছু লোকও থাকে, যাদের কঠোর শাস্তি ছাড়া শিক্ষা হয় না। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার তা'যীরী শাস্তির বিবরণ দেয়া হল।

১. তা'যীরের উৎকৃষ্ট শাস্তি হলো বেত্রাঘাত। বেত্রাঘাত করাকে তা'যীরের মৌলিক শাস্তি গণ্য করা হয়। তা'যীরে বেত্রাঘাতের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল, একটি বা দুটি বেত্রাঘাত, যদি বিচারক একেই যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ বেত্রাঘাতের পরিমাণ কত হবে এ ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। যেমন- কারো মতে, তা'যীরে ১০ এর অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না। কেননা, আবূ বুরদাহ বিন নায়ার (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: তোমরা দশের অধিক বেত্রাঘাত করবে না। তবে আল্লাহ্র হদ্দ তথা পাপের কাজ হলে ভিন্ন কথা।[৪৪৬] ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ ও অধিকাংশ হাম্বলী আলিমের মতে, ৩৯টির[৪৪৭] অধিক বেত্রাঘাত করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে অপরাধে হদ্দ নেই, তাতে কেউ হদ্দ পরিমাণ শাস্তি দিলে সে সীমালঙ্ঘনকারী হবে।[৪৪৮] মালিকী মাযহাব মতে, বেত্রাঘাত সংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়। তাই প্রয়োজনে ১০০ এর অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে।[৪৪৯] কেননা, উমার ও আলী (রাযি.) উভয়েই দু'জন অবিবাহিত নারী-পুরুষকে একই চাদরের নিচে নিদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যাওয়ায় উভয়কে ১০০টি করে বেত্রাঘাত করার হুকুম দেন। শাফিঈ আলিমগণ থেকে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। তা হল- সর্বোচ্চ ৩৯, অথবা ৭৫ অথবা ৯৯ বেত্রাঘাত।

২. বিচারক যদি মনে করেন যে, ওয়ায নসীহত, ধমক, তিরস্কার বা উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে অপরাধীকে তার অপরাধ থেকে বিরত রাখা যাবে, সে অপরাধ পরিহার করবে, তাহলে তিনি অপরাধীকে ডেকে এনে নসীহতের মাধ্যমে সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে পারেন। এ ধরনের অপরাধ যেমন-কাউকে এমন কোন নামে ডাকা যা সে অপছন্দ করে (যথা– কাফির, ফাসিক, মুনাফিক, জারজ সন্তান, মিথ্যুক, গাধা ইত্যাদি) তাহলে বিচারক তাকে ডেকে এনে নসীহত করতে পারেন অথবা (মূর্খ, অভদ্র, সীমালঙ্ঘনকারী ইত্যাদি বলে) তিরস্কার বা ধমক দিতে পারেন। তবে অপরাধীকে এজন্য বড় ধরনের অপমান করা সমীচীন নয়।[৪৫০]

---

[৪৪৬] *আল-মুস্তাদরাক আলা সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নম্বর ৮৩১৯, পৃ. ২৯৮।

[৪৪৭] ইমাম আবূ ইউসূফের মতে, বেত্রাঘাতের সবোচ্চ পরিমাণ ৭৯ অথবা ৭৫।

[৪৪৮] ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, কিতাবুল আশরিবা ওয়াল হাদ্দ ফীহি, বাবু মা জাআ ফীত তা'যীর ওয়া আন্নাহু লা ইউবলাগু বিহি আরবাঈনা, হাদীস নম্বর ১৭৫৮৫, পৃ. ৭০১।

উল্লেখ্য, হদ্দের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল ৪০টি বেত্রাঘাত। যা কৃতদাসের জন্য যেনার অপবাদের শাস্তি। তাই তা'যীরে বেত্রাঘাতের সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে এর থেকে ১টি কম অর্থাৎ ৩৯টি ।

[৪৪৯] উল্লেখ্য যে, হদ্দের সর্বোচ্চ শাস্তি ১০০টি বেত্রাঘাত। তাই মালিকী মাযহাব মতে, তা'যীরে হদ্দের অধিক শাস্তিও দেয়া যাবে।

[৪৫০] হাদীসে এসেছে- একদা আবূ যার (রাযি.) এক ব্যক্তিকে তার মায়ের নাম ধরে গালি দিচ্ছিলেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, আবূ যার, তুমি তাকে মায়ের নাম ধরে অপমান করছো! তোমার মধ্যে দেখছি, জাহিলিয়্যাত রয়েই গেছে। (*সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: গুনাহের কাজ জাহিলী যুগের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত, হাদীস নম্বর ৩০, পৃ. ১৩)

Dhaka University Institutional Repository

৩. বিচারক চাইলে অপরাধীকে ছোট-খাট অপমানকর শাস্তি দিতে পারেন। যেমন- কানধরে উঠাবসা করানো, এক পায়ের উপর অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা ইত্যাদি। অথবা অপরাধ থেকে বিরত রাখতে অপরাধীকে ভয় দেখাতে পারেন। যেমন- এরূপ বলা যে, যদি তুমি পুনরায় এরূপ কাজে লিপ্ত হও তাহলে তোমাকে জেলে পাঠানো হবে। অথবা শাস্তির রায় ঘোষণা দিয়ে তা কার্যকরের জন্য কিছুদিন সময় দিয়ে বলবেন যে, পুনরায় অপরাধ না করলে রায় কার্যকর করা হবে না। অনুরূপভাবে কোন মর্যাদাবান ব্যক্তির দ্বারা ছোট-খাট ভুল সংঘটিত হলে তাকে আদালতে তলব করতে পারেন। আর অপরাধ সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি অর্থাৎ যেসব জিনিস অপরাধমূলক কাজে সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা নষ্ট করে ফেলবে। যেমন- মদ রাখার পাত্র ও বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলা, পর্নোগ্রাফি ও চরিত্র বিধ্বংসী পত্র-পত্রিকা, সিডি প্রভৃতি বিনষ্ট করা, রাস্তার উপর নির্মিত অবৈধ বিল্ডিং ভেঙ্গে ফেলা, ভেজাল খাদ্য (যেমন পানি মিশ্রিত দুধ, ক্ষতিকর কীটনাশক মেশানো খাবার ইত্যাদি) নষ্ট করে ফেলে দেয়া, অনুরূপ ভেজাল মিশ্রিত বস্তু, যথা- খারাপ সূতা দিয়ে তৈরিকৃত কাপড় নষ্ট করা। তবে বিচারক চাইলে ব্যবহার উপযোগী সম্পদ জনকল্যাণমূলক কাজেও লাগাতে পারেন।

৪. প্রয়োজনে অপরাধীকে বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম অথবা বিনা শ্রমে কারাদণ্ড দেয়া। অনুরূপভাবে কোন অপরাধী যদি বারবার অপরাধ করে এবং তার দ্বারা সমাজ বিপর্যস্ত হয়, তাহলে বিচারক বা শাসক প্রয়োজনে অপরাধীকে দেশ থেকে বহিস্কারের শাস্তি দিতে পারেন।

৫. অপরাধীকে সমাজচ্যুত বা বয়কট করার মাধ্যমেও তা'যীরী শাস্তি দেয়া যাবে। অর্থাৎ অপরাধীর সাথে কথাবার্তা, সালাম, উঠাবসা, মেলামেশা, লেনদেন ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তিনজন সাহাবী বিনা ওজরে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার কারণে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে সমাজচ্যুত করে শাস্তি দিয়েছেন। তারা হলেন- কা'ব বিন মালিক, মুরারাহ বিন রাবী'আহ এবং হিলাল বিন উমাইয়া। পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তারা সমাজচ্যুত ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে আল-কুরআনে (সূরাহ আত-তাওবা, ১১৮ নং) আয়াত নাযিল করেন। উমার (রাযি.) সবীগকে বসরায় নির্বাসন করার পর হুকুম দেন যে, কেউ যেন তার সাথে মেলামেশা না করে, সকলেই যেন তাকে বয়কট করে।[৪৫১]

৬. প্রয়োজনবোধে আর্থিক জরিমানা করা যাবে। তবে আর্থিক জরিমানার বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ও ইবনু কাইয়িম (রহ.) এর অভিমত হল, আর্থিক দণ্ড বৈধ। কেননা, হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গাছে জুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: দরিদ্র ব্যক্তি যদি তা মুখের কাছে পেয়ে যায়, সে তা কোন উপায়ে ছিড়ে নেয়নি, তা খেলে কোন অপরাধ

আবূ হুরাইরা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে এক মদ্যপায়ীকে আনা হল। তাকে প্রহারের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের বললেন: তোমরা তাকে মৌখিক ধমক দিয়ে নসীহত করো। তখন তারা তাকে বলতে লাগল, তোমার কি আল্লাহ্‌র ভয় নেই! রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি কি তোমার লজ্জা নেই- (*সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: মদপানের শাস্তি, হাদীস নম্বর ৪৪৭৮, পৃ. ১৯১৬)। হাদীসদ্বয় থেকে জানা যায়, অপরাধীকে শাস্তি হিসেবে তিরস্কার বা উপদেশ দিতে অসুবিধা নেই।

[৪৫১] ইমামুল হাফিয আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আদ-দারিমী আস-সামারকান্দী, *সুনান আদ-দারিমী*, (কাদিমী কুতুব খানা, করাচী), ১ম খণ্ড, মুকাদ্দিমাহ, বাব: মান হাবাল ফুতয়া ওয়া কারিহা.., হাদীস নম্বর ১৪৮, পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

নেই। আর কোন ব্যক্তি কিছুর সাহায্যে ফল ছিড়ে নিয়ে খেলে তাকে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং শাস্তিও পাবে।[৪৫২]

৭. বিচারক প্রয়োজন মনে করলে কোন অপরাধীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন অথবা অপরাধীকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে অপরাধীর সম্পদ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আটক করে রাখা যেতে পারে। কোন অপরাধীকে চাকুরীচ্যুত করা বা নিচের পদে নামিয়ে দেয়াও যাবে। যেমন- দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী, দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোর কর্মকর্তাকে জনস্বার্থে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা। অনুরূপভাবে অপরাধীর কোন কোন সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করা যাবে। যেমন– চাকুরীতে প্রমোশন স্থগিত করে রাখা, গনীমতের অংশ থেকে বঞ্চিত করা, সাক্ষ্যদান থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি।

৮. অপরাধীকে শিক্ষাদানের জন্য বিচারক প্রয়োজনবোধে অপরাধীর নাম ঢোল পিটিয়ে, মাইকিং করে বা মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করতে পারেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) মতে, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী বাজারের লোক হলে তাকে বাজারে ঘুরিয়ে তার অপকর্মের কথা প্রচার করা হবে। শাফিঈ ও হাম্বলী আলিমগণের মতে, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীকে বিচারক ইচ্ছে করলে বেত্রাঘাত বা বন্দী বা মাথা মুণ্ডিয়ে অপমান অথবা বাজারে ঘুরিয়ে প্রচারও করতে পারেন।

৯. বিচারক যদি সঠিক মনে করেন তবে কোন ভয়ংকর ও কুখ্যাত অপরাধীকে তা'যীর হিসেবে তিনদিন জীবিত অবস্থায় শূলে চড়িয়ে শাস্তি দিতে পারেন। শূলে চড়ানো বিষয়ে ইসলামী পণ্ডিতগণ থেকে কয়েক ধরনের অভিমত পাওয়া যায়: ক. শুধুমাত্র তিনদিন জীবিত অবস্থায় শূলে চড়িয়ে শাস্তি দেয়ার পর তাকে জীবিত ছেড়ে দিবে। এ তিন দিনের মধ্যে তাকে খাদ্য, পানীয় ও ওযুর পানি সরবরাহ করতে হবে এবং সে ইশারায় নামায পড়বে। খ. হত্যা করার পর শূলে বিদ্ধ করা হবে। গ. হত্যা করার আগে শূলে চড়াবে এবং এ অবস্থায় তাকে হত্যা করতে বাধা নেই।

১০. ইসলামী আইনের সাধারণ নিয়মানুযায়ী তা'যীরের অধীনে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া সমীচীন নয়। তবে যদি মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত অপরাধীর অপরাধের পরিসমাপ্তি ঘটার সম্ভাবনা না থাকে এবং এ শাস্তি প্রদানে যদি জনসাধারণের কল্যাণের দিক প্রবল হয় তাহলে অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদের মতে, কোন কুখ্যাত অপরাধীকে জাতীয় স্বার্থ ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে মৃত্যুদণ্ড দেয়া বৈধ। হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী আলিমগণের মতে, কোন অপরাধী যদি বারবার বড় অপরাধ করে তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে। অনুরূপভাবে কোন মুসলিম গোয়েন্দা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের জন্য তথ্য পাচার করে তাহলে মালিকী ও হাম্বলী আলিমগণের মতে, তাকেও তা'যীরের আওতায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে। তবে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফিঈ (রহ.) একে জায়িয মনে করেন না। এমনিভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে যদি হত্যা ব্যতীত দমন করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকেও তা'যীর (বিচারক কর্তৃক বিবেচনা অনুযায়ী) এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে।

(ঘ) তা'যীর হিসেবে যেসব শাস্তি দেয়া বৈধ নয়

[৪৫২] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ: যে চুরির দায়ে হাত কাটা যায় না, হাদীস নম্বর ৪৩৯০, পৃ. ১৮৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধীকে তা'যীর হিসেবে যেসব শাস্তি দেয়া জায়িয নয় তা হলো: বিবস্ত্র করা; মুখমণ্ডল বা শরীরের নাজুক কোন স্থানে আঘাত করা; গলা টিপে ধরা, গলা মোচড়ানো ও চপেটাঘাত করা; পানিতে ডুবানো অথবা দেহ বা দেহের অংশ বিশেষকে আগুনে পুড়ানো; ওযু, নামায ও হাজত পূরণে বাধা দেয়া; ক্ষুধা, পিপাসা, ঠাণ্ডা ও গরমে কষ্ট দেয়া; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন বা ভেঙ্গে ফেলা; অভিশাপ দেয়া বা আশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা; এমন হেয় ও অপমানকর শাস্তি দেয়া যা কিনা ভবিষ্যতে তার সুস্থ ও পবিত্র জীবন-যাপনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

(ঙ) তা'যীরী শাস্তি দেয়ার অধিকারী কারা?

১. শাসক বা তার প্রতিনিধি: সরকার বা তার প্রতিনিধি অপরাধের ধরন ও মাত্রা এবং অপরাধীর অবস্থা ও পরিবেশ বিবেচনা করে যে শাস্তি দেয়া কল্যাণকর মনে করবেন, তা-ই দিতে পারবেন।

২. অভিভাবকগণ: অভিভাবক নিজেদের সন্তান বা পোষ্যদেরকে নীতি ও শিষ্টাচার শিক্ষামূলক শাস্তি দিতে পারবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

" مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ

তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছরে পৌঁছতেই নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দাও। তারা দশ বছরে পৌঁছলে এর জন্য তাদেরকে প্রহার কর।[৪৫৩]

৩. শিক্ষকগণ: শিক্ষক অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের নীতি শিক্ষাদান মূলক শাস্তি দিতে পারবে।

৪. স্বামী: স্ত্রী যদি স্বামীর ন্যায্য অধিকার আদায়ে অবহেলা করে তাহলে স্বামী স্ত্রীকে শিষ্টাচার শিক্ষামূলক শাস্তি দিতে পারবে।[৪৫৪] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

যেসব মহিলা অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে তোমরা আশঙ্কা করবে, তাদেরকে তোমরা প্রথমে উপদেশ দাও এবং তাদের শয্যা ত্যাগ কর, এরপর তাদেরকে বেত্রাঘাত কর।[৪৫৫]

(চ) তা'যীর কার্যকরে সীমালঙ্ঘন না করা

তা'যীরের শাস্তি প্রয়োগের সময় পূর্ণ সতর্ক থাকা জরূরী। কেননা, এক্ষেত্রে অপরাধীকে অস্বাভাবিকভাবে মারধোর বা প্রয়োজনের অধিক শাস্তি দেয়া সীমলঙ্ঘন হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং অপরাধীর ক্ষতি হলে শাস্তিদাতা দায়ী থাকবে। শুধু তাই নয়, স্বাভাবিক শাস্তি বা প্রহারেও যদি কেউ মারা যায় অথবা দৈহিক ক্ষতি হয়, তাতেও শাস্তিদাতা দায়ী থাকবে। সুতরাং যাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তার সার্বিক নিরাপত্তার কথা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কোন শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রকে[৪৫৬] এবং অভিভাবক কর্তৃক সন্তানকে প্রহারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য।

---

[৪৫৩] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুস সলাত, অনুচ্ছেদ: বালকদের কখন থেকে সলাতের নির্দেশ দিতে হবে, হাদীস নম্বর ৪৯৫।

[৪৫৪] স্ত্রীদেরকে এরূপ শাস্তি দেয়া ওয়াজিব নয়। বরং যথাসম্ভব এ ধরনের শাস্তি না দেয়া উত্তম। একান্ত প্রয়োজনে ভিন্ন কথা।

[৪৫৫] আল-কুরআন: সূরাহ আন-নিসা, ৪/৩৪।

[৪৫৬] এটা শাফিঈ আলিমগণের অভিমত। হানাফী আলিমগণের মতে, অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে ছাত্রকে প্রহার করলে শিক্ষক দায়ী থাকবে না। কিন্তু অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত স্বাভাবিক প্রহারে মারা গেলে এর জন্য শিক্ষক দায়ী থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ছ) নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে তা'যীরী শাস্তি দেয়া যাবে কিনা?

ক. হদ্দের অপরাধ নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে প্রমাণিত না হলে হানাফী ও মালিকী আলিমগণের মতে, যদি অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় অথবা সে কুখ্যাত অপরাধী হয় শাসক বা বিচারক অবস্থা বুঝে অভিযুক্তকে তা'যীরী শাস্তি দিতে পারেন।

অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি কুখ্যাত অপরাধী হলে এবং অপরাধ প্রমাণ কষ্টসাধ্য হলে (যেমন- চুরি, ডাকাতি, হত্যা ইত্যাদি) সেক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি লাভের জন্য তাকে প্রহার বা বন্দী করাও যেতে পারে।

খ. অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সমাজে সৎ লোক হিসেবে সুখ্যাত হলে তাকে নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া যাবে না; বরং এক্ষেত্রে অভিযোগকারী অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হলে তাকেই শাস্তি দেয়া হবে। যেন সম্মানিত লোকদের মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি না খেলতে পারে।

গ. অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তির অবস্থা (সে সুখ্যাত নাকি কুখ্যাত) জানা না গেলে বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটকে রাখা যাবে। আর এরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানোর জন্য দু'জন সাধারণ ব্যক্তি বা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে।[৪৫৭]

[৪৫৭] *কিতাবুল ফিক্‌হি 'আলা মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬-৪৪৮; *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-৩২৮; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯-৩৪৯; *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-৩২৮।

Dhaka University Institutional Repository

[১৩]. অপরাধীকে কারাগারে বন্দী রাখার বিধান

ইসলামে মানবাধিকার লঙ্ঘন সংশ্লিষ্ট যেসব অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে কোন অপরাধীকে কারাগারে বন্দী করে রাখা বিধিসম্মত তা হলো: এমন ইচ্ছাকৃত হত্যা যেখানে নিহত ও খুনীর মধ্যে ধর্ম এবং স্বাধীনতাগত পার্থক্য আছে, ইচ্ছাকৃত হত্যায় কিসাস কার্যকরে বিলম্ব হলে শাস্তি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত অপরাধীকে আটক রাখা, হত্যাকাণ্ডে পরোক্ষভাবে সাহায্য করা, কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করা যেমন- লাথি বা চপেটাঘাত করা, কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি সাধন করা, কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয়া, ভুল চিকিৎসা প্রদান, কাউকে বদ নজর লাগানো, যেসব হত্যার প্রমাণ কসম দ্বারা হয়ে থাকে তাতে কারো কসম করতে অস্বীকার করা, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, শরীয়ত নির্ধারিত কাফফারা আদায় না করা, চুরির প্রমাণ প্রশ্ন বিদ্ধ হওয়া,[৪৫৮] হাত কাটার পরও পুনরায় চুরি করা, ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা, যাকাতের ফরযিয়্যাত স্বীকার করেও যাকাত না দেয়া, কাউকে অপহরণ করা, জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ, অপচয় বা বিনষ্ট করা, কোন মুসলিম কর্তৃক শত্রুদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা, সরকারদ্রোহিতা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা,[৪৫৯] কারো বিরুদ্ধে হয়রানী অথবা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করা, হদ্দ বা কিসাস জাতীয় অপরাধে সাক্ষী প্রমাণে যথার্থতা নিরূপণ পর্যন্ত অভিযুক্তকে বন্দী রাখা, সাধারণ অপরাধে সাক্ষ্য-প্রমাণের যথার্থতা নিরূপণে সাক্ষীদের গ্রহণযোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাদণ্ড দেয়া, শাস্তি বাস্তবায়নে কোন বাধা থাকা, ব্যভিচারের ত্রুটিপূর্ণ মিথ্যা অপবাদ, ঘুষ খাওয়া, কারো সাথে প্রতারণা করা, বাজারে সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে খাদ্যবস্তু গুদামজাত করা, ক্রয়-বিক্রয়ের পর পণ্যদ্রব্য হস্তান্তর না করা বা মূল্য পরিশোধ না করা, খুলা তালাকের বিনিময় পরিশোধ না করা, স্ত্রীকে মাহ্‌র না দেয়া, হকদারকে ওয়াকফের সম্পদ ভোগ করতে না দেয়া, আমানতের খিয়ানত করা ইত্যাদি।

কারাবাসের মেয়াদ প্রসঙ্গ

অপরাধীর অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুপাতে কারাদণ্ডের মেয়াদ বিভিন্ন রকম হতে পারে। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন জেল হচ্ছে একদিন। আর সর্বোচ্চ মেয়াদ হতে পারে ছয় মাস অথবা এক বছরের চেয়ে কম সময় কিংবা বিচারক পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে এ মেয়াদ নির্ধারণ করবে। যা স্বল্প মেয়াদিও হতে পারে আবার আজীবন কারাবাসও হতে পারে।

---

[৪৫৮] যে চুরির অপরাধে কোন কারণে হাত কাটা যায় না, সে ক্ষেত্রে চোরকে আটক রাখা যেতে পারে। যেমন– পানির পাইপ চোর, মসজিদের জুতা চোর, খোলা জায়গায় পড়ে থাকা জিনিস চোর প্রভৃতি।

[৪৫৯] কতিপয় অবস্থায় সরকারদ্রোহী বা রাষ্ট্রদ্রোহীকে কারাদণ্ড দেয়া যাবে। যথা- ১. বিদ্রোহী কর্তৃক এমন কাজ হওয়া যদ্বারা বোঝা যায় যে, তারা সরকারের আনুগত্য ত্যাগ করতে চাচ্ছে। যেমন– যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়া, অবৈধ অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা ইত্যাদি। তখন সরকার তাদেরকে ধরে আটকে রাখতে পারবে। যদিও তারা যুদ্ধ শুরু করে দেয়নি। ২. বিদ্রোহীদের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আটক করা হলে তাদেরকে জেলে বন্দী করা যাবে। ৩. লড়াইয়ের পর বিদ্রোহীরা পালিয়ে বেড়ালে তাদেরকে খুঁজে বের করে কারাবন্দী করা যাবে যদি তাদের পুনরায় মিলিত ও সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি পুনরায় সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তাদের খুঁজে বের করে আটক করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যেসব কারণে কারাদণ্ড রহিত হয়

১. অপরাধীর মৃত্যু হওয়া; ২. অপরাধ সংঘটনের পর অপরাধী পাগল হয়ে যাওয়া; ৩. অপরাধীর তাওবা করা; যদি কারাদণ্ড হদ্দের পর্যায়ভুক্ত না হয়; ৪. অভিযোগকারী কর্তৃক অপরাধীকে ক্ষমা করা। এটা বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ্‌র হকের ব্যাপারে অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করে শাসক চাইলে কারাদণ্ড মওকুফ করতে পারেন; ৫. অপরাধীর পক্ষে সুপারিশ করা। তবে শাসক বা বিচারক সুপারিশ নামঞ্জুরও করতে পারেন যদি নামঞ্জুরে কল্যাণ নিহিত থাকে। কারাদণ্ডে দন্ডিত ব্যক্তি ভয়ংকর সন্ত্রাসী বা কুখ্যাত অপরাধী হলে সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না।[৪৬০]

[৪৬০] *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯-৩৫৪; *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮-২৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

[পঞ্চম অধ্যায়]

বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি

বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ সবুজ শ্যামলে ভরা সুন্দর স্বাধীন একটি দেশ। ভাষার অধিকার, অর্থনৈতিক সাম্য প্রভৃতি অধিকার আদায় ও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান শাসকের জুলুম-অত্যাচার আর বৈষম্যমূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তপাতের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন হয় এ দেশ।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দীর্ঘ ৪৬ বছরে বহু শাসক পরিবর্তন হয়েছে এ দেশে। কিন্তু যে অধিকার রক্ষার প্রত্যয়ে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করল এ দেশ, মানবাধিকার কতটুকু সুরক্ষিত এ দেশে? বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে- "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র যেখাবে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে, এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" অতএব, দেশের মানুষ তাদের মৌলিক অধিকারগুলো ফিরে পেয়েছে কিনা তা ভেবে দেখা একান্তই প্রয়োজন।

এ কথা সত্য যে, দেশ স্বাধীন হলেও দেশের জনগণ তাদের অধিকারসমূহ যথাযথভাবে লাভ করতে পারেনি। প্রতিনিয়তই কোন না কোনভাবে দেশের কোথাও না কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছেই। চাই তা ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা অন্যকোন দিক থেকে হোক না কেন। মানবাধিকার হরণের এ ধারা যেন কোনভাবেই রোধ করা যাচ্ছে না।

এ কথা স্বীকার্য যে, বিশ্বের বহু দেশের চাইতে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলনামূলক ভাল। কিন্তু আমরা চাই এমন একটি বাংলাদেশ যেখানে মানুষ ফিরে পাবে তাদের সকল অধিকার। থাকবে না মারামারি-হানাহানি আর অপরের অধিকার নিয়ে কোন ছিনিমিনি খেলা।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক বহু মানবাধিকার সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছরই সংস্থাগুলো বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। নিম্নে এরূপ একটি সংস্থার প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মানবাধিকার বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩ :

পারিবারিক নির্যাতন-২০১৩ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)[১]

ধরন \ বয়স	৭-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
স্বামী কর্তৃক নির্যাতন	-	৬	৪	২	২২	৩৪	১৩
স্বামীর পরিবার কর্তৃক নির্যাতন	২	২	১		৭	১২	৮
স্বামী কর্তৃক হত্যা	৪	৪৫	৬১	৩১	৭০	২১১	১২৬
স্বামীর পরিবার কর্তৃক হত্যা	১	৯	৭	৯	২২	৪৮	৩৮
নিজ পরিবার কর্তৃক হত্যা		২	১	২০	৬	২৯	১৫
আত্মহত্যা	৩	১৫	১২	৫	১৬	৫১	২৫
মোট	১০	৭৯	৮৬	৬৭	১৪৩	৩৮৫	২২৫

ধর্ষণ ২০১৩ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)[২]

ধরন \ বয়স	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখ নেই	মোট
ধর্ষণের চেষ্টা	৭	৮	৫	১	-	১	১৬৩	১৮৫
একক ধর্ষণ	৫৪	৮৯	৫৬	১৫	২	৪	৩১৩	৫৩৩
গণধর্ষণ	২	২৬	৩২	১০	৬	১০	১৭০	২৫৬
ধর্ষণের ধরন উল্লেখ নেই	-	২	৬	২	১	৩	১০	২৪
মোট	৬৩	১২৫	৯৯	২৮	৯	১৮	৬৫৬	৯৯৮
ধর্ষণ-পরবর্তী হত্যা	৪	১৮	১৩	৮	৪	৯	৩১	-
ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা	-	-	৭	১	২	-	৪	-

১. *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৩*, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ: ৩৫।
২. *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

যৌন হয়রানি (বখাটেদের উৎপাত) ২০১৩ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)১

ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
আত্মহত্যা	১৪	-	১৪
আত্মহত্যার চেষ্টা	২	-	২
প্রতিবাদ করায় খুন	৫	৬	১১
লাঞ্ছিত	১২০	১১	১৩১
বখাটেদের উৎপাতকে কেন্দ্র করে সংঘাতে আহত	৩২	৭৪	১০৬
স্কুলে যাওয়া বন্ধ	৯	-	৯
মোট	১৮২	৯১	২৭৩

সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে নারী নির্যাতন ২০১৩ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)২

ধরন / কারণ	হিল্লা	দোররা	গ্রামছাড়া/ সমাজচ্যুত/ একঘরে	শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন	তালাক/ বিয়ে অবৈধ	মোট
প্রেম	-	-	-	৪	-	৪
মৌখিক তালাক	৬	-	-	-	১	৭
ধর্ষণ/ধর্ষণের চেষ্টা	-	-	১	১		২
চরিত্রের মিথ্যা অভিযোগ	-	২	২	১	-	৫
স্ত্রী থাকতে শালিকাকে বিয়ে	-	-	-	-	২	২
সাদা কাগজে স্বাক্ষর না করায়	-	-	-	১	-	১
মোট	৬	২	৩	৭	৩	২১

গৃহ পরিচারিকা নির্যাতন- ২০১৩৩

বয়স / নির্যাতন ধরন	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখ নেই	মোট
শারীরিক নির্যাতন	১৩	৩	-	১	-	৬	২৩
ধর্ষণ/ধর্ষণের চেষ্টা	১	৩	-	-	-	১	৫
নির্যাতনের ধরন উল্লেখ নেই (মৃত্যু)	২	২০	২	২	১	৬	৩৩
ধর্ষণের পর হত্যা	১	১	-	-	-	-	২
শারীরিক নির্যাতন পরে মৃত্যু	-	৪	২	১	-	২	৯
আত্মহত্যা	১	৪	-	-	-	১	৬
মোট	১৮	৩৫	৪	৪	১	১৬	৭৮

১. *মানবাধিকার বাংলাদেশ* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
২. *মানবাধিকার বাংলাদেশ* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
৩. *মানবাধিকার বাংলাদেশ* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতন ২০১৩ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)১

বয়স / নির্যাতনের ধরন	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উলেখ নেই	মোট
শারীরিক নির্যাতন	১	২৪	১৭	৭	৭৬	১২৫
অ্যাসিড নিক্ষেপ	১	১	-	১	১	৪
স্বামীর গৃহ থেকে বিতাড়িত	-	-	-	-	৪	৪
তালাক	-	-	-	-	-	-
শারীরিক নির্যাতনের পর হত্যা	৫	৫০	৪০	৯	৫৯	১৬৩
নির্যাতিত হয়ে আত্মহত্যা	৬	৮	১	২	৫	২২
মোট	১৩	৮৩	৫৮	১৯	১৪৫	৩১৮

অ্যাসিড নিক্ষেপ ২০১৩ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)২

বয়স / কারণ	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখ নেই	মোট
পারিবারিক কলহ	-	১	৪	১	৩	৯
যৌতুকের জন্য	১	১	-	১	১	৪
শত্রুতা	-	-	৩	-	-	৩
জমিজমাসংক্রান্ত	-	-	-	১	২	৩
কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়	১	-	-	১	২	৪
বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়	১	১	-	১	১	৪
প্রেমে ব্যর্থ হয়ে	১	-	-	-	২	৩
ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে	-	১	-	-	-	১
কারণ উল্লেখ নেই	-	২	১	৩	৭	১৩
মোট	৪	৬	৮	৮	১৮	৪৪

হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতার চিত্র-২০১৩ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)৩

বাসস্থান ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ	ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ	প্রতিমা, পূজামণ্ডপ ও মন্দির ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ	আহত	নিহত
২৭৮	২০৮	৪৯৫	১৮৮	১

১. *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
২. *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
৩. *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক অপহরণ (পরিবারের দাবি) ২০১৩ [১]
(জানুয়ারি-ডিসেম্বর)

অপহরণ	পরবর্তী সময় লাশ উদ্ধার	অপহরণের পর ছেড়ে দিয়েছে	পরবর্তী সময় পুলিশের কাছে সোপর্দ	পরবর্তী সময় ডিবি পুলিশ কার্যালয়ে পাওয়া যায়	কারাগারে প্রেরণ
৬৮	৫	২	৪	-	২

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক/হেফাজতে/ক্রসফায়ারে মৃত্যু ২০১৩ [২]
(জানুয়ারি-ডিসেম্বর)

বাহিনী / মৃত্যুর ধরন	র‍্যাব	পুলিশ	র‍্যাব ও পুলিশ	পুলিশ ও বিজিবি	যৌথ বাহিনী	বিজিবি	মোট
*'ক্রসফায়ার' (গ্রেফতারের পর)	১	১	-	-	-	-	২
'ক্রসফায়ার' (গ্রেফতার ছাড়া)	২৩	১৬	-	-	-	১	৪০
শারীরিক নির্যাতন (গ্রেফতার ছাড়া)	-	৪	১	-	-	১	৬
শারীরিক নির্যাতন (গ্রেফতারের পর)	-	২২	-	-	-	-	২২
আত্মহত্যা (গ্রেফতারের পর)	-	১	-	-	-	-	১
**গুলি (গ্রেফতার ছাড়া)	৫	৭৯	১৪	২৫	১৪	-	১৩৭
মোট	২৯	১২৩	১৫	২৫	১৪	২	২০৮

১. *মানবাধিকার বাংলাদেশ* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

২. *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত১

নিহতদের পরিচয় (সামাজিক ও রাজনৈতিক)	নিহতের সংখ্যা
সাধারণ মানুষ	১৯৬
জামায়াত-শিবির	১১১
আওয়ামী লীগ (অভ্যন্তরীণ সংঘাতসহ)	৯৪
বিএনপি (অভ্যন্তরীণ সংঘাতসহ)	৬২
হেফাজতে ইসলাম	২১
পুলিশ	১৬
বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ (বিজিবি)	৩
গণজাগরণ মঞ্চ	২
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	১
আহলে সুন্নত	১
মোট	৫০৭

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে নিহত ২

বাহিনীর নাম	নিহতের সংখ্যা
পুলিশ	১০০
বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ (বিজিবি)	৮
পুলিশ ও বিজিবি	৩৪
পুলিশ ও র‍্যাব	২৭
যৌথ বাহিনী (পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি)	৪৬
মোট	২১৫

রাজনৈতিক সহিংসতায় দগ্ধ ও নিহত (মেডিক্যালে ভর্তিকৃত)৩

ক্রম.	মেডিক্যালের নাম	দগ্ধ	নিহত
১.	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	৭১	২২
২.	চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	৬	২
৩.	ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	৯	-
৪.	বগুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	২	-
৫.	এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, সাভার	৩	১
৬.	কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	১	-
৭.	গাজীপুর সদর হাসপাতাল	৫	-
	মোট	৯৭	২৫

১. *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।
২. *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।
৩. *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

সাংবাদিক নির্যাতন ২০১৩ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)[১]

নির্যাতনের ধরন	সংখ্যা
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন/হুমকি/হয়রানি/মামলা	৪৩
প্রাণনাশের হুমকি (সরকারদলীয় কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা, সন্ত্রাসী ও অজ্ঞাত পরিচয়ে ও টেলিফোনে)	৩৩
প্রকাশিত সংবাদের জন্য মামলার শিকার	২৬
সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হুমকি/হয়রানি/বোমা নিক্ষেপ	৫৬
আওয়ামী লীগ ও তারা অঙ্গসংগঠন কর্তৃক হামলা/হয়রানি/নির্যাতন	৭৭
বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠন কর্তৃক হামলা/হয়রানি/নির্যাতন	২০
সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক নির্যাতন/হুমকি/হয়রানি	২
জামায়াত-শিবির কর্তৃক হামলা/নির্যাতন/হয়রানি/বোমা হামলা	৪৪
হেফাজতে ইসলাম কর্তৃক নির্যাতন/হয়রানি/হামলা	২৪
জামায়াত-শিবিরের কর্মী কর্তৃক কুপিয়ে হত্যা	১
পুলিশের গুলিতে নিহত	১
খুন	১
অন্যান্য	১৪
মোট	৩৪২

টেবিল : ২০১৩ সালে আদিবাসীদের ভূমিসংক্রান্ত ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি[২]

ক্রমিক নং	ঘটনার ধরন	ঘটনার সংখ্যা		
		পার্বত্য চট্টগ্রাম	সমতল ভূমি	মোট
০১	বসতবাড়ি পুড়ে ছাই	৩৬	-	৩৬
০২	গৃহ লুট ও ডাকাতি	২৬৩	১৫	২৭৮
০৩	পরিবার আক্রান্ত	-	৬৬	৬৬
০৪	ব্যক্তি আক্রান্ত ও আহত	৩৪	৭	৪১
০৫	উচ্ছেদকৃত পরিবার	২৬	-	২৬
০৬	উচ্ছেদের আশঙ্কা (পরিবার)	১০৩৮	২৪	১০৬২
০৭	ভূমির পরিমাণ দখল	৩৭৯২ একর	১০৩ বিঘা	
০৮	আটক	২	৮	১০

১. *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।
২. *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

[ষষ্ঠ অধ্যায়]

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনার বাস্তবায়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামী পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বরং বলা যায়, বাংলাদেশে ইসলামী পদ্ধতিতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ হবে মানবাধিকার লঙ্ঘনমুক্ত একটি মডেল রাষ্ট্র। এদেশের অধিকাংশ জনগণ মুসলিম। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালাগুলো জীবনের কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত করলে এদেশে কোন অধিকার বঞ্চিত বা সুবিধা বঞ্চিত মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না ইনশাআল্লাহ্। বাংলাদেশে অবস্থিত সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষকেই তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া বা তাদের হারিয়ে যাওয়া অধিকারগুলোকে পাইয়ে দিতে ইসলামী আদর্শ অত্যন্ত সফল ও কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। এদেশের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই নিজেদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ামতরূপে পরিগণিত হবে। জ্ঞাতব্য যে, বাংলাদেশে ইসলামী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কিছু সমস্যা রয়েছে, পাশাপাশি রয়েছে এর সম্ভাবনাও। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

(এক). সমস্যাবলী

বাংলাদেশ সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে ইসলামী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অনেকগুলো অন্তরায় রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি পেশ করা হলো:

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা

এদেশে অধিকাংশ মানুষ মুসলিম হলেও বেশির ভাগ মুসলিম ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখেন না। শুধু তাই নয়, তাদের একটি বড় অংশ আল্লাহ্র একত্ববাদ, নামায, রোযা এগুলো সম্পর্কেও অজ্ঞ। ইসলামী বিধান, জীবন ব্যবস্থা, আল-কুরআনের মূল বক্তব্য এসব কিছুই তারা অবহিত নয়। কেউ তো এমন ধারণাও পোষণ করেন যে, ইসলাম কেবল কিছু আনুষ্ঠানিতা ও রীতি রেওয়াজ পালনের ধর্ম। এখানে অনেক মুসলিম এমনও রয়েছে যারা ধর্মীয় জ্ঞান লাভ তো দূরের কথা নামায-রোযাও পালন করেন না।

যেখানে ধর্মীয় জ্ঞানের এরূপ করুণ অবস্থা সেখানে এ ধরনের লোকের কাছে ইসলাম ধর্মে নির্দেশিত মানবাধিকারের রূপরেখা আরো অজানা। কাজেই মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধ করার জন্য ইসলামের মানবাধিকারের রূপরেখা অবগত করানো আবশ্যক।

ধর্মীয় নেতাদের অনৈক্য

এদেশে অসংখ্য আলিম ওলামা ও ধর্মীয় নেতা আছেন। কিন্তু তাঁরা ঐক্যবদ্ধ নন। ইসলামী আদর্শ ও মানবাধিকার সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আকিদা-বিশ্বাস ও ছোটখানো মাসয়াসা মাসায়িলকে কেন্দ্র করে আলিমগণ বহু দল ও উপদলে বিভক্ত। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ ভাবনা অনুযায়ী ইসলামকে বুঝতে ও পেশ করতে ব্যস্ত। যেখানে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে যে সুন্দর মানবতাবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে সে বিষয়টি জনসাধারণকে বুঝানোর পরিবর্তে

এখানকার বিভিন্ন দল পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়িতে ব্যস্ত। আর এক্ষেত্রে বিভিন্ন দল জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। তাই এ দেশের মুসলিম সমাজের কোন উন্নয়ন ঘটেনি; নিজেদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়নি। তাই মানুষের জাগতিক ও আধ্যাতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনৈক্য এক বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ দেশের মানুষকে একতাবদ্ধ জাতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ও মানুষের অধিকার রক্ষায় সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনাগুলো জানিয়ে দেয়া আলিম সমাজ ও ধর্মীয় নেতাদের দায়িত্ব অগ্রগণ্য। নির্দেশনাগুলো পালন করলে কী লাভ আর না করলে দুনিয়া ও আখিরাতে কী পরিণতি তা অবহিত করতে আলিম সমাজ ও রাজনীতিবিদদের এগিয়ে আসতে হবে।

দুই ধারার রাজনীতি

এদেশের রাজনীতি মূলত দুটি ধারায় বিভক্ত। একটি ধারা ধর্মীয় আদর্শে রাষ্ট্র গঠনে তৎপর। তাদের উদ্দেশ্য হল, ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শে সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে ইনসাফ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

আরেকটি ধারা হল যারা ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করে মানব রচিত আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়। তাদের চেষ্টা-সাধনা এ পথেই নিয়োজিত। এ দেশের রাজনীতিতে এরূপ দুই ধারা ইসলামী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় সমস্যা।

ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচার

মানুষ যেন ইসলামের সুশীতল ছায়ায় সুশোভিত না হয় সেজন্য ইসলামী আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টির প্রয়াস ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই পরিদৃষ্ট। যা এ যুগেও এবং আমাদের এ দেশেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এদের প্রধান কাজ হলো ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচার। তারা বিভিন্নভাবে ইসলাম ধর্ম, ইসলামী আইন ও বিধান প্রভৃতি নিয়ে মানুষের মাঝে ভুল ধারণা ছড়াচ্ছে। ইন্টারনেট, ফেসবুক, টিভির পর্দায়, নাটক ও সিনেমায়, গল্প, উপন্যাস, পত্র-পত্রিকা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এক কথায় সকল মাধ্যমকেই তারা কাজে লাগিয়ে ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে ভুল ধারণা, অপপ্রচার ও কুৎসা রটাচ্ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাদের মিথ্যা প্রচারণা ও ভ্রান্তির ফাঁদে আটকে লোকজন যেন ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান করে। তাদের এ শয়তানী মিশন সফল করতে তারা সদা তৎপর এবং এ জন্য তারা তাদের সর্ব শক্তি নিয়োগ করেছে। ইসলাম বিদ্বেষী বিভিন্ন এনজিও সংস্থা, দেশী-বিদেশী চক্র, কতিপয় প্রচার মিডিয়া, ইসলাম বিরোধী কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিও এদলে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তাদের কথায় ধোঁকায় পড়ে এদেশের জনসাধারণের একটি অংশ ইসলামের অতুলনীয় সুন্দর আদর্শ থেকে দূরে সওে গেছে। ইসলাম বিদ্বেষীদের কর্তৃক সর্বদিক দিয়ে এ ধরনের অপপ্রচার ইসলামী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম অন্তরায় ও সমস্যা।

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র

সমগ্র বিশ্বে ইসলামী আর্দশের প্রচার ও বিকাশ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিকভাবে ইয়াহুদী, নাসারা ও তাদের দোসররা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কেননা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের শোষণ ও লুণ্ঠনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সেজন্য আন্তর্জজাতিক এ মহলটি সদা সজাগ এবং এ ব্যাপারে তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রে চাপ প্রয়োগও

Dhaka University Institutional Repository

অব্যাহত রেখেছে। এরূপ আন্তজার্জিক ষড়যন্ত্র ও চাপ এদেশে ইসলামী পদ্ধতিতে সফলভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও এর লঙ্ঘন প্রতিরোধে অন্যতম বাধা।

দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা

এদেশে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। একটি সাধারণ শিক্ষা আর অপরটি মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা শিক্ষিত হচ্ছে তারা কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী জ্ঞান সেখান থেকে শিখতে পারছে না। তারা দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করলেও ঈমান, আক্বিদা, আখিরাত, ঈমানী দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ থেকে বঞ্চিত। ফলে ইসলাম মানবাধিকারের যে চমৎকার নিদের্শনা পেশ করেছে তা সাধারণ বা আধুনিক শিক্ষিতদের অধিকাংশই অবহিত নন। অপরদিকে মাদরাসা শিক্ষিতরা (বিশেষ করে কওমী মাদরাসা) ঈমান ও ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করলেও দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে বহুলাংশে পিছিয়ে। কারণ অধিকাংশ মাদরাসায় এসব বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয় না। অথচ প্রতিটি (মুসলিম) শিক্ষার্থীর জন্য উভয় শিক্ষা গ্রহণ করা জরূরী। জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে আজ এরূপ উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের খুব বেশি প্রয়োজন। বাংলাদেশে এরূপ দ্বিমুখী শিক্ষানীতি ইসলামী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি বাধা বটে।

রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের অনুপস্থিতি এবং এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণার অভাব

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমের আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই। আদর্শিক রাজনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োনীয়তা তারা যথাযথ অনুভব করে না। এটি ইসলামী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় বাধা। কেননা, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলাম যে নীতিমালা পেশ করেছে তা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা আদর্শ রাষ্ট্রেই সম্ভব। বিশেষ করে ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগের জন্য আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন। এ দণ্ডবিধি কার্যকর করা ছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ যথাযথভাবে সম্ভব নয়।

মানবাধিকারের ইসলামী রূপরেখা যথাযথভাবে উপস্থাপনে ব্যর্থতা

যারাই ইসলামের প্রচার ও শিক্ষার কাজে নিয়োজিত আছেন তাদের অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহ্য় বর্ণিত মানুষের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপস্থান করছেন না। আর যারা করছেন তাদের অনেকেই যথাযথভাবে তা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে। মাদ্রাসাগুলোতে মানবাধিকার বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কোন শিক্ষা দেয়া হয় না। সিলেবাসেও এরূপ বিষয় সংযুক্ত নেই। আর যারা ইসলাম প্রচার, দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে লিপ্ত তাদের দা'ওয়াতী কাজেও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও এর লঙ্ঘন প্রতিরোধে করণীয় দিকগুলো অনুপস্থিতই বলা চলে। সুতরাং এটা মানবাধিকান লঙ্ঘন প্রতিরোধে একটি বড় সমস্যা।

(দুই). সম্ভাবনা ও করণীয়

বাংলাদেশে মানবাধিকাংর লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামী নীতিমালা বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা থাকলেও এর সম্ভাবনার পথও রয়েছে। তবে এ লক্ষে কিছু করণীয় রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো -

মানবাধিকার সুরক্ষায় ধর্মীয় নেতাদের জোড়ালো প্রচারণা

এদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম এবং ধর্ম প্রিয়। ইসলাম ধর্মের প্রতি ভালবাসা আর আলিমগণের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধ এ দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে। কাজেই ধর্মীয় নেতাদের উচিত, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে যথাযথ সুফল বয়ে আনতে জোড়ালো ও জোটবদ্ধ প্রচারণা চালানো। নিজেদের মধ্যকার অমৌলিক মতভেদকে ভুলে গিয়ে ইসলাম ধর্ম ও মানবতার বৃহৎ স্বার্থে সকল ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। ওলামা মাশায়িখ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ যৌথ উদ্যোগে অথবা যার যার অবস্থানে থেকে মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কুফলতা এবং মানুষের অধিকার রক্ষার বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে তুলে ধরলে অবশ্যই মানবাধিকার লঙ্ঘন বহুলাংশে কমে আসবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে গুরত্বের সাথে পাঠদান

স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্বের সাথে ইসলামের মানবাধিকার বিষয়টি সিলেবাস ভুক্ত করতে হবে। দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে যদি মানবাধিকারের বিষয়টি পাঠদান করা হয়, তবে তা অবশ্যই ভাল ফলাফল বয়ে আনবে। আর এসব প্রতিষ্ঠান থেকে এমন যোগ্য শিক্ষার্থী বের হবে যারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় হবে বদ্ধ পরিকর এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে হবে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালানো

এটা জানা কথা যে, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার বিধানদানে ইসলাম অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য ইসলাম যে শান্তির বিধান দিয়েছে তা রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিকভাবে কার্যকর ও উপভোগ করা প্রয়োজন। এর সুফল সব ধর্ম ও বর্ণের লোকই পাবে। অতীত ইতিহাস এর সাক্ষ্য। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিও পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ সফল করার ক্ষেত্রে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, আদর্শ রাষ্ট্র ছাড়া অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কাজেই দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিমদেরকে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝাতে হবে। এর সুফলগুলো তুলে ধরতে হবে। আর এ কাজ করতে হবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে। দেশে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে অবশ্যই মানবাধিকার লঙ্ঘন যথাযথভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

দা'ওয়াতী কাজে মানবাধিকারের বিষয়টিকে গুরুত্বদান

যারা দ্বীনের দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত আছেন তাদেরকেও মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মানুষ হিসেবে অপর মানুষের কাছে যে অধিকার রয়েছে তা লঙ্ঘন করলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবার জন্য কতটা ক্ষতির কারণ হতে পারে, দুনিয়া ও আখিরাতে এরূপ অপরাধকারীর কেমন পাপ, শাস্তি ও করুণ পরিণতি রয়েছে- এগুলো দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপও নেয়া যেতে পারে। যেমন-

(ক) মসজিদ ভিত্তিক কর্মসূচি: মসজিদ হলো ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। মসজিদ ইসলামী সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধ চর্চার যেমন প্রাণকেন্দ্র তেমনি মুসলিমদের রাজনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থারও কেন্দ্র। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের মধ্য দিয়ে মুসলিমরা যে অভিন্ন বিশ্বাসবোধে উজ্জীবিত হয় সে বোধের দ্বারাই তারা পরিচালিত হয়। কাজেই আমাদের মসজিদগুলোকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিপক্ষে এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার চর্চার কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদে কিছু কর্মসূচী চালু করা যেতে পারে। যেমন- (১) প্রত্যেহ নির্ধারিত কোন ফরয সলাতের পর ১০/১৫ মিনিট কুর'আন ও হাদীসের আলোকে মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার নিয়ে আলোচনা করা; (২) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে মানুষের অধিকার যেভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে তা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা; (৩) জুমু'আর খুৎবায় মানবধিকার বিষয়টি গুরুত্বদান।

(খ) মিডিয়ার ব্যবহার: এ কথা বলা যায় যে, বর্তমান সময়ে প্রচার মাধ্যম যার দখলে পৃথিবীর কর্তৃত্ব মূলত তারই হাতে নিবদ্ধ। কাজেই প্রচার মিডিয়া মানবাধিকার প্রচারের বিশাল মাধ্যম। হিকমাত ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে কুরআনে দ্বীন প্রচারের যে আদেশ রয়েছে তার অনিবার্য দাবিই হচ্ছে যুগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতিতে ইসলামের দা'ওয়াত ও তাবলীগ করা। আধুনিক বিশ্বে রেডিও, টিভি ও ইন্টারনেট খুবই শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। তাই এ মিডিয়াগুলোকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এর মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কুফল ও শাস্তি সম্বলিত বিভিন্ন ইসলামী নাটক, ছায়াছবি, টেলিফিল্ম ইত্যাদি প্রচার করা যেতে পারে। যারা ইসলাম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখেন তাদেরকে এ ক্ষেত্রে কাজে লাগালে ইসলামী মানবাধিকারের ব্যাপক বিকাশ ঘটতে পারে। ফলে এ মিডিয়া হতে পারে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম।

(গ) লিখনীর মাধ্যমে: লিখনী দা'ওয়াত ও তাবলীগের আরেকটি মাধ্যম। আধুনিক বিশ্বে মানুষ গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছড়া প্রভৃতি পড়তে পছন্দ করে। এসব নানা আঙ্গিকে সাহিত্য চর্চা চলে। আর শিক্ষিত মানুষ মাত্রই সাহিত্যের কোন না কোন দিকের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং সাহিত্য চর্চা করবেন এটাই স্বাভাবিক। এভাবে চর্চার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দ্বারাই তার জীবনবোধ গড়ে ওঠে। তাই মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এমন গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতে ও প্রকাশ করতে হবে যা পাঠের দ্বারা মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হবে, মানব অধিকার আদায়ে অনুপ্রাণিত হবে, মানুষ অপরাধ থেকে দূরে সরে আসবে, অপরাধকে ঘৃণা করতে শিখবে।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকসমূহ

বাংলাদেশের মুসলিমরা ধর্মপ্রিয়। তথাপি এদেশে মুসলিম সংস্কৃতি বহু আগ্রাসনের শিকার। তাই সেগুলো থেকে সতর্ক থাকতে হবে। আগ্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে মুসলিমদের ঈমান, আক্বীদা, চরিত্র ও নৈতিকতার উপর আঘাত হানা হচ্ছে। অমুসলিমদের মাঝেও ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা। সমাজে অশ্লীলতা, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। বিকৃতিকে সুকৃতির আবরণ দিয়ে মাতিয়ে তোলা হচ্ছে। অশ্লীলতা, পংকিলতা, নীতিহীনতা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। পারিবারিক ঐতিহ্য ধ্বংস করা হচ্ছে। পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটানো হচ্ছে। মূলতঃ এইসব হচ্ছে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে। যেসব মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানো হচ্ছে, তার কয়েকটি হলো:

১। আদর্শহীন শিক্ষা ব্যবস্থা;
২। নীতিনৈতিকতা বিবর্জিত অশ্লীল বই-পুস্তক ও পত্রপত্রিকা;
৩। টেলিভিশনে অপসংস্কৃতির প্রচার;
৪। ইসলাম বিরোধী ও আদর্শ বিবর্জিত সিনেমা, নাটক, গান, যাত্রা ইত্যাদি;
৫। নৈতিকতা বিবর্জিত অশ্লীল অডিও-ভিডিও, ও পত্র-পত্রিকা;
৬। সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, ব্যক্তি ও জাতিপূজা;

৭। আদর্শহীন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক অনাচার;

৮। N.G.O -দের ধ্বংসাত্মক অপতৎপরতা;

৯। নারী ও শিশু শ্রম;

১০। পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি।

সুতরাং এসব বাধাগুলো দূরীকরণে এবং ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচারকারীদের জবাবদানে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিন পন্থায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

মানবাধিকার লঙ্ঘন ঠেকাতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ

মানবধিকার লঙ্ঘন ঠেকানোর লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, যেমন:

১। আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ব্যাপক আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে;

৩। ইসলাম বিরোধী মিশনারিদের তৎপরতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে;

৪। ইসলামী জীবন দর্শনকে প্রতিফলিত করে এমন বই-পুস্তক রচনা, প্রকাশনা ও বাজারজাত করার ব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে। ইসলামী চেতনাধারী পত্রপত্রিকার প্রকাশনা প্রচুর বৃদ্ধি করতে হবে; ইসলামী জীবনবোধকে প্রতিফলিত করে ব্যাপক ভিডিও-অডিও তৈরি করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া দরকার; এবং রেডিও-টেলিভিশনে মানবাধিকার সুরক্ষার বাহক প্যাকেজ প্রোগ্রাম করতে হবে;

৫। অশ্লীল ও নৈতিকতা বিরোধী বই-পুস্তক, পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও আমদানি বন্ধ করতে হবে; কেননা, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের নৈতিক বিকৃতি ঘটে এবং মানবিক অধিকার বিনষ্টে ধাবিত করে।

৬। রেডিও-টেলিভিশনে ইসলাম বিরোধী প্রচার-প্রচারণা বন্ধ করতে হবে;

৭। যাবতীয় নেশা ও নেশা ভিত্তিক আড্ডাখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে;

৮। সুদ, জুয়া, যুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে; এবং

৯। আদর্শহীন রাজনীতির চর্চা পরিহার করতে হবে।

এগুলো করতে হবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে। মানুষের মাঝে তীব্র আদর্শবাদী চেতনাবোধ সৃষ্টি করে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ নির্মূল করে দিতে হবে।

পরিবার ভিত্তিক ভূমিকা

পরিবার হচ্ছে মানব সমাজের প্রাথমিক ইউনিট ও প্রধান লালন ক্ষেত্র। সমাজে প্রাথমিক শিক্ষা, শিষ্টাচার, স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধাবোধ, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত সুষম জীবনধারার প্রচলন ও বিকাশে এই পরিবার পদ্ধতি সব সময়ই অতিশয় কার্যকরী প্রমাণিত। সুতরাং পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মানুষের অধিকার নিয়ে চর্চার বিকাশে এ পদ্ধতি অনন্য ভূমিকা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামী পদ্ধতি ও অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যকার তুলনা

বহু সংখ্যক গবেষক এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা মানবাধিকার সমস্যা নিয়ে চিন্তা, গবেষণা ও পর্যালোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ ইসলাম এই পর্যালোচনার কাজ চৌদ্দশো বছর আগেই সম্পন্ন করেছে। কুরআনে ঘোষিত এই মানবাধিকার ও কর্তব্যের ঘোষণার এবং মানব রচিত এ যাবত কালের ঘোষণাবলীর তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য দৃশ্যমান হয়ে উঠে। প্রমাণিত হয় যে, মানব রচিত মানবাধিকারের ঘোষণাবলী অসম্পূর্ণ, একদেশদর্শী, ভারসাম্যহীন ও অন্তঃসারশূণ্য। আর কুরআন নির্দেশিত মানবাধিকার ত্রুটিমুক্ত, পরিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ ও যথাযথ। নিম্নে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামী বিধানের সাথে মানব রচিত বিধানের অনেকগুলো পার্থক্যের মধ্য থেকে কতিপয় পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

(১). ইসলাম প্রতিটি মানুষকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে নির্মল দিকনির্দেশনা দিয়ে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করতে সচেষ্ট। মানুষের মনে প্রকৃত ঈমান ও আদর্শের বীজ বপন করে তাকে কল্যাণমুখী বানিয়ে তার মধ্যে অপরাধ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে আগ্রহী। কিন্তু অপরাধ দমনে মানব রচিত আইন ও বিধানে এরূপ নির্মল ও উন্নত চরিত্র গঠন কিংবা অপরাধ বিরোধী মনোভাব তৈরির কোন নিদের্শনা নেই।

(২). ইসলাম মানুষের অধিকার হরণ করার ভয়াবহ পরিণতির চিত্র মানব জাতির সামনে তুলে ধরেছে। যাতে মানুষের মনে এ সম্পর্কে চরম ভীতি জাগে, সে এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু মানুষের তৈরি কোন বিধানে এরূপ কিছু নেই। ফলে মানব রচিত বিধান অপরাধ দমনে সফল হচ্ছে না; বরং অপরাধের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। শুধু নতুন নতুন আইন করে বা আইনশৃখংলা বাহিনী দিয়ে যে অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব নয় তা সকলের কাছে আজ সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। অপরাধ তখনই বন্ধ হবে বা একেবারে কমে আসবে যখন মানুষ এসব অপরাধের ইহ ও পরকালীন ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে নিজ থেকেই অপরাধ পরিহারে উদ্যোগী হবে। আর এ ব্যবস্থা কেবল আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানেই রয়েছে।

(৩). মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলাম অন্যায়মূলক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা নিষিদ্ধ করেছে। পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জুলুম, অন্যায়, সীমালংঘন প্রভৃতি গর্হিত কাজ প্রতিরোধের আদেশ দিয়েছে অত্যন্ত জোরালোভাবে। পক্ষান্তরে অপরাধ প্রতিরোধে মানুষের তৈরি করা আইন ও সংবিধানে এরূপ পারস্পরিক ও যৌথ সহযোগিতামূলক কর্মসূচির কোন তাগিদ বা নিদের্শনা নেই।

(৪). ইসলাম অপরাধমূলক কাজকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সেই কাজের সুযোগ সৃষ্টির উপায়, উপকরণ ও যাবতীয় পন্থাকেও নিষিদ্ধ করেছে। যেন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সুযোগই সৃষ্টি না হয়। যেমন- মদপান নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি নিষিদ্ধ করা হয়েছে মদের ব্যবসা, মদ তৈরি করা, কাউকে মদ

উপহার দেয়া প্রভৃতি। পক্ষান্তরে অপরাধ দমনে মানুষের তৈরি আইন ও বিধানে অপরাধ সৃষ্টির উপায়-উপকরণ ও সুযোগের পথকে সমূলে উৎপাটন করার কোন ব্যবস্থা নেই।

(৫). ইসলাম মানুষকে আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং যা কিছু আত্মশুদ্ধির পথে বাধা যথা- হিংসা-বিদ্বেষ, অহমিকা, লোভ-লালসা, ক্রোধ ইত্যাদি পরিহারে তাগিদ ও হুকুম দিয়েছে এবং এগুলোকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। কেননা, এগুলো মানব মনকে কলুষিত করে অপরাধমূলক কাজে প্ররোচিত করে। পক্ষান্তরে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে মানুষের তৈরি আইন ও বিধানে এরূপ আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থা নেই।

(৬) ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই অপরাধ সংঘটনের পথ রুদ্ধ করার ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু অপরাধ দমনে মানব রচিত বিধান ব্যবস্থা গ্রহণ করে অপরাধ সংঘটনের পর।

(৭). ইসলাম কোন কিছুকে নিষিদ্ধ করলে তদস্থলে একটা হালাল-কাজের পন্থাকে বৈধ করে দেয়। যাতে মানুষ নিষিদ্ধ (অপরাধমূলক) কাজটি পরিহার করে বৈধ কাজের মাধ্যমে তার প্রয়োজন পূরণ করে। যেমন- ইসলামে ব্যভিচার, ধর্ষণ নিষিদ্ধ কিন্তু বিয়ে বৈধ। ইসলামে চুরি নিষিদ্ধ কিন্তু অভাব-অনটন চুরি কর্মে উৎসাহিত করে বিধায় অভাব-অনটন দূর করার জন্য ইসলাম সমাজে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। পক্ষান্তরে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে মানব রচিত আইন ও বিধানে এরূপ উপযুক্ত, স্থায়ী ও যথাযথ ব্যবস্থা নেই।

(৮). ইসলামের ফরয ইবাদতগুলো মানব মনকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ করতে এবং অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত রাখতে বিরাট ভূমিকা রাখে। যেমন সলাত, সিয়াম, হজ্জ প্রভৃতি। কিন্তু মানুষের তৈরি আইন ও সংবিধান এ ধরনের কোন বিধান দানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

(৯). ইসলাম মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণে যথাযথ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয়। যেমন, কেউ দারিদ্রতার কারণে বা চরম ক্ষুধার কারণে চুরি করলে ইসলাম তাকে শাস্তি না দিয়ে প্রথমে তার অভাব মোচন ও আহারের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। ইসলামের এ ব্যবস্থা মানবাধিকার সংরক্ষণের উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু মানব আইনে এরূপ কার্যক্রম নেই।

(১০). ইসলাম মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে শাস্তির বিধান দিয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ে। তাও আবার অবস্থা, প্রেক্ষাপট, পরিবেশ-পরিস্থিতি, উপযুক্ত প্রমাণাদি এ সবগুলোর যথাযথ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে। যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন না হয় এবং তার উপর জুলুম না করা হয়। কিন্তু মানুষের তৈরি বিধানে যথাযথভাবে এরূপ যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত বিষয়াদির গুরুত্ব অনুপস্থিত। যা অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্নের পথ উন্মুক্ত করে দেয়; বরং মানবাধিকারকেই লঙ্ঘিত করে।

(১১). ইসলাম মানুষকে প্রথমে অপরাধ না করতে উপদেশ ও পরামর্শ দেয়, তাকে বারবার নসিহত করে। যাতে পরপর্তীতে তাকে শাস্তির মুখোমুখি না হতে হয়। আর এ কাজটি ইসলাম অত্যন্ত সুন্দর, স্বার্থক ও পরিপূর্ণভাবে আঞ্জাম দিয়েছে; যা অতুলনীয় ও বিরল। কিন্তু মানব তৈরি কোন আইন, সংবিধান, সংগঠন কিংবা সংস্থা অনুরূপ করতে সমর্থ হয়নি; বরং তারা এতে ব্যর্থতার পরিচয়ই দিয়েছে।

(১২). ইসলাম শাস্তি দানের মাধ্যমে অপরাধীকে পবিত্র ও পাপমুক্ত করে, সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা করে। তাই অপরাধী শাস্তি ভোগের পরও মনে প্রশান্তি অনুভব করে; তার মনে সমাজের প্রতি কোন প্রতিহিংসা জাগে না। সে এটা বুঝতে পারে যে, এ শাস্তি

Dhaka University Institutional Repository

কারো মনগড়া নয়; তা আল্লাহ্‌রই শরীয়ত। মানব রচিত আইনে প্রদত্ত শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র আইনে প্রদত্ত শাস্তির মধ্যে এটাই অন্যতম বড় পার্থক্য। মানুষের আইনে দণ্ডিত ব্যক্তির মনে সমাজের প্রতি আক্রোশ সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র আইনে দণ্ডিত ব্যক্তির মনে আত্মোপলব্ধির সঞ্চার হয়।

(১৩). ইসলামী আইনে সকল মানুষ সমান। কিন্তু মানুষের তৈরি আইন ও বিধানে বাস্তবে অসমতা পরিলক্ষিত হয়। যা ইনসাফপূর্ণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধাস্বরূপ।

(১৪). মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামী বিধান খুবই পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল। একে সুদৃঢ় ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে এতদসংশ্লিষ্ট কোন দিক ও বিভাগের আলোচনাই এ থেকে বাদ যায়নি। এতে সকল বিষয় এতো সুন্দর ও নিখুঁতভাবে আলোচিত হয়েছে, যা ছিল মানুষের চিন্তা ও কল্পনাতীত এবং কোন প্রশ্ন বা আপত্তি করার কোন অবকাশই রাখেনি। পক্ষান্তরে মানব রচিত আইন ও ঘোষণা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। মানুষের ন্যায্য অধিকার সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুই তাতে উপস্থাপিত হয়নি। আর যেটুকু উল্লেখ আছে সেগুলোর অনেক বিষয়ই প্রশ্ন সাপেক্ষ এবং আপত্তিকর।

(১৫). আল্লাহ্‌ গোটা মানবজাতিকে এক ও অভিন্ন বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় ও চূড়ান্ত। পক্ষান্তরে মানব রচিত বিধান অস্থায়ী। তাই প্রত্যেকেই নিত্য নতুন পরস্পর বিপরীত আইন ও বিধান তৈরিতে ব্যস্ত, পরস্পর বিরোধী দর্শন ও মতবাদ আত্মপ্রকাশে লিপ্ত। পরস্পর বিরোধী এসব আইন, বিধান ও মতাদর্শ মানুষের বিবেককে বিভ্রান্ত করে জীবনের সহজ-সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়।

(১৬). আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধান উন্নততর নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তিশীল। এতে স্বার্থের সংঘাত ও শ্রেণিবৈষম্যের অস্বিত্ব নেই। কিন্তু মানব রচিত বিধানে নৈতিকতাকে উপেক্ষা করে বস্তুগত স্বার্থকে ভিত্তি বানানো হয়েছে। ফলে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও গোত্রের মধ্যে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রবণতার প্রাধান্য লক্ষণীয়। যা একই রাষ্ট্রে বসবাসকারী লোকদেরকে পরস্পরে শত্রুতে পরিণত করেছে।

(১৭). ইসলামী বিধানে নৈতিক মূলনীতির পেছনে কার্যকর শক্তির গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু মানব রচিত বিধানে কিছু নৈতিক মূলনীতি নির্ধারণ করা হলেও এসব মূলনীতি মেনে চলার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করার মত কোন কার্যকর শক্তি নেই। ফলে তা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বব্যাপী জুলুম-নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে। অশান্তি বিস্তার লাভ করেছে। সর্বত্রই চলছে দানবীয় রাজত্ব। মানুষ মরছে, পুড়ছে জনপদ। মানবাধিকার কেবলই শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। বিশ্বময় শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানবতা মুক্তির প্রহর গুনছে। কিন্তু মুক্তির পরিবর্তে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন সংকট। মানুষের রচিত আইন ও বিধান এ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে সমস্যা আরো প্রকট ও কঠিনতর হচ্ছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ প্রদত্ত শান্তির ধর্ম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। বিশ্বের অধিকার বঞ্চিত মানুষগুলোকে মহান স্রষ্টার আইন ও বিধান তথা ইসলামের অধীনেই নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। কেননা, ইসলামী পদ্ধতির যথাযথ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব মানবাধিকার লঙ্ঘন যথাযথভাবে নির্মূল করা।

মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলাম বিশ্ববাসীর সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল ও অতুলনীয় প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছে। এ বিষয়ে ইসলামী বিধানের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারের বিষয়টিকে শুধু যথাযথ গুরুত্বই দেয়নি; বরং এর পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে সর্বাত্মক চেষ্টা নিয়োজিত করেছে এবং একে বাস্তবায়িতও করেছে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে।

ইসলাম প্রথমে মানুষকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করে উন্নত চরিত্রে বিভূষিত করতে চায়। মানুষের মনে ঈমানের বীজ বপন করে তাকে কল্যাণমুখী বানিয়ে তার মধ্যে অপরাধ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে চায়। ইসলামে এমন সব ইবাদত ফরয করা হয়েছে, যা মানুষের মনকে পবিত্রকরণ, আত্মশুদ্ধি, অপরাধ ও সীমালঙ্ঘন কাজে জড়িত হওয়া থেকে রক্ষায় বিরাট ভূমিকা রাখে। ইসলাম মানুষকে মানবাধিকার হরণ থেকে বিরত রাখতে এ গর্হিত কাজের ভয়াবহ পরিণতির চিত্রও তুলে ধরেছে। যাতে মানুষ ভীত হয়ে অপরের অধিকার হরণ ত্যাগ করে। ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে আল্লাহভীতি ও যাবতীয় ভাল কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করার এবং অপরাধ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে একে-অপরকে সহযোগিতা না করার। যেন পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অন্যায়, অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন তথা যাবতীয় অপরাধের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ইসলাম নির্দেশিত সংশোধন ও পবিত্রকরণ পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগ ও কার্যকারিতা সত্ত্বেও যদি মানুষ সংশোধিত না হয়, অপরাধ ত্যাগ না করে, এরূপ অবস্থায় মানবাধিকার রক্ষার্থে শাস্তি একান্তই অপরিহার্য। তাই ইসলাম এ পর্যায়ে অপরাধীকে নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত করার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের বিধান দেয়।

ইসলাম এটাই শিক্ষা দিচ্ছে যে, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে শাস্তিই একমাত্র ব্যবস্থা নয়; বরং এ লঙ্ঘন দমন করতে হলে লঙ্ঘিত হওয়ার কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। তাই ইসলাম যেমন অপরাধমূলক কাজ নিষিদ্ধ করেছে, তেমনি নিষিদ্ধ করেছে সেই কাজের সুযোগ সৃষ্টির উপায়, উপকরণ ও যাবতীয় পন্থাকে। ইসলামে শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ে। তাও আবার পরিবেশ-পরিস্থিতি, উপযুক্ত প্রমাণ প্রভৃতি যথাযথ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে। যেন অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার কোনভাবেই ক্ষুন্ন না হয়।

ইসলামী আইনে সকল মানুষ সমান। ইসলাম অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে জাতি, বর্ণ ও গোত্র প্রভৃতিতে কোন পার্থক্য করেনি। সুতরাং ইসলামেই রয়েছে ইনসাফপূর্ণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বিধান। ইতিহাস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, সমাজ যখনই ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করেছে, তখন মানুষ তাদের অধিকারগুলো পুরোপুরি সংরক্ষণে সক্ষম হয়েছে এবং পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে নিশ্চিত জীবন-যাপনের সুযোগ পেয়েছে। ইসলামী আদর্শ যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই নবী ﷺ মদীনায় মাত্র দশ বছরে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে পুরোপুরি সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সব ধরনের অন্যায় ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড মূলোৎপাটন করেছিলেন। গড়ে তুলে ছিলেন সুনীতি, নিরাপদ, আদর্শ, শান্তিপূর্ণ ও পবিত্রতার এক অতুলনীয় সমাজ। তা ছিল এক বিস্ময়কর বিপ্লব।

বর্তমানে মুসলিম জাতি ইসলামী বিধান অনুসরণ না করার দরুন প্রতিনিয়ত সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হচ্ছে। ব্যর্থ হচ্ছে মানবাধিকার সুরক্ষায়। আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন ছাড়া এ অবস্থার পরিবর্তন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কাজেই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার নিশ্চিতকল্পে ইসলামের বিধান সম্যক অবগত হওয়া ও তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া খুবই জরুরী।

এ প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে এ শিরোনামের গবেষণা প্রকল্পটি সম্পন্ন করেছি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে যথাসাধ্য তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। প্রথম অধ্যায়ে মানবাধিকারের পরিচয়; দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাস ও স্বরূপ; তৃতীয় অধ্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে আধুনিক ব্যবস্থাসমূহ ও ব্যবস্থাসমূহের কার্যকারিতা আলোচনা করেছি; চতুর্থ অধ্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামী ব্যবস্থাসমূহ; এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরেছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ইসলামী দিক-নির্দেশনার বাস্তবায়নে সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছি।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যাতে বিভিন্ন অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারে সেজন্য ইসলাম বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা ও বিধান দিয়েছে। এ দিক- নির্দেশনা প্রদানের যৌক্তিকতা তুলে ধরে তা লঙ্ঘন হলে কী পরিণতি হয় তা বর্ণনা করেছি। বিধানগুলো যে বাস্তবিকভাবে প্রয়োগ হলে মানবাধিকার সংরক্ষণে অবদান রাখে তাও বর্ণনা করেছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার এ গবেষণা কর্ম মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে একটি গাইড লাইন হিসেবে ভূমিকা রাখবে এবং সঠিক দিক-নিদের্শনা প্রদানে সক্ষম হবে। যারা বিভিন্ন পথ ও মতের অনুসরণ এবং নিত্য নতুন আইন তৈরি করেও মানুষের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছেন, ক্রমশ সমস্যা আরো প্রকট থেকে প্রকটতর হতে দেখছেন, এ নিয়ে হতাশা ও দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, এ গবেষণা কর্ম তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে, হতাশা ও দুশ্চিন্তা দূর করবে এবং তাদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অলীউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-খতীব আত-তিব্‌রীযী : *মিশকাতুল মাসাবীহ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী (বৈরুত), তৃতীয় প্রকাশ ১৯৮৫

অধ্যাপক মোঃ আলতাফ হোসেন : *সাংবিধানিক আইন*, জলিল ল' বুক সেন্টার, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২

: **আল-কুরআনুল কারীম**

আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : *সহীহ মুসলিম*, দারু ইবনে হাযম (কাহিরা), ফুয়াদ আবদুল বাকী' সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ২০১০

আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস ইবনু শাদ্দাদ সিজিস্তানী : *সুনান আবূ দাউদ*, দারুল হাদীস কাহিরা, ১৯৯৯

আবূ ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী : *জামে আত-তিরমিযী*, দারুল হাদীস কাহিরা (মিসর), প্রকাশকাল ২০১০

আলী ইবনু উমার আদ্-দারাকুতনী : *সুনান আদ-দারাকুতনী*, ৩য় খণ্ড, নাশরুস সুন্নাহ (মুলতান-পাকিস্তান)

আবদুর রাযযাক : *আল-মুসান্নাফ*, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ (বৈরুত-লেবানন), ২০১০

আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আদ-দারিমী আস-সামারকান্দী : *সুনান আদ-দারিমী*, কাদিমী কুতুব খানা (করাচী)

আবদুল্লাহ আল-রুকবান : *আল-কিসাস ফিন নাফস*, মু'আসসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ছাপা, প্রকাশকাল ১৪০০ হিজরী

আল্লামা আবদুল আযীয বিন বায (রহ.) : *হজ্জ উমরাহ ও যিয়ারাত*, (বঙ্গানুবাদ– আল্লামা আবূ মুহাম্মদ 'আলীমুদ্দীন), প্রকাশক আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, দ্বাদশ সংস্করণ ২০১০

আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ : *কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত*, (লেখক কর্তৃক প্রকাশিত), তৃতীয় প্রকাশ, ২০১২

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) : *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৩*, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৪

আবদুল কাদির আওদাহ : *আত-তাশরী আল-জিনাঈ*, মুয়াস্‌সাতুর রিসালাহ, লেবানন, প্রকাশকাল ১৪১৯ হিজরী,

আবদুর রহমান আল-জুযীরী : *কিতাবুল ফিক্‌হি 'আলা মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, আল-মাকতাবা আত-তাওফিকিয়্যাহ (কাহিরা- মিসর), প্রকাশকাল ২০০৮

ইবনু হাজার আসকালানী : *ফাতহুল বারী*, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ (বৈরুত-লেবানন), তৃতীয় প্রকাশ, ২০০০ সন

ইবনু মানযূর : *লিসানুল আরব*, দারু সাদির (বৈরুত-লেবানন), ৩য় প্রকাশ ২০০৪

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (গবেষণা বিভাগ) : *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম*, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (গবেষণা বিভাগ) : *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১১

ইবনুল হুমাম : *ফাতহুল কাদীর*, (বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী কর্তৃক ব্যাখ্যাসহ), দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ (বৈরুত-

লেবানন), প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

ইবনু রুশ্‌দ : *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*, দারুল ফিক্‌র (বৈরুত-লেবানন), প্রকাশকাল ২০০২

ইবনু কুদামা : *আল-মুগনী*, দারু আলামিল কুতুব (রিয়াদ), চতুর্থ প্রকাশ ১৯৯৯

ইবনু হাযম : *আল-মুহাল্লা*, দারুল ফিক্‌র (বৈরুত-লেবানন), প্রকাশকাল ২০০১

এ.এইচ,এম. মোস্তাফিজুর রহমান, মোঃ ইকমাল হুসাইন : *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি*, লেখাপড়া, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৫

ওয়াযারাতুল আওকাফি ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ (কুয়েত) : *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রকাশকাল ২০১২

কুরতুবী : *আকদিয়াতুর রাসূল (সাঃ)*, কায়রো-মিসর, দারুল ইহইয়াউল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ

গাজী শামছুর রহমান : *মানবাধিকার ভাষ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৪

ড. আবদুল আযীয আমের : *ইসলামী দণ্ডবিধি*, (অনুবাদ: শহীদুল ইসলাম), বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড এইড সেন্টার, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১২

ড. আহমদ আলী : *ইসলামের শাস্তি আইন*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দ্বিতীয় প্রকাশ- মার্চ ২০১৫

ড. আহমদ মুহাম্মদ ইবরাহীম : *রিসালা আল-কিসাস ফিশ শারীয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, মাতবায়ে আমিরিয়া (মিসর), প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪

ড. মুহাম্মাদ আত-তাহের আর-রিযকী : *মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি*, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৮

ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক : *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৭

ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান : *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, রিয়াদ প্রকাশনী, মে ২০১১

ড. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান : *আরব জাতির ইতিহাস*, (সম্পাক, প্রফেসর ড. মো. ফজলুল হক), ফেমাস বুকস্‌, জুলাই ২০১৭

: *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪; মঙ্গলবার, ২২ ডিসেম্বর ২০১৫; বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭; বৃহস্পতিবার, ১৯ অক্টোবর ২০১৭

: *দৈনিক বাংলাদেশ সময়*, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫

: *দৈনিক সমকাল*, ১৯ ডিসেম্বর, শনিবার, ২০১৫

: *দৈনিক প্রথম আলো*, বুধবার, ২২ নভেম্বর ২০১৭; রোববার, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭

বায়হাকী : *আস-সুনান আল-কুবরা*, দারুল হাদীস (কাহিরা), প্রকাশকাল ২০০৮

মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী : *সহীহুল বুখারী*, দারু ইবনে হাযম (কাহিরা), প্রথম সংস্করণ ২০১০

মালিক বিন আনাস : *আল-মুয়াত্তা*, দারু আনদালুস আল-জাদীদাহ, প্রথম প্রকাশ ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আবূ আবদুল্লাহ আল-কাযবীনী	:	*সুনান ইবনু মাজাহ*, দারু ইবনুল জাওযী (কাহিরা-মিসর), প্রথম প্রকাশ ২০১১
মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আবূ শায়বাহ	:	*আল-মুসান্নাফ*, আল-ফারুক আল-হাদীসিয়াহ (কাহিরা), প্রথম প্রকাশ ২০০৮
মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ)	:	*তফসীর মাআরেফুল কুরআন*, (অনুবাদ ও সম্পাদনা-মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প
মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন	:	*ইসলামে মানবাধিকার*, আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮৩
মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	:	*ইসলাম ও মানবাধিকার*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ২০০২
মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	:	*ইসলামে মানবাধিকার*, খায়রুন প্রকাশনী, চতুর্থ প্রকাশ, জুন ২০১১
মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	:	*অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, খায়রুন প্রকশনী, চতুর্থ প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১০
মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ	:	*হারাম ও কবীরা গুনাহ্*, দারুল ইরফান, ঢাকা বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, জুলাই ২০১৩
মোঃ আহসান হাবিব	:	*সামাজিক স্তর বিন্যাস*, গ্রন্থ কুটির, প্রথম প্রকাশ ২০০৮
মাওলানা হাবীবুর রহমান আশরাফী	:	*রক্তাক্ত বিশ্ব মুসলিম*, থানভী লাইবেরী, আগষ্ট ২০০০
যাকারিয়া মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শারফ আন-নববী	:	*রিয়াদুস সালিহীন*, দারু ইবনে হাযম (কাহিরা, মিসর), প্রথম সংস্করণ ২০০৮
সাহাদত হোসেন খান	:	*প্রথম বিশ্বযুদ্ধ*, ঢাকা, আফসার ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ- মে ২০১৭
সাহাদত হোসেন খান	:	*দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্রাজেডি*, ঢাকা, আফসার ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১৬
সাহাদত হোসেন খান	:	*দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ীদের যুদ্ধাপরাধ*, ঢাকা, রাবেয়া বুকস্, প্রকাশকাল ২০১৮
হাকিম	:	*আল-মুস্তাদরাক আলা সহীহাইন*, দারুল ফিক্‌র (বৈরুত-লেবানন), প্রথম প্রকাশ ২০০২
As quotd dr. D.p. Khanna, ips	:	*'reforming human rights'*
Brohi a. K.	:	*united nations and the human rights*, 1968
Dr, Ershadul Bari	:	The Dhaka University Studies, part-F, Vol-11 No.1, (University of dhaka: june 1991).
Gealirth alam	:	'human rights: eassays on justification applications',: chicago university press, 1982
Gaius ezejiofor	:	protection of human rights under the low, 1964
Hans kelson	:	*the low of united nations*, london, 1950
Karl mannheim	:	*diagonosis of our time*, london 1947
Rosenbaum	:	The Editor's Perspective on the Philosophy of Human Rights" in Alan S. Rosenbaum (ed), *The Philosophy of Rights, International Perspective*, (H.U.L., Oxford University Press 1960)
Raphael d.d.	:	*political theory and the rights of man*, indiana university press, bloomington 1967
	:	The new encyclopaedia britannica, vol2, 1978

: Un, 'human rights and social justice' new york, 1987

Thomas W. Wilson : "A Bedrock Consensus of Human Right's" in H. Henkin (ed)

Dhaka University Institutional Repository